# শেষের পরিচয়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ রথযাত্রা—১৩৬৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রী রঞ্জিত কুমার মাইতি
৫১বি ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

## এক

রাখাল-রাজের নূতন বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস-তিনেকের, কিন্তু আপনি'র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে 'তুমি'তে। আর এক ধাপ নীচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছিবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছটফট করিতেছে,—পরামর্শের জন্যও নয়, বন্ধুর জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেই বাহির না হইলেই নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা-মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদার্পণের নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেলার খাটিবার সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব বেলাবেলি না যাইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে; অর্থাৎ কিনা যাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি-গোঁফ বার-দুই কামাইয়া বার-চারেক হিমানী লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সুবিন্যস্ত গিলে-করা পাঞ্জাবি, সিল্কের গেঞ্জি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নীচে ক্রিম-মাখানো বার্নিশ-করা পাম্প, তেপায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ-বন্ধনী-সংবদ্ধ সোনার চোকা রিস্ট ওয়াচ —মেয়েদের চিত্তহারিণী বলিয়াই হেলমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি-পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধু-বরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই, তখন দ্বারে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে, অথচ ওদিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল। তারপরে চা ঢালিয়া একসাই গিলিতে শুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্। আর না। মরুক গে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকলে সে আর-কবে আগেই হাজির হইত, পরে নয়। না হয়, কাল সকালে একবার তার মেসটা ঘুরিয়া আসা যাইবে,—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিছু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী-মানুষ হে। অর্থাৎ,

মাতৃপিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে, সে-ই শুধু বাকী। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানে না। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায় না। অধুনা পটলডাঙ্গায় তাহার বাসা। বাড়িআলা বলে দু'খানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্যন্ত দেড়খানার দরে রফা হইয়াছে। একতলা, সুতরাং যথেষ্ট স্যাঁতসেঁতে। তবে, হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া জুতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। ঘর যাই হউক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটা আলমারি,—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা-পোশাকে পরিপূর্ণ। একটি দামী ইলেকট্রিক ফ্যান, দেওয়ালের ঘড়িটাও নেহাত কম মূল্যের নয়—এমন আরও কত কি শৌখিন ছোটখাটো টুকি-টাকি জিনিস। একজন ঠিকার বুড়ি-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের সাজসরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘরদ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্বণের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকী সমস্তদিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে, সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গণ্ডগোলে তাহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নীচের ক্লাসের। পূর্বে চাকরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব-পর তাহাও বুঝা যায় না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিক-পত্রে তাহার নাম খুঁজিয়া মেলে না। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলা যে কি করে কাহাকেও বলে না। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাস করিয়াছে কেহ জানে না, প্রশ্ন করিলে এমন একটা ভাব ধারণ করে যে, সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্যন্ত যা-কিছু হইতে পারে। তাহার আলমারীতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোটা মোটা বাছা বাছা বই। কথাবার্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণচোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে wireless পর্যন্ত তাহার অধিগত। তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনীর অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয় না। কন্টিনেনটাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের আসল মিল কোনখানে এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর, এ-সকল

তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতই প্রকাশ করে। বুয়ার-ওয়ারের সেনাপতি কে কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা করিল, এ-সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স কাউন্সিল বৈঠিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড স্টাণ্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আছে এবং কারেন্সি আমানতে কত টাকা থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি, নিউটনের সহিত আইনস্টিনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধে না। শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কেহ-বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে, রাখাল পরোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয় না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়ে না। যে সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল, এ তোমার ভারী অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হও। কতকাল আর এমনভাবে কাটাবে,—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে, আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেন না। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটে না। যাঁহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে। স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগলামি সারে কিনা যাচাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই। কেহ বলে নাই, রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাকে রাজী হইতে হইবে।

এমনি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে চাপা পড়ে নাই এ কথা রাখাল বোঝে। তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে; তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার বেশীতে প্রলুব্ধ হয় হয় না। এক ধরনের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার ঐখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা-খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচান কাপড়টি পরিপাটি করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরী পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চোনাকি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকবো।

না, সে হবে না। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বসো।

না হে না—তার জো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে পরামর্শ থাকল। কাল সকালে আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়বো। হয়তো আর কখনো—না, তা না হোক—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইল না।

রাখাল ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নতুন ইস্কুলে হেডমাস্টারি।

প্রাইমারি?

না, হাই ইস্কুল।

হাই ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখচে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোটখাটো বাড়ি—থাকবার জন্যে অমনি দেবে।

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাশা করেচে। এ তো একশ' টাকার ওপরে গেল হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলে না?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায়?

না, চায় না! একশো টাকায় যমের বাড়ি যেতে চায়, এ তো বর্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না, পাগলামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে, দেখা যাবে ক লিখেচে, আর কি লিখেচে। এটা বুঝচো না যে একশো টাকা। অজানা—অচেনা—দূর! অ্যাপ্লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। দূর। চললুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি মিছে যাই হোক, রাতের গাড়িতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিল না, কহিল,—অথচ এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা হয় না বুঝি?

ইহার পরে দুজন নই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি, বড়দিনের ছুটিতে হয়তো আবার দেখা হবে। ততদিন—

রাখালের চোখে সামান্যতেই জল আসিয়া পড়ে, তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার শিল-আংটি খুলিয়া টেবিলের

একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে এই কুড়িটা টাকা ধার—

কথাটা শেষ হইল না—এ কি তার বন্ধক নাকি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া আঙটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আরে না না, বন্ধক নয়—বেচলে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবে না,—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো,—এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পনর মিনিট হয়ে গেছে, এবার তোমার ছুটি। নাও, পোশাক-টোশাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোলগাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের 'পরে একটি সহৃদয় সরলতা যেন ব্যক্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায় না, কিন্তু তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রংটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁসিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধ হয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে-দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ, রাখালের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বলচি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাস করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েছে য়ুনিভারসিটির ছাপছোপের বিবরণ। সে-সব মার্কা কর্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার, কিন্তু পাস করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বললে হয় না হে, হয় না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বলচি। ছাপছোপ আছে, কিন্তু পড়াশুনা করিনি। তার সময় পেলাম কৈ? পড়া-মুখস্থর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে,—কাটলো বছর দুতিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া

পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে-পরতে পাচ্চি।

দ্যাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ আয়নায় দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়তো যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়ে না। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরনে গরদের শাড়ি, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চারখানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি-পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতে চাহে না।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিনিতে পারিনি মা।

না পারবারই ত কথা রাজু।

মনে মনে ভাবছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙ্গা আঁচলের পাড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ-দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বলত এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বললেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বললেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেঁকে না। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে—ইস্কুলের হেডমাস্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম এ. পাস করেছো যখন তখন মাস্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায় না। বলুন তো কি অন্যায়।

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বলতে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি আজ সত্যিই চলে যাচ্চেন?

তারক সবিনয়ে কহিল, এটি কিন্তু তার চেয়েও অন্যায় হ'ল যে রাখাল-রাজের পৈতৃক মুড়োটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে করে দিলেন ওকে ছোট একটুখানি রাজু,

আর আমারই অদৃষ্টে এসে জুটল এক উটকো বাবু? ভার সইবে না নতুন-মা, ওটা বাতিল করতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে তারক।

সম্মতি লাভ করিয়া তারক সকৃতজ্ঞ-চিত্তে কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় পাইল না, তাঁহার সস্মিত মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া আসিয়া পড়িল, গলার স্বরটাও গেল বদলাইয়া, বলিলেন, রাজু, আজকাল ও-বাড়িতে কি তুমি বড়-একটা যাও না?

যাই বৈ কি নতুন মা। তবে নানা ঝঞ্ঝাটে দিন পনের-কুড়ি—

রেণুর কাল বিয়ে,—জান?

কৈ না! কে বললে?

হাঁ তাই। আজ বেলা দশটায় তার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল। এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

কেন?

হওয়া অসম্ভব। বরের পিতামহ পাগল হয়ে মারা যায়, এক পিসী পাগল হয়ে আছে, বাপ পাগল নয় বটে, কিন্তু হলে ছিল ভাল। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে লোকে ফেলে রাখতে পারতো।

কি সর্বনাশ! কর্তা কি এ-সব খোঁজ করেননি?

রমণী কহিলেন, জানোই তো কর্তাকে। ছেলেটি রূপবান, লেখাপড়া করেছে, তা ছাড়া ওদের অনেক টাকা। ঘটক সম্বন্ধ এনেছে, যা বলেচে তিনি বিশ্বাস করেছেন। আর জানলেই বা কি? সমস্ত শুনেও হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতেই পারবেন না এতে ভয়ের কি আছে?

রাখাল বিষণ্ণ-মুখে কহিল, তবেই ত!

তারক চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর এই নিরুৎসুক কণ্ঠস্বরে সে সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তবেই তো মানে? বাধা দেবার চেষ্টা করবে না, আর এই বিয়ে হয়ে যাবে? এ তো বড় ভীষণ অন্যায়?

রাখাল কহিল, সে বুঝি, কিন্তু আমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে কেন ভাই? আর কর্তাই তো শুধু নয়, আর সবাই রাজী হবে কেন?

তারক বলিল, কেন হবে না? বরের বাড়ির মত মেয়ের বাড়িরও কি সবাই পাগল বললেও শুনবে না—বিয়ে দেবেই?

কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে যে! এটা ভুলচো কেন?

হলোই বা গায়ে-হলুদ! মেয়েকে তো জ্যান্ত চিতায় তুলে দেওয়া যায় না! বলিয়াই তাহার চোখ পড়ল সেই অপরিচিতা রমণী তাহার প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া সে কণ্ঠস্বর শান্ত করিয়া বলিল, আমি জানিনে এঁরা কে, হয়তো কথা কওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু মনে হয় রাখাল, তোমার প্রাণপণে বাধা দেওয়া কর্তব্য। কোনমতেই এ ঘটতে দেওয়া চলে না।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎমা তো? তাঁর আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তা হলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারটার পর আবার আসবো বাবা,—এখন উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে যে রেণুর আর বিয়ে হবে না নতুন-মা। জানাজানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিল না, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখাদেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়তো আমার উচিত নয়, কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথায় যেও না। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিল না। কিন্তু এ জন্য তিনি অপেক্ষাও করিলেন না বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দারোয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

## দুই

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্চো আজই বর্ধমানে?

না। তুমি কি করো দেখবো,—স্বেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো। চায়ের কেৎলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনি গে—কি বলো?

রাজী।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবার পয়সার প্রয়োজন হয় না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া চা দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়স তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচদিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন; সবাই বললে, বাবুদের মেজমেয়ে সবিতা বাপের বাড়িতে পুজো দেখতে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। তিনি পইঠের একধারে বসে কুলোয় করে তিল বাছছিলেন, সরকার বললে, মেজমা, ইঁট বামুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে, এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়। শুনে তাঁর চোখ ছলছল করে এলো, বললেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বললুম, মাসী আছে, কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগবে? এটা শুনেছিলুম, বললুম, পুরুতমশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেসা করলেন না। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বললেন, তোমার নাম কি বাবা? বললুম, রাজু, ভালো নাম রাখাল-রাজ। বললেন, তুমি যাবে বাবা, আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হ'লো না, সরকারমশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, বললে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এতবড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা,—মা-দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চিরসুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

শুনিয়া তারকের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃশ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পুজো দুই-ই শেষ হ'লো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামিগৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সচ্ছল, ধনী বললেও চলে। এ বাড়ির শুধু তিনি গৃহিণীই নয়, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি—দেখবামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে নিলেন। দেশে জমিজমা চাষবাসও ছিল, দু-একখানি ছোটোখাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ

সময়ই তিনি থাকতেন বাড়িতে, তখন দিনের অর্ধেকটা কাটত তাঁর পুজোর ঘরে,—দেব-সেবায়, পুজো-আহ্নিকে, জপ-তপে।

আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। বই-খাতা পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড় জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাস্টার নিযুক্ত হ'লো, যেন আমি এ-বাড়িরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আর ফিরবে না। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই-সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপঢিপ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তার পরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সমস্ত উলটে-পালটে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙতে চুরতে কে থাও কিছু আর বাকী রইল না। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলিনি। আর বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে—

চাহিয়া দেখিল, তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিল না। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন-দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়তো তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্বের কথা—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তার পরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়িতে আসতেন, কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসত তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক সাজবার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরোয়ান—আর নানা রকমের কত যে ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্বণ উপলক্ষে উপহারের ত পরিমাণ থাকতো না। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধ করি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ির মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগল। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি

বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, উল্টে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এক পিসতুতো বোনকে যেতে হলো তার শ্বশুরবাড়ি। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে—এই হ'লো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তা ছাড়া, এইমাত্র ত ওঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলে, কর্তার মতো সরলচিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে, ছিঃ!

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহ্যতঃ চাপা পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহকোণে। যাদের সবচেয়ে বড় ক'রে আশ্রয় দিয়ছিলেন একদিন নতুন-মাই নিজে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন 'যাবে বাবা আমার কাছে?' বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসী রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠছিল তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি একপ্রকার চাপাগলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দেখি সুমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শেকল দেওয়া! উঠানের মাঝখানে গোটা পাঁচ-ছয় লণ্ঠন। বারান্দার একধারে বসে স্তব্ধ অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু—কর্তার খুড়তুতো ছোটভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিনকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁকচেন, রমণীবাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখব। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হ'ল বাড়িতে এসে বসেছেন।

বাড়ির মেয়েরা বারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে, মনে হ'ল চাকররা কাছাকাছি কোথায় যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওর পেলাম না, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা আর হ'ল না। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিয়ো না, আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রঘাত হয়ে গেল। এ কি সত্য সত্যই এ-বাড়ির নতুন মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি, বাড়িসুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় মরে গেল। যে-যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান কর্তা তখন অকস্মাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলবেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইল যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব!

নতুন-মা একটা কথাও বললেন না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন।

সেদিন সেই রণু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হয়েছে তার ষোল। এই তেরো বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর তেরোটা বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেননি। এবং শুধু মেয়েই নয়, খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাই তো মনে হচ্ছে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছ এমন ব্যাপার?

না শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরিজী উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেন না আর তার মত হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপূত হইল না, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এর পরে দেশে থাকা আর চলল না। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এখানেই আছেন।

আর তুমি?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম; পিসীমা তাড়াবার সুপারিশ করে বললেন ব্রজ, সেই হতভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল। ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র বলে আমার 'পরে পিসীমা সদয় ছিলেন না।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো, তবু শান্তভাবেই বললেন, ওই ত তার রোগ ছিল পিসীমা। আপদ-বালাই ত আর একটি জুটোয়নি—কেবল ও বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসীমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেকদিনের পুরনো— সে বোধ হয় আর মনে নেই। বললেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে নাকি? নানা, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্তি-কাহিনী শুনুক। নিজেদের বংশ-পরিচয়টা একটুখানি পাক।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাসলেন, বললেন, ও ছেলেমানুষ, গুছিয়ে তেমন বলতে পারবে না পিসীমা, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসীমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা ভাল বোঝ করো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ-বাড়িতে পিসীমার প্রভাবটা বেড়ে উঠেছিল। সবাই

জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের লক্ষ্মী-শ্রী ত যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুন যে কারবারের লোকসান, তার মূলেও দাঁড়াল এই গোপন পাপ। নইলে কৈ এমন মতি-বুদ্ধি ত নবীনের আগে হয়নি! পিসীমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এ-সব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে? হয়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়িতেই কি তুমি থাকতে?

হাঁ, প্রায় বছর-দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হ'ল না।

তার বেশী আর বলতে চাও না?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবে না একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথাই ভাবছি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু, তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বলবে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বলতে চাও তিনি আসবেন না?

তাই ত মনে হয়। অন্ততঃ অতরাত্রে আসতে পারা সম্ভবপর মনে করিনে!

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতেই বলতেন না। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন, এবং ঠিক এগারোটা-তেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাকবে না।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে তুমি একটা পা-ও বাড়াও নি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? সে হবে না রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবে না তারক। আমার কথা ও-বাড়ির কেউ কানেও তুলবে না।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেমনি আর এক মামা বিদ্যমান, ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ সে-মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি।

বাল্যকালে পিসীমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে নড়াতে পারেনি, এঁর চোখের একটা ইশারার ধাক্কা সামলানো গেল না, পুঁটুলি হাতে বিদায় নিতে হ'ল। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসত পেলে অবলা সবলা নির্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি—বকশিশের আশা করিনে—সে-সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজের কপালের দৌড় ভাল করেই জেনে রেখেছি—ওতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটে না, কিন্তু তাই বলে মল্লভূমি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সংবরণ করতে পারবো না।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মল্লযুদ্ধ বাধবে কেন?

রাখাল কহিল, তা হলে একটু খুলে বলতে হয়। মামামশায় আমাকে বাড়িটা ছাড়িয়েছেন কিন্তু তার মায়াটাও আজও ঘোচাতে পারেননি, কাজেই অল্পস্বল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল, ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শ্যালকের আরামেই বেশী বিঘ্ন ঘটাচ্ছে—এ ঘটকালিও তাঁর কীর্তি। সুতরাং, এ-ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না, এবং সম্ভবতঃ কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা, আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে, এবং তার পরে ঘটনাটা মুখে মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবে না, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও-মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবে না।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্যন্ত এমনিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ ত আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলো না একবার যাই, বাপটা একেবারেই মরেচে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকী আছে, দেখে আসি গে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বলবে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার দাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা-বশে ভাঙচি দিতে এসেচো। তাতে কার্যসিদ্ধি ত হবেই না বরঞ্চ উল্টো ফল দাঁড়াবে।

তাইতো! তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠকতে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশী খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই

পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমায় সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখেও আসতে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়তো দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল?

রাখাল কহিল, বেশ ফরসা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেমনি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি ত বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং, তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। বাপড়-গয়নায় প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বললেও অপরাধ হয় না। অল্পস্বল্প ক্ষুদ্রতা, ছোটখাটো উদারতা, একটু-আধটু—

তারক বাধা দিল—থামো থামো। এ-সব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু বলচো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা মুখে আসচে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো,—কোন্‌টা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই, দুটোই। শুধু তাৎপর্য গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচিসাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতাম না। বরঞ্চ ভাবতাম যে—

রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাকলেই ছুটে যাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবো না।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাও ত শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেললে মুশকিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ-বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও বড় কম নেই, কিন্তু এমনি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকে না। না তাঁদের বাইরের চেহারা, না তাঁদের অন্তরের। সামনে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এসেই সব চেহারা লেপেমুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যর প্রভেদ ঠাউরে পাইনে!

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয়-প্রতিবেশীর ঘরের দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিও নে, জানিও নে। মেয়েদের সম্বন্ধে

আমাদের এই ত জ্ঞান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড শহরের কত নতুন কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা করো না তারক, আমি হদিশ বাতলে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা করচো কিংবা মনে মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো, তাঁদেরকেই শহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস-দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেইসঙ্গে গোটা-পাঁচেক চলতি চালের গান শিখিয়ে নিও—বস্! ইংরেজী জানে না? না জানুক, আগাগোড়া বলতে হয় না, গোটা-কুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে তো? তা হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল—তার পরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটির সেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, তোমার কিছুই যায় আসে না। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলামেশাটা একটু কম করো—যা হারিয়েছো তা হয়তো একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এইজন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়তো কিছু সত্যি আছে,—ওদের অনেকের অনেক-কিছু জানতে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশী। এখন থেকে তোমার কথা শুনবো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে—হাজারের মধ্যে নশ নিরানব্বই। তাঁর মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকী রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায় না, ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্ধমান যেতে পারচো না, সে তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলেঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গহনায়, তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বলছিলে তারক, অমন স্ত্রী লোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদলাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের সুরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশী জানি, এটুকু দাবী করলে রাগ করো না রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই—এ থাক। কিন্তু, তোমার কাছে যে অদ্যাপর্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা ওঁর নাগাল পাবো না রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকী নশ নিরানব্বইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি, তাতেই আমাদের মতেই সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিল না—জবাব দিল না। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন কটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে, যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বলবে?

মোটের উপর যা সত্যি তাই। বলবো বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি পালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা!

অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবে না। নামের মাহাত্ম্য টের াবে।

## তিন

পরদিন অপরাহ্ণের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া টবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের জল তৈরী হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া াখাল চামচে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস করে মা-দুর্গাকে তুমি খামকা চটিয়ে দিলে বলেই তা যাত্রাটা নিষ্ফল হোলো,—নইলে হোত না।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ি ছিলেন না, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছল এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল সকাল আহারাদি ারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে, স যে এখনো তাঁদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে অন্যের চোখের অন্তরালে রেণুও আসিয়া দুকণ্ঠে ঠিক এই মর্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

তোমার বাবাকে বলতে ভুলো না যে, আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

আচ্ছা, কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো একটুকরো কাগজ, তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হলো না, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু এখনো তার মিনিট-কুড়ি বাকী। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে ঢালো তাঁর আসবার আগে এ-সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেন না?

দেখো রাখাল, তর্ক করো না। মানুষে মানুষের অনেক-কিছু জানে, তবু তা কাজেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয় না তা ছাড়া এ-গুলোই বা কি? এই বলিয়া অ্যাশ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ করে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধ যে কে তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি তবু, আমাকে ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিল না, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট-দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শ নিরানব্বইয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সামলে রাখচি ভাই, বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই; এমনি সময়ে সহসা তারক বলিয়া উঠিল, এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখি নি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইল না।

রাজু আসতে পারি বাবা ?

উভয়ই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, কহিল, আসুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সে-ও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সবদিক দিয়েই যাত্রা হোলো নিষ্ফল ; কাকাবাবু বাড়ি নেই, মামাবাবু গুরুভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল ; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্ছে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্য আমি ভর্ৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তারক ঘটনাটি খুলিয়া বলিল।

নতুন-মা হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করো না ?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম, আজ বোধ হয় কিছু আর হবে না।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারু সঙ্গেই দেখা হলো না ?

রাখাল কহিল, তা হয়েছে মা। বাড়ির গিন্নী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে-ই বলতে ভুলুক, সে ভুলবে না।

তোমরা আজ আবার যাবে ?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে।

তা আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাজু ?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, প্রশ্নটি ত শুধু বাহুল্য নয়, মা,—হলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না ? তবে রংটা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁসে গেছে—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলে না। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা ?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল ; দেওয়াল ঘড়ির দিকে একমুহূর্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের বার হবার সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

না, এখনো ঘণ্টা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই-একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উভয়ের কথোপকথন মন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গলময় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবার সংকল্প তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন দেখিতে, জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিল না; কিন্তু এই যে রাখাল বর্ণনা করিল না, শুধু অনুযোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ইঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ মনের দশ দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন মায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নতুন-মার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁত নাই তা নয়, সুমুখের দাঁত-দুটি উঁচু, তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার মতো, কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ননী-মাখনের সহিত কোনমতেই তুলনা করা চলে না। চোখ দীর্ঘায়িত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব; কিন্তু একাহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ধরে না। কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন মর্যাদায় এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। আর সবচেয়ে চোখে পড়ে নতুন-মার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। মাধুর্যের যেন অন্ত নাই।

তাকের চমক ভাঙিল নতুন-মার জিজ্ঞাসায়। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু তোমার কি মনে হয় বাবা, এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে?

সে-কথা তো বলা যায় না মা।

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন মামাবাবুর চোখে, শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তারাই করেছেন।

কর্তা তবে কি করেন?

যা চিরদিন করতেন—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবারও বড় সময় পান না। ঠাকুরঘর থেকে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয়-আশয়, কারবার, ঘর-সংসার দেখে কে?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছুই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল আমরা আজও যাবো সত্যি, কিন্তু তার নিশ্চিত পরিণাম ও আপনার জানা নতুন-মা।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বোধ হয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি রাজুবাবুর ঘর?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না মশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজচি। এই বলিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো? বাঃ—এই তো হে! রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সরল স্নিগ্ধ-হাস্যে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবো না। বাঃ—দিব্যি ঘরটি তো!

হঠাৎ শেলফের ঈষৎ অন্তরালবর্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার মর্মন্তুদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিল না, তথাপি অজানা ভয়ে সে-ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—তোমরা করছিলে কি? ষড়যন্ত্র? গুলির আড্ডায় কনস্টেবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো আঁতকে ওঠে না। হয়েচে কি? নতুন-বৌ ত?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূরে হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ!

বসো, বসো। ভালো আছো? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় ভাবলে আমি চিনতে পারামাত্র তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাকবে না, ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ব্রজবাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকো না নতুন-বৌ, বসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখাপড়া করেচে—আমাদের জানা ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা শহরেই খান-চারেক বাড়ি আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয় ত সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিল না নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডান হাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া তাঁহার

সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়াজাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে ত আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায় না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কর্মাবেই বা কে। কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো কিন্তু দেখা হয়নি—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির করলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবে না—যেমন করে হোক খুঁজে পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুরবেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো তো?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়তো—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। যাই হোক, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখন সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কিনা।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই, লোভটা সে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেননি নিশ্চয়ই?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কৈ না! অভ্যাস-মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়তো তাঁকেই ডেকে থাকব।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে শুধু-হাতে ফিরতে হতো।

ব্রজবাবু তথাপি তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কালকের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে

য়েছিল, তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়তো ।-রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটারওপরেই তারক চটে য়াছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখখানা অতিশয় গারী করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখাল-রাজ হয়—ওটা মিথ্যে নয়। সংসারে নাম ও ধ্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানে না। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু-মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল, রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে?

ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোনো। ব্রজবিহারী ব'লে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুটে-কড়াই খেতে ভালোবাসতাম। ভগবানও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুরমা সাবধান করে বলতেন—

বলাই, কলাই খেয়ো না—
জানলা ভেঙ্গে বৌ পালাবে দেখতে পাবে না।

ভেবে দেখ দিকি, ছেলেবেলায় ফুট কড়াই খাওয়ায় বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্বনাশ হলো! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের, তেমনি নামেরও আছে বৈ কি।

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চাপা ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সামনে এ তুমি করচ কি?

কেন? ওদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি। প্রাণ থাকতে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায়।

তবে তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন-বৌ, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বলতে দেবে না। ভাবলাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশী হয়ে উঠবে—তা হলো উল্টো।

নতুন-মা হাতজোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো।—রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল।

নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে-জন্যে কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য-কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারে না?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বললে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বললে ?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি ?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, পরশু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায় ?

নতুন-মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজ-কর্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুনবে কেন ? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে—কেউ আমার তাই কথা শোনে না। তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি করে বলো দিকি ?

হয়তো বিগত-দিনের কি-একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল, সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানে না। নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেন না, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু ?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন-বৌ জানে না, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল। অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেন না।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানে না, তাকে বুঝিয়েই বলো না মেজকর্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে ? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তা অসম্ভব ? কিছুতেই ঠেকান যায় না, এই কি তোমার শেষ কথা ? তাঁহার মুখে পরে ক্রোধ, করুণা, না তাচ্ছিল্য, কিসের ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল, যে অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল, যে নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামিগৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাসে মুক্তস্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, এক মুহূর্তে আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্য

হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, অনেকক্ষণ তো আপনি পান খাননি? আমার মনে ছিল না মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য হইলেন—পান? পানের দরকার নেই বাবা।

নেই বৈ কি। ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবছেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পান-আলার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো ত তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘখণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে বিনিমুক্ত রবিকরে ঝাপসা কিছুই আর রহিল না। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে, এই নিভৃত নির্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবক্ষিপ্ত ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি!

পান আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়তো তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময় কথা কহিলেন নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্তা, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়তো পারে না, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, অমন্না তো পারিই মেজকর্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয় না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপর। আমি কি করে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচবো মাথায় তুলে রাখবো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজকর্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো তো নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা চেয়ো না নতুন-বৌ, সে আমি পারবো না। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবে না। তবু, পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হলে আর আমি দুঃখ করবো না। সেদিন আমাকে সবাই বললে অন্ধ, বললে নির্বোধ, বললে দেখিয়ে দিলেও যে দেখতে পায় না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করে না, তার দুর্দশা এমন হবে না তো হবে কার! কিন্তু দুর্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মেনে নিতে হবে নতুন-বৌ? বলতে হবে, যা করেছি আমি সব ভুল? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েচে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, কর্মচারী—ঠকিয়েছে অনেকেই। কিন্তু, সব যখন যেতে বসেছিল, সেই দুর্দিনে তোমাকে বিবাহ করে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো—সেই-তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি হলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত করে, বাইরের লোক জড়ো করে, তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ির বার করে দিলে তারই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোংরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বল তো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ কখন যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, বোধ হয় তাহা নিজেই জানিত না, এখন হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড় বন্ধু—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি আমাকে কে কবে করেচে? এমন করে মঙ্গল কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতেই জবাবপাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েচি, বল তো সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি ত কখনো কিছু করো না,—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়তো আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বল? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে।

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না মেজকর্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখবো না, মুখেও বলবো না।

তবে জানবো কি করে?

জানবে যেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।

কিন্তু, এ যে হেঁয়ালি হলো।

তা হোক। আজ আশীর্বাদ করো, এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহির হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, এক ডিবা পান সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে তৈরি করিয়ে এনেচি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বচ্ছর পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি নতুন-বৌ এখন তুমি হাতে করে দিলেও মুখে দিতে পারবো না।

সুতরাং পানের ডিবা তেমনিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেন না।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে কারণেই হোক, দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিতে চাহে না। তাহার এই অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভটচায্যি-মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময় দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পুজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল, সুদে-আসলে সেটা হাজার পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব?

তুলবে কেন, আরও বাড়ুক না।

না নতুন-বৌ, সাহস হয় না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে—থাকলেই হয়তো টান ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবে না।

ব্রজবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,

নিজেও ত বুড়ো হলাম গো, আরও খাটবো কত কাল? ভাবচি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবে না, এই তো? না, সে হবে না।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধহয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখ নতুন-বৌ, সোনাপুরের কতকটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে কর?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাও না।

সবটা?

ক্ষতি কি?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড়মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে, অবস্থা ভাল নয়, এরা ভাগ্নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বল?

নতুন বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মত ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবে না।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচবে? কেবল তৈরিই করালে, কখনো পরলে না। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তার পরে মাথা হেঁট করিলেন। একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপর টপটপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক থাক, নতুন-বৌ, তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক, গোবিন্দের সেবা—এই সকল নিত্যকর্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলে না তাহা রাখাল জানিত। সে-ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ, নতুন-বৌ তাহা জানিতেন না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলো না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাও না তখন ও-বাড়িতে হবে না।

নতুন-বৌ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চলবে না। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড়ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারো না। এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবে না।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ি দরকার কি মেজকর্তা?

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয় না নতুন-বৌ। নির্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে—দেশাচার অমান্য করতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিও। তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বৈ কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানো ত রাজু। সহজে ছাড়বে না!

রাখাল খুব জানিত—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন? দিলেই বা তুমি শুনবে কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু 'না' বলিলেন বটে, কিন্তু গলায় জোর নাই, তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা শহরে সুপাত্রের অভাব হবে না, কিন্তু সে কটা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চলবে না। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝলে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল, বলিল, এ হলো সহজ যুক্তি ও ন্যায়-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে জুটতো না—ও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথার হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন তিনি শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অনুমতি দিচ্চি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটে না, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও-লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্তার?

হাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠতে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তার পরেও ও-বাড়িতে আছে? খাচ্চে পরচে?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাশুড়ী। পরিবার নেই, মারা গেছেন নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন। শেকড় গেড়ে ওরা বসেছে মা, নড়ার সাধ্য কার? আমাকে একদিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভুকুটির ভার সইলো না, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ির কর্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। এই দাবানলের মধ্যে শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় ঘোচে না। অথচ পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে কূল-কিনারা পায় না মা এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেন না, শুধু সম্মুখের টেবিলের উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছটফট করিয়া উঠিল। সংসারে এত বড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্বে সে কল্পনা ও করে নাই। আর ঐ নির্বাক, নিস্পন্দ পাষাণ-মূর্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কপাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শিগগির চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন।

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্যতার সীমা রহিল না। ব্রজবাবু লজ্জায় আর মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহে না, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল, উঠে পড়ুন মা, শিগগির চলুন। গাড়ি এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাঁহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাকচেন ?

চলুন না মা, পথেই বলবো।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চললাম মেজকর্তা।

চললে ?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে, জোর করে, রাগ করে বলবো, এখন যাবার সময় নেই, তুই যা ? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো তো মেজকর্তা, দেখো তো আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন-বৌ বলিলেন, মার্জ্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি—উপেক্ষা করে বললে, এ নিয়ে তোমার হবে কি। কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে লজ্জা করে, অভিমান হয়। কিন্তু আর যে যাই বলুক মেজকর্তা, অমন কথা তুমি কখনো আমাকে বলো না। বলবে না বলো ?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহু দিন পূর্বের একটা মনে পড়িল—তখন রেণুর জন্মের পর নতুন-বৌ পীড়িত। কি-একটা জরুরী কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবে না বলো ? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ।

চাকরটা বুঝিল না কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েচে—তাই এসেচি ডাকতে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে ?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায় ?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আট দিন খোঁজ নাই। শুনেছি, অফিসের চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি ? হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে ?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন। তোমার বাড়ি, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় কর মা, বৌটা হয়তো বাঁচবে না।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবে না বাবা, এসো। যাবার পূর্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামী পা-দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল।

## চার

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখাল-রাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তের বৎসর গত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর, কিন্তু তাহাকে না চিনিবারও হেতু নাই; অন্ততঃ সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, হয়তো তিনি দোকানে যান নাই, হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়তো বাড়িতে না থাকার অপরাধে তাহারি সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন—তখন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না,—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাঁহার এই অভাবিত আবির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সংকল্পই করিয়া থাকেন ত তাহা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল; মনিবের ভয়ে তাহার তাগিদের উদ্‌ভ্রান্ত রুক্ষতা ও প্রত্যুত্তরে নতুন-মার বেদনাক্ষুব্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল, এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি নেবে যাই।

নতুন-মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন—কেন বাবা, কোথাও কি খুব জরুরী কাজ আছে?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই,—কিন্তু আমি বলি আজ থাক।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচানো যায় সে তো আজই দরকার রাজু। অন্য দিনে ত হবে না।

বলা কঠিন। রাখাল সংকোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল, শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা, আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন—ওঃ, তাই বটে। কিন্তু কে-একটা লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি

য়েছে। তা ছাড়া, শুনলে তো তিনি বাড়ি নেই, পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়েছেন। হয়তো দু-তিনদিন আর এ-মুখো হবেন না ?

রাখাল আশ্বস্ত হইল না। ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিল না, প্রতিবাদও করিল না। ইতিমধ্যে গাড়ি আসিয়া দ্বারে পৌঁছিল। দেখিল তাহার অনুমানই সত্য। একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দ্রুতপদে নামিয়া আসিলেন। রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তাঁহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে ? শুনেচো ত জীবনের স্ত্রী কি সর্বনাশ—

কথাটা সম্পূর্ণ হইল না সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন।

নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিনতে পারলে না ?

তিনি একমুহূর্ত ঠাহর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—রাজু। আমাদের রাখাল ! বেশ, চিনতে পারবো না ? নিশ্চয়।

রাখাল পূর্বেকার প্রথা-মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। রমণীবাবু তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে ! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্বনাশ করলে মেয়েটা। পুলিশে এবার বাড়িশুদ্ধ সবাইকে হায়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, যাকে-তাকে ভাড়াটে রেখো না। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও, এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুনলে !

রাখাল কহিল, একে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নি কেন ?

হাসপাতালে ? বেশ ! তখন কি আর ছাড়ানো যাবে ভাবো ? আত্মহত্যা যে !

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে, আত্মহত্যা যে তাকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে ত জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-করে ফেললেই ত হবে না। একটা পরামর্শ করা ত দরকার ? পুলিশের একটা ব্যাপার কিনা ?

নতুন-মা বলিলেন, তাহলে চলো ; কোন ভালো এটর্নির অফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক।

রমণীবাবু জ্বলিয়া গেলেন—তামাশা করিলেই ত হয় না নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘটতো না।

এ-সকল অনুযোগ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয়, তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন মা জবাব দিলেন না, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো ত বাবা, দেখি গে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বসো গে সেজবাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা

পারি করি গে, কেবল এইটি ক'রো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিব্রত করে তুলো না।

নীচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দুখানি করিয়া ঘর, বারান্দায় একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র ভদ্র কেরানী, ভাড়ার হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ-বাটীতে নাই—সকলেই প্রায় স্থায়ীভাবে বাস করিয়া আছেন। শুধু জীবন চক্রবর্তী ছিল নতুন এ বাড়িতে বোধ করি বছর-দুয়েকের বেশী নয়। তাহার স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বৌটির নিজের ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া সমস্ত ভাড়াটেদের ছেলেমেয়ের ভার ছিল তাহার 'পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা—এ-সব সে-ই করিত। গৃহিণীদের 'হাত-জোড়া' থাকিলেই ডাক পড়িত জীবনের বৌকে—কারণ, সে ছিল 'ঝাড়া-হাত-পা'র মানুষ, অতএব তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে কুঁড়েমি ভাল নয়,—বৌটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটের সর্ববাদিসম্মত অভিমত। সে যাই হোক, শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়া সবাই তাহাকে ভালবাসিত, সবাই স্নেহ করিত; কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই এবং সে-ও যে আজ সাত-আটদিন নিরুদ্দেশ এ-খবর ইহাদের কানে পৌঁছিল আজ—সে যখন মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু তবুও কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহে না—জীবনের বৌ যে আফিং খাইতে পারে,—এ যেন সকলের স্বপ্নের আগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিল না। বোধ করি পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে সবাই একটুখানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্যের প্রতিমূর্তি। দেওয়ালের কাছে দুখানি ছোট জলচৌকি, একটির উপরে দুইখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অন্যটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্পমূল্যের একখানি তক্তপোশের উপর জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বৌটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাও নি কেন? হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছিয়া দিলেন, বলিলেন, সত্যি করে বলো তো মা, কতটুকু আফিং খেয়েচো? কখন খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি বলিল, পয়সা তো বেশী ছিল না মা, বোধ হয় সামান্য একটুখানি খেয়েছে,—আর খেয়েছে বোধ হয় বিকেল বেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ী দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধ হয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি একটা গাড়ি ডেকে আনি, হাসপাতালে নিয়ে যাই।

বৌটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এভাবে মরে লাভ কি বলুন তো? আর আত্মহত্যার মতো পাপ নেই তা কি কখনো শোনেন নি? যে স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল, বাড়িতে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্যে ভাবনা নেই—একজনের জায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না নতুন-মা। আর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায়, পুলিশের হাত থেকে দেহটাকেও বাঁচানো যাবে, এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি!

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ি আমার দাঁড়িয়েই আছে, তুমি নিয়ে যাও।

তাঁহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পৌঁছিয়া দিতে রাজী হইল। নতুন-মা রাখালের হাতে কতকগুলো টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অর্ধ-সচেতন এই অপরিচিতা বধূটিকে জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এই মরণপথযাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনও দেখে নাই। তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক দেখিয়াছে। নানা বয়সের, নানা অবস্থার, নানা চেহারার। একহারা, দোহারা, চেহারা, চারহারা—খেংরা কাঠির ন্যায়, ঢ্যাঙা, বেঁটে—কালো, সাদা, হলদে, পাঁশুটে—চুল-বালা, চুল-ওঠা—পাস-করা, ফেল-করা—গোল ও লম্বা মুখের—এমন কত। আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অভিজ্ঞতা তাহার পর্যাপ্তেরও অধিক। এদের সম্বন্ধে এই বয়সেই তাহার আদেখ্‌লে-পনা ঘুচিয়াছে। ঠিক বিতৃষ্ণা নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার মনের এককোণে অত্যন্ত সঙ্গোপণে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাকে প্রথমে ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া। তের বৎসর পূর্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর একপ্রান্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন, তখন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে, নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোকে জানেই না। আজ গাড়ির মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স উনিশ-কুড়ি, সাজসজ্জা-আভরণ-

হীন দারিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের 'পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে—কিন্তু রাখালের মুগ্ধ চোখে মনে হইল, মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে রূপের পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা দেহের অক্ষুণ্ণ সুষমায়, না অন্তরের নীরব মহিমায়, রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল না। হাসপাতালে সে তার যথাসাধ্য,—সাধ্যেরও অধিক করিবে সংকল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখসাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণায় তাহার চোখের জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাঁধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়-ঘরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত ক্ষুধা। দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আয়োজন, কত মহার্ঘ প্রসাধন—কি তার অপব্যয়! পরস্পরের ঈর্ষা-কাতর নেপথ্য-আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বার বার চোখে দেখিয়াছে।

আর, সমাজের আর-একপ্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুণ্ঠিতশ্রী, এই অদৃষ্টপূর্ব মাধুর্য ইহাও কি অহংকৃত আত্মম্ভরিতায় তাহারা উপহাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল, কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগা কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জন দিয়াছিল। কি জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্বাক্ মেয়েটি আজ ধৈর্য হারাইয়াছে, তথাপি যে সংসার তাহাকে কিছুই দেয় নাই, ভিক্ষাপাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। যতদিন পারিয়াছে মুখ বুজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়তো সে শক্তি আর নাই—সে শক্তি নিঃশেষ যত—তাই কি আজ এ ধিক্কারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল, হাসপাতালের আঙিনায় গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। স্ট্রেচারের জন্য ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপনিই যেতে পারবো, এই বলিয়া সে সঙ্গিনীর দেহের 'পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

এখানে বৌটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ-সকল বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ যা লেখা ছিল তা ভোগ হলো, এখন বাড়ি চলুন। মেয়েটি শান্ত কালো চোখদুটি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া

রহিল, কোন কথা বলিল না। রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার নাম হলো মিসেস চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবো না। অথচ মুশকিল এই যে, কিছু-একটা বলে ডাকাও ত চাই।

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বললে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই ত। আমি বয়সে কত বড়। তা হলে, যাবার প্রস্তাবটা আমাকে এইভাবে করতে হয়—সারদা, এবার তুমি বাড়ি চলো।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো? নাম তো করা চলে না।

রাখাল বলিল, না চললেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল—রাখাল-রাজ। তাই ছেলেবেলায় নতুন-মা ডাকতেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা 'বাবু' জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ও একই কথা। আর গুরুজনেরা যা বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেবতা। আমিও আপনাকে দেবতা বলে ডাকবো।

ইঃ। বলো কি? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কানাকড়ির নেই সারদা!

নেই থাক। কিন্তু দেবতাত্ব ষোল আনায় আছে। আর, ব্রাহ্মণের ভালো-মন্দর আমরা বিচার করিনে করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরনটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল।

সারদা পল্লীগ্রামের কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং যতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিল না। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামে শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে এ যেন তাহার কেমন-কেমন ঠেকিল। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ-কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কহিল, বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ি চলো। এরা আর তোমাকে এখানে রাখবে না।

মেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ি চলো?

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বাড়ি-ভাড়া দেবো কি করে? তিন-চার মাসের বাকি পড়ে আছে, আমরা তাও ত দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্যে ভাবনা নেই।

সারদা সবিস্ময়ে কহিল, নেই কেন?

না থাকবার কারণ, বাড়ি-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায় বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন, কিংবা হয়তো এসেছেন, আমরা গিয়েই দেখতে পাবো।

না, তিনি আসেন নি।

না এসে থাকলেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেন না।

আসবেন না? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন —এ কি কখনো হতে পারে? নিশ্চয় আসবেন।

না।

না? তুমি জানলে কি করে?

আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিল না। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে হয় তোমার শ্বশুরবাড়ি, নয় তোমার বাপের বাড়িতে চলো। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

রাখাল একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে কি বাপের বাড়ি যেতে চাও?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল—এ তো বড় মুশকিল! এখানকার বাসাতেও যাবে না, বাপের ঘরেও যেতে চাও না,—কিন্তু চিরকাল হাসপাতালে থাকবার ত ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে ত?

প্রশ্নটা শেষ করিয়াই সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

ও কি সারদা, কাঁদচো কেন, আমি অন্যায় ত কিছু বলিনি।

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিল না। রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে—আমাকে মরতেও কেউ দিলে না।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় বিরক্ত হইল —এ অভিযোগটা যেন তাহাকেই। তথাপি কণ্ঠস্বর পূর্বের মতই সংযত রাখিয়া বলিল, মানুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারে না। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আর ভাবতেই যদি চাও, তারও অনেক সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ি ডেকে এনে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আরো ত অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অনুভব করিল কিনা বুঝা গেল না, রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি যে ভাড়া দিতে পারবো না দেবতা।

না পারো দিও না।

আপনি কি মাকে বলে দেবেন ?

রাখাল কহিল, না। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মত নিঃসহায় হয়ে আমিও একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাই। ভিক্ষে কি দিলেন জানো ? যা প্রয়োজন, যা চাইলাম,—সমস্ত। তারপরে হাত ধরে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এলেন,—অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে, বিদ্যে দান করে আমাকে এত বড় করলেন। আজ তাঁরই কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জি পেশ করতে ? না, তা করব না। যা করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ করতে হবে না।

মেয়েটি অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কখনো ত এ বাড়িতে দেখিনি ?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ বাড়িতে এসেছো ?

প্রায় দু'বছর।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোকে চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ যোগাড় হতে পারে না ?

রাখাল বলিল, পারে। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার উপর উপদ্রব ঘটতে পারে। তোমাদের ঘরের ভাড়া কত ?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ টাকা, কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন ? বাড়ি-আলাদের তো এ স্বভাব নয়।

সারদা বলিল, জানিনে। বোধ হয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাকবেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বলছি তোমার ভাবনা নেই, তুমি চল। আচ্ছা তোমার খেতে-পরতে মাসে কত লাগে ?

সারদা চিন্তা না করিয়াই কহিল, বোধ হয় আরও তিন-চার টাকা লাগবে।

রাখাল হাসিয়া, কহিল, তুমি বোধ হয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবে না। আচ্ছা, তুমি কি বাংলা লেখাপড়া জানো না ?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশী হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো-কুড়ি টাকা পর্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো ; কিন্তু যত্ন করে লিখতে হবে বেশ স্পষ্ট আর নির্ভুল হওয়া চাই। কেমন, পারবে তো ?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক লাগিল। অন্ধকার

গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপালোকে এই মেয়েটির আশ্চর্য রূপে যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই, এবার গাড়ি ডেকে আনি গে।

মেয়েটি বলিল, হাঁ আনুন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধ হয়, এইজন্যেই আমি যেতে পেলাম না, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ি আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল, সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে। একদিকে এই কটি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল নতুন-মার সন্ধানে উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ি নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে, বাড়ির মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে, সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ি পথের মধ্যে ভাড়া করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গিয়াছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সঙ্গে কে গেছে?

দাসী কহিল, কেউ না। দরোয়ানজীকেও দেখলুম বাইরে বসে আছে।

আর নবীনবাবু?

দাসী কহিল, আমাদের বাবু? তিনি ত রোজ আসেন না। এলেও রাত নটা-দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেন না তার মানে? না এলে থাকেন কোথায়?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, কেন, তাঁর কি বাড়ি-ঘরদোর নেই নাকি?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আর শিশুর দল, যাহারা তখন পর্যন্ত ঘুমায় নাই তাহাদের আনন্দ-কলরোলে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে সরিয়া গেল,—যে-প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি?

সারদা কহিল, না।

আশ্চর্য!

না, আশ্চর্য এমন আর কি।

বলো কি সারদা, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আর কিছু আছে নাকি?

সারদা ইহার জবাব দিল না। কহিল, আমি আলোটা জ্বালি, আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম করে আসি গে।

রাখাল কহিল, মা বাড়ি নেই।

সারদা কহিল, নেই? কোথাও গেছেন বোধ করি। হয় কালীঘাটে, নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখুনি ফিরবেন? আমি আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই,—একটু বসুন, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্যে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকী নেই সারদা, সে আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে—আজ সজ্ঞানে পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কথাটা অভাবনীয়ও নয়, অবাক হইবার মতোও নয়—সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের যত অল্প-শিক্ষিতাই হউক, তাহার সকৃতজ্ঞ চিত্ত-তলে এমন একটি সকরুণ প্রার্থনা নিতান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু কথাটির জন্য ত নয়, বলিবার অপরূপ বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল এবং বহু পরিচিত রমণীর মুখ ও বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল, আচ্ছা, আলো জ্বালো; কিন্তু আজ আমার কাজ আছে—কাল-পরশু আবার আমি আসবো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্তপোশে বসিল, পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্য কিছু আগাম সারদা।

কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই ত? প্রথমে হয়তো খারাপ হবে কিন্তু আমি নিশ্চয় শিখে নেবো। দেখবেন আমার হাতের লেখা? আনবো কালি-কলম? বলিয়া সে তখনই উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না, এখন থাক। আমি জানি তোমার হাতের লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন দেবতা?

রাখাল জবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ি নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

তাঁদের আনেন না কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে; ইহারও উত্তরে বলিল, শহরে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়তো তাহারও কোন পল্লী অঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়?

রাখাল বলিল, ঝি আছে।

রাঁধে কে? বামুনঠাকুর?

রাখাল সহাস্যে কহিল, তবেই হয়েছে। সামান্য একটি প্রাণীর রান্নার জন্যে একটা গোটা বামুনঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হলো।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে ঝি মেজে-ধুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

হাঁ, ঠিক তাই।

সে আর কি কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোনকিছু ভাবতে হয় না। আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলো তো? ঘরে জিনিসপত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না। আজ আমার সকলের ঘরে নেমন্তন্ন। কিন্তু আপনাকে গিয়ে ত রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবে না। যে করবার সে করে রেখেচে।

আচ্ছা, ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?

না হয়নি। তার বুড়ো-হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙ্গে পড়ে না।

কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায় না, হতেও তো পারে—তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলেও ভাবনা নেই। আমার বাসার কাছেই ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালবাসে, কষ্ট পেতে দেয় না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালবাসেন—

কে তোমাকে বললে?

আপনি নিজেই সেদিন হাসপাতালে বলছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খাননি, তৈরি করে আনবো? একটুখানি বসবেন?

কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো ঘরে নেই, কোথায় পাবে?

সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল, রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয় না।

তবে কিছু খাবার আনিয়ে দিই—দেবো? অনেকক্ষণ কিছু খাননি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

কিন্তু কে এনে দেবে? তোমার তো লোক নেই।

আছে। হারু আমার খুব কথা শোনে, তাকে বললেই ছুটে যাবে। বলিয়াই আবার তেমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারও রাখাল বারণকরিল।

সারদা জিদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া রাখালের আবার সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জানাশুনা, অনেক সভ্যতা ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটি সে যেন অনেকদিন হইল ভুলিয়া আছে। তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,—একখানি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় বেড়া দিয়া ঘেরা একটা ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙ্গা-পাড়ের কাপড়-পরা কে যেন রন্ধন করিতেন—হয়তো ইহার সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু সে তাহার মা—সেই মায়ের একান্ত অস্ফুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমনধারা করিয়া উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে করো না সারদা, আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা, তোমার জলখাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

এর মধ্যেই একদিন দিয়ে যাবো।

আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্য সে যেন ইতস্ততঃ করিতেছে অনুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বলবে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়তো আমার ঢের ভুল হবে। আপনি কিন্তু রাগ করবেন না। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না সারদা, আমি রাগ করবো না। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়িতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না।

সে গরীব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিদ্যার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই শহরের বহু গৃহ, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপনজন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের স্নেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিল না, অনুকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দিষ্ট উপেক্ষার ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল—তার বেশী নয়। ছেলে-টেলে পড়ায়, মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোন্‌খানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরানুগমনের আমন্ত্রণলিপি ডাক-যোগে অনেক আসে। প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে নাম তাহার বাদ যায় না, এবং না গেলে সেদিনে না

হউক, দুদিন পরেও এ কথা তাহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়িতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ; জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে; অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষোৎফুল্ল পিতা-মাতা সাধুবাদে দুই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। কৃতজ্ঞতার পারিতোষিক এমনি করিয়া চিরদিন এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো হয়তো চাকরির নিষ্ফল উমেদারির দিনগুলো মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কিন্তু সে এমনই বা কি!

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই-সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, আলাপ-আলোচনা, পড়াশুনা, হাসি-কান্না—এমন কত কি! ব্যক্ত-অব্যক্ত কত না চঞ্চল প্রণয়কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ!

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, বড় পরোপকারী। ছেলে-টেলে পড়ায়—মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেবতা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হয়তো সত্যই নাই। কিংবা—? হঠাৎ তাহার ভারী হাসি পাইল। নিজের মনেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

## পাঁচ

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দুইখানা পত্র পাইল—দুই-ই বিবাহের ব্যাপার। এক-খানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছেন, রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত রহিল এবং সংবাদটা নতুন-বৌকে যেন জানানো হয়। অন্যান্য কয়েকটা মামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন নানা হাঙ্গামায় সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবারে বিকালের দিকে নিজে তোমার বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিত মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে কর্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ যাঁর ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাইপোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই, সুতরাং বরকর্তা সাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে যাত্রা না করিলেই নয়,

অতএব শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কয়দিনের কামাইয়ের জন্য যে তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন নাই ইহাই রাখাল যথেষ্ট মনে করিল। সেই যাই হউক, মোটের উপর দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। 'এখন স্থগিত' থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হইলেও, পাগল বরের সহিত বিবাহ হইয়া যে চুকিয়া যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল। দ্বিতীয়, দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীনদিনের বহু স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন সে-সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষ্যে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।

পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সংবাদ পূর্বাহ্ণেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অনুক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া যে ঐ শান্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিল তাহা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতেই এ বিয়ে বন্ধ করা যেতো না।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমার অনুমানই সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ থামাতে পারতো না।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেন না, বলিলেন, যাই হোক, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাকবো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুনবো। আরও একটা কাজ হবে বাবা, আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সে নীচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ-সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিল না, বরঞ্চ, যথোচিত মর্যাদার সহিত তাহাকে তক্তপোশে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেবুতা, এতে কি আপনার কাজ চলবে?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশী হইয়া বার বার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভাল সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখাপড়া শেখ, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। হয়তো, তুমিই কত লোকের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট-

দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্চি, ফিরতে বোধ হয় দশ-বারো দিন দেরি হবে—এসে তোমার লেখা এনে দেবো—কি বলো? কিচ্ছু ভেবো না—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিল না দেবুতা—সেই-এখনও খরচ হয়নি।

তা হোক, তা হোক—এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয়, কার কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্যে চিন্তা কোনো না যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আসবো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব-বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্তা গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল, সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো,—সব খরচ তাদের। মনে রোখো, এ-পক্ষের তুমিই কর্তা. টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, জিনিসপত্র, সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁশিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হইবে না। কেবল একটা আশংকা ছিল লোকটার একঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে। সেখান উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজী করানো কঠিন হইবে; কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাস্টারি লইয়া বর্ধমানে চলিয়া যাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইল না। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া যাইবে না এমন হইতে পারে না। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকী, ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, না হয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সে সৌখিন মানুষ, এ-কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যাবার পূর্বে সে-সকল ঠিক করিয়া ফেলে চাই। সাহেববাড়ি হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বরকর্তার উপযুক্ত মর্যাদার জামা-কাপড় আলমারিতে কি-কি আছে দেখা দরকার, না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরি করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারক ত নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেকদিনের শখ, কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেন না। অফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন-দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিবগৃহেও অন্ততঃ একবারও যাওয়া চাই, না হইলে ছোটখাটো ভুলচুক ধরা পড়িবে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে

সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। শনিবারের বিকেলটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্যই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়তো কিছুই করা যাইবে না। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোস্টাফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে—তারকের কড়া নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতিবার পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুরবেলা পোস্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশি তুলিত হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে যাইবার মতো জামা-কাপড় নাই, তাহা হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুশকিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবে না। পোস্টাফিস হইতে একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল। লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল, সে বর্ধমানের কোন এক পল্লীগ্রাম হইতে সেই হেডমাস্টারির খবর দিয়েছে এবং আসিবার পূর্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে। নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, এবং পত্রের উপসংহারে আশা করিয়াছে, অনতিকাল মধ্যেই দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধে স্বয়ং ক্ষমাভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সংবাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক ট্যাক্সিভাড়াটা বাঁচল।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন-দশেক দেরি হইবে, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চৌকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা?

হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

ফিরতে দিন-আষ্টেক দেরি হবে বোধ হয়?

হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজলো রাজু?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়তো বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকাবাবুই দেরী করলেন;

দেরি হোক বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার ত আর কিছু নেই মা! তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেণুই ত নই, তোমার কাকা-বাবুও রহেছেই যে। আমি কেবলই ভাবি, ঐ নিরীহই মানুষটি না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ্য করেছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মামাবাবু, হেমন্তকুমারের চাকার মতো মস্ত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেছেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে সে ত এখনো জানতে পারা যায়নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্যে মা, চিরদিনের জন্যে। ঐ পাগলদের ঘরে আপনার রেণু কখনো পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন; কিন্তু ঐ দুর্বল মানুষটির কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা, কত রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বলবো কাকে?

রাখাল বলিল, কিন্তু ওঁকে কি আপনার খুব দুর্বল লোক বলে মনে হয় মা?

নতুন-মা একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দুর্বল-প্রকৃতির উনি ত চিরদিনই রাজু। তাতে আর সন্দেহ কি।

রাখাল বলিল, দুর্বল লোকে কি এত আঘাত নিঃশব্দে সইতে পারে মা? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসচেন।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-মা কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিতে দিইনি, শুনেছো নতুন-বৌ?

হাঁ শুনেচি। বোধ হয় খুব গোলমাল হলো।

সে তো হবেই নতুন-বৌ।

তুমি নির্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি করে তুমি এ-বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায় না, এ কথা সত্যি। কিন্তু তোমার মেয়ে, অথচ তোমারই বাধা দেবার হাত নেই,

কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকী আমাকেই তা বইতে হ'লো। সেদিন আমার বার বার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বৌ, মনে হচ্ছিল আজ যদি তুমি বাড়ি থাকতে, সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমি গড়ের মাঠে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললাম, আজ সে থাকলে তোমরা বুঝতে জুলুম করার সীমা আছে—সকলের ওপরেই সবকিছু চালানো যায় না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইল না। রাখালও তেমনি নির্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতে ইহার অধিক ভাঙিয়া বলিলেন না।

মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু, আজ বড় আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ-সাত দিন কারবারের কাগজপত্র নিয়ে ভারী খাটতে হয়েছে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব ভালো ত কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার সেই টাকাটা আমি বছর-খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখে-ছিলাম, ভেবেছিলাম, আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখচি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, না নিলে কি নষ্ট হবার ভয় আছে?

আছে বৈ কি নতুন-বৌ—বলা তো যায় না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট-দুই নিরুত্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো মেজকর্তা টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় ত যাবে। কিন্তু আমারো ত আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন ঠিক কথা নতুন-বৌ, এ দুঃসাহস করা আমার চলে না। তোমার টাকা আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

যদি আসতে বলো আসবো।

আর তোমার গয়নাগুলো?

তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন

হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বৌ, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি আমি রাগ করে—এমন কথা আজ তুমিও ভাবতে পারলে ?

সবিতা নতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বৌ, সরল মনে ফিরিয়ে দিতে চাইচি। তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্বাক হইয়া রহিলেন, কোন জবাব দিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা হ'লে যাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা করো না নতুন-বৌ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়িতে আমি দিল্লী যাচ্চি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট-দশদিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু, নিজে করবে না ?

রাখাল সহাস্যে কহিল, আমাকে মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু ?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। যারা আমাকে মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের বেশী নয়। বিশ্বাস না হয় তোমার নতুন-মাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞেস করো, তিনি সায় দেবেন। চললাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিলেন, তিনি অস্ফুটে বোধ হয় আশীর্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এমনি সময়ে ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিলমোহর করা একটা টিনের বাক্স। সবিতা পূর্বাহ্নেই আসিয়াছিলেন, বাক্সটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতরে তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখতে পাবে। আর এই নাও তোমার বায়ান্ন হাজার টাকার চেক। আজ আমি খালাস পেলাম নতুন-বৌ, আমার বোঝা হয়ে বেড়াবার পালা সাঙ্গ হ'লো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ-সব গয়না তোমার রেণু পরবে ?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু ?

রাখাল সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ী হয়ে সকলকে নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে কিনা—

তবে আমি উঠি। কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা করো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন, কিন্তু আজ ত তোমার নতুন-মার একলা যাওয়া উচিৎ নয়। কেউ পৌঁছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মার দরোয়ান, নিজের মোটর, সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

ওঃ—আছে? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তাহলে?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো লইলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাব মেজকর্তা?

যেদিন বলে পাঠাবে, আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ?

না, কাজ কিছু নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এমনিই দেখতে চাও?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ-সবের প্রয়োজন নেই নতুন-বৌ। আমার জন্যে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখো না, যা কপালে লেখা ছিল ঘটেছে—গোবিন্দ মীমাংসাও তার একরকম করে দিয়েচেন,—আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস করো না নতুন-বৌ, আমি সত্যি কথাই বলচি।

সবিতা তেমনিই অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। অবিলম্বে গাড়ি ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে। এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্তসমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখতে চাও কি নতুন-বৌ?

না মেজকর্তা, সে প্রার্থনা আমি করিনে।

তবে কাঁদচো কেন? কি আমার কাছে তুমি চাও?

যা চাইবো দেবে বলো?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্তা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ-সাড়া পাওয়া গেল, সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল কহিল,

নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞেসা করছিল, আর দেরি কতো ? চলুন না তার বাক্সটা আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি ?

নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে, আমি ও আপদবালাই।

রাখাল হাতজোড় করিয়া জবাব দিল, মায়ের মুখে ও-নালিশ অচল নতুন-মা এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ মার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে আর যেতে দিচ্চিনে মা—যত কষ্ট ছেলের ঘরে হোক।

সবিতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভু বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভালোমানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেন না বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বৌ, বাক্সটা তোমার গাড়িতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজের বাক্সটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

## ছয়

বিবাহ দিয়া রাখাল দিন দশ-বার পরে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিল। বর বাহুল্য, বরকর্তার কর্তব্যে তাহার ত্রুটি ঘটে নাই এবং কর্তা-গিন্নী অর্থাৎ মনিব ও মনিব গৃহিণী তাহার কার্যকুশলতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাহার এই কয়টা দিনের দিল্লী প্রবাস কেবল এইটুকুমাত্র ঘটনাই নয় তথায় সে রীতিমত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একা ফল এই হইয়াছে যে, বিবাহযোগ্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্র হিসাবে তাহাকে কয়েকটি মেয়ে দেখানো হইয়াছে। সাদামাটা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, পশ্চিমে থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু অভিভাবকগণের নানা অসুবিধায় এখনো পাত্রস্থ করা হয় নাই। পীড়াপীড়ির উত্তরে রাখাল বলিয়া আসিয়াছে যে কলিকাতায় তাহার কাকাবাবু ও নতুন-মার অভিমত জানিয়া পরে চিঠি লিখিবে তাহার এ সৌভাগ্যের কারণ বন্ধু যোগেশ। সে বরযাত্রীর দলে ভিড়িয়া নিখরচা দিল্লী, হস্তিনাপুর, কেল্লা, কুতুব মিনার ইত্যাদি এ-যাবৎ লোকমুখে শুনা দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় দেখিতে পাইয়াছে, অতএব বন্ধুকৃত্য বাকী রাখে নাই, কৃতজ্ঞতার ঋণ ষোল আনায় পরিশোধ করিয়াছে। সে কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাখালবাবু আজ

বিবাহ করেন নাই কেন? যোগেশ জবাব দিয়াছে, ওর শখ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওদের মিলবে এমন আশা করাই যে অন্যায়। কন্যাপক্ষীয় সংকোচে প্রশ্ন করিয়াছে, উনি কলিকাতায় করেন কি? যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছে, বিশেষ কিছু নয়। তার পর মুচকিয়া হাসিয়াছে, করার দরকারই বা কি!

এ কথার নানা অর্থ।

কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের বিবিধ তথ্য রাখালের মুখে-মুখে। বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত নাম জানা। নূতন ব্যারিস্টার, সদ্য পাস-করা আই-সি-এস-দের উল্লেখ সে ডাক-নাম ধরিয়া করে। পচু বোস, ডম্বল সেন, পটল বাঁড়ুয্যে—শুনিয়া অত দূরপ্রবাসের সামান্য চাকরি-জীবি বাঙালীরা অবাক হইয়া যায়; কিন্তু এতকাল বিবাহের কথায় রাখাল শুধু য মুখেই আপত্তি করিয়াছে তাই নয়, মনের মধ্যেও তার ভয় আছে। কারণ, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অচেতন নয়। সে জানে, এই কলিকাতা শহরে তাহার পরিচিত বন্ধু-পরিধি যথেষ্ট সংকুচিত না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা তাহার সাধ্যাতীত। যে-পরিবেষ্টনে এতকাল সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে, সেখানে ছোট হইয়া থাকার কল্পনা করিতেও পরাঙ্মুখ। তথাপি, নিঃসঙ্গ জীবনের নানা অভাব তাহাকে বাজে। বসন্তে বিবাহোৎসবের বাঁশি মাঝে মাঝে তাহাকে উতলা করে, বরানুগমনের সাদর আমন্ত্রণে মনটা হয়তো হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে, সংবাদপত্রে কোথায় কোন্ আত্মঘাতিনী অনূঢ়া কন্যার পাণ্ডুর মুখ অনেক সময়ে তাহাকে যেন দেখা দিয়া যায়, হয়তো বা অকারণ অভিমানে কখনো মনে হয়, সংসারে এত প্রাচুর্য, এত অভাব, এত সাধারণ, এত নিরন্তনের মধ্যে শুধু সেই কি কাহারো চোখে পড়ে না? শুধু তাহাকেই মালা দিতে কোথাও কোন কুমারীই কি নাই?

কিন্তু এ-সকল তাহার ক্ষণিকের। মোহ কাটিয়া যায়, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পায়—হাসে, আমোদ করে, ছেলে পড়ায়, সাহিত্যালোচনায় যোগ দেয়,—আহ্বান আসিলে বিবাহের আসর সাজাইতে ছোটে, নব বর-বধূকে ফুলের তোড়া দিয়া শুভকামনা জানায়। আবার দিনের পর দিন যেমন কাটিতেছিল তেমনি কাটে। এতদিনের এই মনোভাবের এবার একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে দিল্লী হইতে ফিরিয়া। এবারে সে দেখিয়াছে কলিকাতাই সমস্ত দুনিয়া নয়, ইহারও বাহিরে বাঙালী বাস করে, তাহারাও ভদ্র,—তাহারাও মানুষ। তাহাকেও কন্যা দিতে প্রস্তুত এমন পিতা-মাতা আছে। কলিকাতায় যে সমাজ ও যে-মেয়েদের সংস্পর্শে সে এতকাল আসিয়াছে, প্রবাসের সাধারণ ঘরের সে মেয়েগুলি হয়তো অনেক বিষয়ে খাটো। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হয়তো আজও তাহার লজ্জা করিবে, তথাপি এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, বল ভরসা দিয়াছে।

সংসারে কাহারো ভার গ্রহণের শক্তি তাহার নেই। পরের মুখে-শেখা এই আত্ম-অবিশ্বাস এত দিন সকল বিষয়েই তাহাকে দুর্বল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে স্ত্রী-

পুত্র কন্যা—তাহাদের কতদিকে কতরকমে প্রয়োজন, খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ শোক বিদ্যা অর্জন—দাবীর অন্ত নাই। এ মিটাইবে সে কোথা হইতে? কিন্তু তাহার এই সংশয়ে প্রথম কুঠার হানিয়াছে সারদা,—অকূল সমুদ্র-মাঝে সে সেদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে—প্রত্যুত্তরে তাহাকেও যেদিন সে অভয় দিয়া বলিয়াছে, তোমার ভয় নাই সারদা, আমি তোমার ভার নিলাম। সারদা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে,—বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই পরের বিশ্বাসই রাখালকে এতদিনে নিজের প্রতি বিশ্বাসবান্ করিয়াছে। আবার এই বস্তুটাই তাহার বহুগুণে বাড়িয়া গেছে, এবার প্রবাস হইতে ফিরিয়া। তাহার কেবলই মনে হইয়াছে সে অক্ষম নয়, দুর্বল নয়, সংসারে অনেকের মতো সেও অনেক-কিছু পারে। এই নবজাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ চিত্ত লইয়া সে প্রথমেই দেখা করিতে গেল সারদার সঙ্গে। ঘরে তালা বন্ধ। একটি ছোট ছেলে খেলা করিতেছিল; সে বলিল, বৌদি গেছে ওপরে গিন্নীমার ঘরে,—রাত্তিরে আমাদের সকলের নেমন্তন্ন।

রাখাল উপরে গিয়া দেখিল সমারোহ ব্যাপার, লোক-খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন চলিতেছে। রমণীবাবু অকারণে অতিশয় ব্যস্ত, কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করিতেছেন এবং সারদা কোমরে কাপড় জড়াইয়া জিনিসপত্র ভাঁড়ারে গুছাইয়া তুলিতেছে। রমণীবাবু যেন বাঁচিয়া গেলেন—এই যে রাজু এসেছে। নতুন-বৌ?

সবিতা অন্যত্র ছিলেন, চীৎকারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেছে—রাজু এসে পড়েছে। বাবা, এখন থেকে সব ভার তোমার।

সবিতা বলিলেন, সেই ভালো, তুমি এখন ঘরে গিয়ে একটু জিরোও গে, আমরা নিস্তার পাই।

সারদা অলক্ষ্যে একটু হাসিল; রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, কবে এলেন?

কাল।

কাল? তবে কালকেই এলেন না যে বড়ো?

অনেক কাজ ছিল, সময় পাইনি।

সবিতা সহাস্যে বলিলেন, ওকে মরা বাঁচিয়েছে বলে রাজুর ওপর মস্ত দাবী।

সারদা সন্দেশের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া গেল।

রাখাল রমণীবাবুকে নমস্কার করিল এবং সবিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত ধুমধাম কিসের নতুন-মা?

সবিতা স্মিতমুখে কহিলেন, এমনিই।

রমণীবাবু বলিলেন, হুঁ—এমনিই বটে, সেই মেয়ে তুমি। পরে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, উনি আধামূল্যে একটা মস্ত সম্পত্তি খরিদ করলেন, এ তারই খাওয়া। আমার সিঙ্গাপুরের পার্টনার এসেছে কলিকাতায়—বি, সি, ঘোষ নাম শুনেছো? শোনোনি—আচ্ছা, আজ রাত্তিরে তাকে দেখতে পাবে, কোটী টাকার মালিক। আরও আছে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব, উকিল-এটর্নী, মায় দু-

তিনজন ব্যারিস্টার পর্যন্ত। একটু গান-বাজনাও হবে—খাসা গাইছে আজকাল মালতীমালা—শুনে সুখ পাবে হে। সবিতা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই বলিয়া উঠিলেন, নাও, ছলনা রাখো। কিন্তু কপাল করেছিলে বটে! দেশে থাকতে কোন এক শালাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেটেই হঠাৎ আদায় হয়ে গেল। ডোবা কড়ি বাবাজী, ডোবা কড়ি,—এমন কখনো হয় না। নিতান্তই বরাতের জোর! ব্যাটা ভয়ে পড়ে কেমন দিয়ে ফেললে! কিন্তু তাতেই কি কুলোলো? হাজার-দশেক কম পড়ে যায়, আমাকে আবদার ধরলেন, সেজবাবু, ওটা তুমি দিয়ে দাও। বললুম, শ্রীচরণে অদেয় কি আছে বলো? এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার! এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত অরুচিকর স্থূল রসিকতার আনন্দে নিজেই হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাখাল লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমণীবাবু চলিয়া গেলে সবিতা বলিলেন, বেলা হলো, এইখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে নাও বাবা, ও-বেলায় তোমাকে আবার অনেক খাটতে হবে। অনেক কাজ।

রাখাল কহিল, কাজে ভয় পাইনে মা, খাটতেও রাজী আছি, কিন্তু এ-বেলাটা নষ্ট করতে পারবো না। আমাকে ও-বাড়িতে একবার যেতে হবে।

কাল গেলে হয় না?

না।

তবে কখন আসবে বলো?

আসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন কি করে বলবো মা?

তারক এখানে নেই বুঝি?

না, সে তার বর্ধমানের মাস্টারিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। থাকলেও হয়তো আসতো না।

তাহার তীব্র ভাবান্তর সবিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটু প্রসন্ন করিতে কহিলেন, ওঁর ওপর রাগ করো না রাজু, ওঁদের কথাবার্তাই এমনি।

এই ওকালতিতে রাখাল মনে মনে আরও চটিয়া গেল, বলিল, না মা, রাগ নয়, একটা গরুর ওপর রাগ করতে যাবোই বা কিসের জন্যে। বলিয়াই চলিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কহিল, নাঃ—কৃতজ্ঞতার ঋণ মনে রাখা কঠিন।

যদিচ, রাখাল মনে মনে বুঝিয়াছে, যে-লোকটি নতুন-মার অত টাকার দেনা শোধ করিয়াছে তাহার নাম রমণীবাবু জানে না, তথাপি সেই ধর্মপ্রাণ সদাশয় মানুষটির প্রতি এই অশিষ্ট ভাষা সে ক্ষমা করিতে পারিল না। অথচ নতুন-মা আমলই দিলেন না, যেন কথাটা কিছুই নয়। পরিশেষে তাঁহারই প্রতি লোকটার কদর্য রসিকতা। কিন্তু এবার আর তাহার রাগ হইল না; বরঞ্চ উহাই যেন তাহার মনের জ্বালাটাকে হাঠৎ হালকা করিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিকই হয়েছে। এই ওঁর প্রাপ্য। আমি মিথ্যে জ্বলে মরি।

বৌবাজারে ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া ব্রজবিহারীবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া রাখালের মনে হইল তাহার চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে—সে আর কোথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি! দরজায় তালা দেওয়া, উপরের জানালাগুলো সব বন্ধ—একটি নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া গলির মোড়ে মুদির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানী অনেকদিনের, এ-অঞ্চলের সকল ভদ্রগৃহেই সে মাল যোগায়। গিয়া ডাকিল, নবদ্বীপ, কাকাবাবুর বাড়ি ভাড়া কি-রকম?

নবদ্বীপ তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানেন না রাখালবাবু?

না, আমি এখানে ছিলাম না।

নবদ্বীপ কহিল, দেনার জন্য বাবু বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন যে।

বাড়ি বিক্রি করে দিলেন! কিন্তু তাঁরা সব কোথায়?

গিন্নী নিজের মেয়ে নিয়ে গেছেন ভায়ের বাড়ি। ব্রজবাবু রেণুকে নিয়ে বাসা ভাড়া করেছেন।

বাসাটা চেনো নবদ্বীপ?

চিনি, বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি গলিটার দুখানা বাড়ির পরেই সতের নম্বরের বাড়ি।

সতের নম্বরে আসিয়া রাখাল দরজায় কড়া নাড়িল, দাসী খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, ফটিকের মা, কাকাবাবু কোথায়?

ওপরে রান্না করচেন।

বামুন নেই?

না!

চাকর?

মধু আছে, সে গেছে ওষুধ আনতে।

ওষুধ কেন?

দিদিমণির জ্বর, ডাক্তার দেখচে।

রাখাল কহিল, জ্বরের অপরাধ নেই। করে এখানে আসা হ'লো?

দাসী বলিল, চার দিন। চার দিনই জ্বরে পড়ে।

ভিজা স্যাঁতসেঁতে উঠানময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সিঁড়িটা ভাঙ্গা, রাখাল উপরে উঠিয়া দেখিল সামনের বারান্দার এককোণে লোহার উনুন জ্বালিয়া ব্রজবাবু গলদঘর্ম। সাগু নামিয়াছে, রান্নাও প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু হাত পুড়িয়াছে, তরকারি পুড়িয়াছে, ভাত ধরিয়া চোঁয়া গন্ধ উঠিয়াছে।

রাখালকে দেখিয়া ব্রজবাবু লজ্জা ঢাকিতে বলিয়া উঠিলেন, এই দ্যাখো রাজু,

ফটিকের মার কাণ্ড! উনুনে এত কয়লা ঢেলেছে যে আঁচটা আন্দাজ করতে পারলাম না। ফ্যানটা যেন—একটু গন্ধ মনে হচ্ছে, না?

রাখাল কহিল, তা হোক। আপনি উঠুন ত কাকাবাবু, বেলা বারোটা বেজে গেছে—গোবিন্দর পুজোটি সেরে নিন, আমি ততক্ষণে নতুন করে ভাতটা চড়িয়ে দিই—ফুটে উঠতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। রেণু কৈ? বলিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে নিজের বিছানায় শুইয়া। রাজুদাকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। রাখাল কোনমতে নিজেরটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, কান্নাটা কিসের? জ্বর কি কারো হয় না? ও দু'দিনে সেরে যাবে, আর আমি ত মরিনি রেণু, ভাবনার কি আছে? উঠে বসো? মুখ-ধোয়া, কাপড়-ছাড়া হয়েছে ত?

রেণু মাথা নাড়িতেই রাখাল চেঁচাইয়া ডাকিল, ফটিকের মা, তোমার দিদিমণিকে সাগু দিয়ে যাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সে আসিলে বলিল, ভাতটা ধরে গেছে ফটিকের মা, ওতে চলবে না। তুমি, আমি, মধু আর কাকাবাবু—চারজনের মতো চাল ধুয়ে ফেলো, আমি নীচে থেকে চট করে স্নানটা সেরে আসি। কাঁচা আনাজ কিছু আছে ত?

আছে।

বেশ, তাও দুটো কুটে দাও দিকি, একটা চচ্চড়ি রেঁধে নিই,—আমি আবার এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারিনে?

রেলিঙের উপর কাচা-কাপড় শুকাইতেছিল, রাখাল টানিয়া লইয়া নীচে চলিল, বলিতে বলিতে গেল, কাকাবাবু, দেরি করবেন না, শিগগির উঠুন। রেণু, নেয়ে এসে যেন দেখতে পাই তোমার খাওয়া হয়ে গেছে। মধু এসে পড়লে যে হয়—

বিষণ্ণ, নীরব গৃহের মাঝে হঠাৎ কোথা হইতে যেন একটা চেঁচামেচির ঝড় বহিয়া গেল।

স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাল ভিজা মেজেয় পড়িয়া মিনিট দুই-তিন হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল—ছেলেবেলায়, অকস্মাৎ যেদিন বিসূচিকায় তার বাপ মরিয়াছিল ঠিক সেদিনের মতো। তার পরে উঠিয়া বসিল; ঘটি-কয়েক জল মাথায় ঢালিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একেবারে সহজ মানুষ,—কে বলিবে ঘরে কপাট দিয়া এইমাত্র সে বালকের মতো মাটিতে পড়িয়া কি কাণ্ডই করিতেছিল।

রাঁধায়-বাড়ায় রাখাল অপটু নয়। নিজের জন্য এ কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হয়। সে অল্পক্ষণেই সমস্ত সারিয়া ফেলিল। তাহার তাড়ায় ঠাকুরের পূজা, ভোগ প্রভৃতি সমাধা হইতেও আজ অযথা বিলম্ব ঘটিল না। রাখাল পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া নীচে হইতে গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া, আবার যখন উপরে আসিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রেণু অদূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, শেষ হইতে বলিল, রাজুদা, তুমি

আমাদেরও হারিয়েছো। তোমার যে বৌ হবে সে ভাগ্যবতী; কিন্তু বিয়ে কি তুমি করবে না?

রাখাল হাসিয়া বলিল, কি করে করবো ভাই, অতবড় ভাগ্যবতীর দেখা মিলবে তবে ত?

না, সে হবে না। বাবাকে ধরে এবার নিশ্চয়ই তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দেবো।

তাই দিও, আগে সেরে ওঠো। বিনোদ ডাক্তার আজ কি বললে? জ্বরটা ছাড়চে না কেন?

ফটিকের মা দাঁড়িয়েছিল, বলিল, ডাক্তারবাবু আজ ত আসেন নি, এসেছিলেন পরশু। সেই এক ওষুধই চলচে।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার শাঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া রেণু লজ্জা পাইয়া কহিল, রোজ ওষুধ বদলানো বুঝি ভালো! আর মিছিমিছি ডাক্তারকে টাকা দিতে থাকলেই বুঝি অসুখ সেরে যায় ফটিকের মা? আমি এতেই ভালো হয়ে যাবো তোমরা দেখে নিও।

রাখাল কথা কহিল না, বুঝিল দুর্দশায় পড়িয়া সামান্য গুটিকয়েক টাকাও আর সে পিতার খরচ করাইতে চাহে না।

তুমি কি চলে যাচ্ছো রাজুদা?

আজ যাই ভাই, কাল সকালেই আবার আসবো।

নিশ্চয় আসবে ত?

নিশ্চয়ই আসবো। আমি না আসা পর্যন্ত কাকাবাবুকে উনুনের কাছেও যেতে দিও না রেণু।

শুনিয়া রেণু কত যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল, কাল যদি আমার জ্বর না থাকে আমি রাঁধবো রাজুদা?

কিছুতেই না। ঝিকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল, আমি না এলে কাউকে কিছু করতে দিও না ফটিকের মা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ ডাক্তার পাড়ার লোক, একটু দূরে বাড়ি—নীচের তলায় ডিসপেনসারি, সেখানে তাঁহার দেখা মিলিল; রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর জ্বরটা কি রকম ডাক্তারবাবু? আজও ছাড়েনি কেন?

বিনোদবাবু বলিলেন, আশা করি সহজ। কিন্তু আজও যখন—তখন দিন-দুই না গেলে ঠিক বলা যায় না রাখাল।

ডাক্তার এই পরিবারের বহুদিনের চিকিৎসক, সকলকেই জানেন। ইহার পর ব্রজবাবুর আকস্মিক দুর্ভাগ্য লইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, শেষে বলিলেন, তুমি যখন এসে পড়েচো রাখাল, তখন ভাবনা নেই। আমি সকালেই যাবো।

নিশ্চয় যাবেন ডাক্তারবাবু, আমাদের ডাকবার লোক নেই।

ডাকবার দরকার নেই রাখাল, আমি আপনিই যাবো।

সেখান হইতে ফিরিয়া রাখাল নিজের বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাবুর দুর্দশা যে কত বৃহৎ ও সর্বনাশের পরিমাণ যে কিরূপ গভীর, নানা কাজের মধ্যে এ কথা এখনো সে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, নির্জনে ঘরের মধ্যে এইবার তাহার দু'চোখ বাহিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোথায় যে ইহার কূল এবং এই দুঃখের দিনে সে যে কি করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কি করিয়া যে এত শীঘ্র এমনটি ঘটিল তাহা কল্পনার অগোচর। তার উপর রেণু পীড়িত। পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর হইতেছে সে জানিত, ডাক্তারের কথার মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করিয়াছে। উপদেশ দিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই, চিকিৎসা করাইবার অর্থও হয়তো হাতে নাই। এই নিরীহ নির্বিরোধী মানুষটির কথা আগাগোড়া চিন্তা করিয়া তাহার সংসারে ধর্মবুদ্ধি, ভগবৎভক্তি, সাধুতা সকলের পরেই যেন ঘৃণা ধরিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল দিল্লী হইতে ফিরিয়া নানাবিধ অপব্যয়ে তাহার নিজের হাতও শূন্য, পোস্টাফিসে সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার 'পরে একটা দিনও নির্ভর করা চলে না, অথচ, এই রেণু তাহার কাছেই একদিন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ থাক। তাহারই চিকিৎসার তাহারই কাছে গিয়া হাত পাতিবে সে কি করিয়া? যদি না থাকে। সে জানে, যে-বাটীতে সে ছেলে পড়ায় তাঁহারা অত্যন্ত কৃপণ। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে সত্য, কিন্তু সেখানে আবেদন করা তেমনি নিষ্ফল। অনেক 'বড়লোক গোপনে তাহারই কাছে ঋণী, সে-ঋণ নিজে সে না ভুলিলেও তাঁহারা ভুলিয়াছেন।

সহসা মনে পড়িল নতুন-মাকে। কিন্তু দীপশিখা জ্বলিয়াই স্তিমিত হইয়া আসিল—সেখানে দাও বলিয়া দাঁড়ানোর কল্পনাও তাহাকে কুণ্ঠিত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবেই বা কি এবং বলিবেই বা কি করিয়া। এ পথ নয়, কিন্তু আর-একটা পথও তাহার চোখে পড়িল না; কিন্তু সে বলিলে ত চলিবে না, পথ তাহার চাই-ই—তাহাকে পাইতেই হইবে।

দাসী আসিয়া খাবার কথা বলিলে সে নিষেধ করিয়া জানাইল তাহার অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। এমন প্রায়ই থাকে।

ঝি চলিয়া গেলে সে-ও দ্বারে চাবি দিল। রাখাল শৌখিন লোক, বেশভূষার সামান্য অপরিচ্ছন্নতাও তাহার সহ্য হয় না, কিন্তু আজ সে কথা তাহার মনেই পড়িল না, যেমন ছিল তেমনিই বাহির হইয়া গেল।

নতুন-মার বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে খান-কয়েক মোটর দাঁড়াইয়া, বৃহৎ অট্টালিকা বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ-দীপালোকে সমুজ্জ্বল, দ্বিতলের বড় ঘরে বাদ্যযন্ত্র বাঁধাবাঁধির শব্দ উঠিয়াছে, গৃহস্বামিনী নিরতিশয় ব্যস্ত—ভাগ্যবান আমন্ত্রিতগণের আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি না ঘটে—

অথচ দিল্লী যাবার আগেও এমন দেখে যাননি। আজ গিয়ে দেখেন শয্যাগত মেয়েটিকে দেখবার কেউ নেই—বুড়ো বাপ আপনি বসেছে রাঁধতে—কিন্তু জানে না কিছুই—হাত পুড়েচে, ভাত পুড়েচে, তরকারি পুড়ে গন্ধ উঠেছে—রাখালবাবুকে সমস্ত আবার রাঁধতে হলো, তবে সকলের খাওয়া হয়। তাই এখানে আসতে তাঁর দেরি। আমাকে বলেছিলেন, এ দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করতে। মেয়েটির ত মা নেই—তাকে একটু দেখতে। আমি রাজী হয়ে বলেচি, যা আপনি আদেশ করবেন তাই আমি করব।

সারদা পান দিল। সেটা তাঁর হাতে ধরাই রহিল; জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজু বললে হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার দায়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল? দিল্লী যাবার আগেও তা দেখে যায়নি?

হাঁ, তাই ত বললেন।

অসম্ভব।

সারদা চুপ করিয়া রহিল। সবিতা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, রাজু বললে মেয়েটির মা নেই—মারা গেছে বুঝি?

সারদা বলিল, মা যখন নেই তখন মরে গেছে নিশ্চয়, আর কি হ'তে পারে মা?

সবিতা উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিবাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরনে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে-সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে ম্লান,—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

কোথায় মা?

রাজুর বাসায়।

এই রাত্তিরে? আমি নিশ্চয় বলচি মা, তিনি দুঃখ একটু করেছেন, কিন্তু রাগ করে চলে যাননি। তা ছাড়া, বাড়িতে কত কাজ, কত লোক এসেচে, সবাই খুঁজবে যে মা?

কেউ জানতে পারবে না সারদা, আমরা যাবো আর আসবো।

সারদা সন্দিগ্ধস্বরে কহিল, ভাল হবে না মা, হয়তো একটা গোলমাল উঠবে। বরঞ্চ কাল দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

সবিতা কয়েক-মুহূর্ত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আজ রাত্তির যাবে, কাল সকাল যাবে, তারপরে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে যাবো? ততক্ষণে যে পাগল হয়ে যাবো সারদা?

এই উৎকণ্ঠার হেতু সারদা বুঝিল না, কিন্তু আর আপত্তিও করিল না,—নীরব হইয়া রহিল।

যে-দরজায় ভাড়াটেরা যাতায়াত করে সেখানে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মিনিট-দুই পরে পথচারী একটা খালি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

চোখ পড়িল ঠিক উপরেই—আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষটি তখন সঙ্গীতে হাস্যে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। একটি রুমালে বাঁধা বান্ডিল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখো ত মা, রাজু আমার হাত থেকে হয়তো নেবে না—তুমি তাকে দিও।

দশ মিনিট পরে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া রাখালের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন বাহিরে হইতে কবাট বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। দুজনে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে বসিলেন এবং আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌবাজারের একটা বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ি থামিল। নামিতে হইল না, দেখা গেল সে গৃহেরও দ্বার রুদ্ধ। পথের আলো উপরের অবরুদ্ধ জানালায় গিয়া পড়িয়াছে; সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে।

নিদারুণ বিপদের মুখে নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিবার শক্তি সবিতার অসাধারণ। তাঁহার মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত পড়িল না, গৃহে ফিরিবার আদেশ দিয়া গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া পাষাণ মূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ঠিক কি হইয়াছে অনুমান করা সারদার কঠিন, কিন্তু সে এটা বুঝিল যে, রাখাল মিথ্যা বলিয়া আসে নাই এবং সত্যই ভয়ানক কি-একটা ঘটিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে সবিতার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কার বাড়ি মা? এই বাড়িই বিক্রি হয়ে গেছে?

হাঁ।

এঁর মেয়ের অসুখের কথাই তিনি বলছিলেন?

জবাব না পাইয়া সে আবার আস্তে আস্তে বলিল, কোথায় তাঁরা আছেন খোঁজ নেওয়া যে দরকার।

কোথায়, কার কাছে খোঁজ নেবো সারদা?

কাল নিশ্চয় রাখালবাবু আমাকে নিতে আসবেন।

কিন্তু যদি না আসে? আমার বাড়িতে আর যদি সে পা দিতে না চায়?

সারদা চুপ করিয়া রহিল। রাখাল টাকা চাহিয়াছে, তিনি দিতে পারেন নাই; এইটুকু মাত্রকে উপলক্ষ করিয়া নতুন-মার এতবড় উৎকণ্ঠা আবেগ ও আত্মগ্লানিতে তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত ধাঁধা লাগিল; তাহার সন্দেহ জমিল বিষয়টা বস্তুতঃ এই নয়, ভিতরে কি একটা নিষ্ঠুর রহস্য আছে। সবিতা যে রমণীবাবুর পত্নী নয়—এ কথা না জানার ভান করিলেও বাটীর সকলেই মনে মনে বুঝিত। তাহারা ভান করিত ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সবাই জানিত এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—আচারে আচরণে বড়, হৃদয়ে বড়, দয়া-দাক্ষিণ্যে ও সৌজন্যে আরও বড় তাই তাঁহার এ দুর্ভাগ্য কাহারও উল্লাসের বস্তু ছিল না, ছিল পরিতাপ ও গভীর লজ্জার। দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়া সকলে তাঁহাকে এতই ভালবাসিত।

গলির মোড় ঘুরিতে কোন-একটা দোকানের তীব্র আলোর রেখা আসিয়া পলকের জন্য সবিতার মুখের' পরে পড়িল ; সারদা দেখিল, তাতে যেন প্রাণ নাই, হাতের তালুটা হঠাৎ মনে হইল, অতিশয় শীতল, সে সভয়ে একটা নাড়া দিয়া ডাকিল, মা ?

কেন মা ?

বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন সাড়া নাই—অন্ধকারেও সারদার মনে হইল, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, সে সাহস করিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিল তাই বটে। সযত্নে আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, মা, আমি আপনার মেয়ে, আমার আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।

কথাগুলি সামান্যই। সবিতা উত্তরে কিছুই বলিলেন না, শুধু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের 'পরে টানিয়া লইলেন। অশ্রুবাষ্পের নিরুদ্ধ আবেগে সমস্ত দেহটা তাঁহার বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা সারদার মাথার উপরে একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুজনে বাড়ি ফিরিয়া যখন আসিলেন তখনও মালতীমালার গান চলিতেছে—তাঁহাদের স্বল্পকালের অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করে নাই। সবিতা নীচ হইতে স্নান করিয়া গিয়া উপরে উঠিতে ঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, মা, এখন নেয়ে এলে ? মাথা ঘুরছিল বোধ করি ?

হাঁ।

তাহলে কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়ো গে মা, সারাদিন যে খাটুনি হয়েছে।

সারদা কহিল, এদিকে আমি আছি মা, কোন ভাবনা নেই। দরকার হলেই আপনাকে ডেকে আনবো।

তাই এনো সারদা, আমি একটু শুই গে।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কোনমতে চুকিল, অভ্যাগতেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন, খাটের শিয়রে বসিয়া সারদা ধীরে ধীরে সবিতার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল ; ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে রমণীবাবু প্রবেশ করিয়া তিক্ত স্বরে কহিলেন, আচ্ছা খেলাই খেললে। বাড়িতে কোন একটা কাজ হ'লে তোমারও কোন-একটা ঢং করা চাই। এ তোমার স্বভাব। লোকেরা গেছে—এবার নাও, ছলা কলা রেখে একটু উঠে বসো,—একখানা ভালো কাপড় অন্ততঃ পরো—বিমল-বাবু দেখা করতে আসচেন।

এরূপ উক্তি অভাবিত নয়, নূতনও নয়। বস্তুতঃ এমনিই কিছু একটা সবিতা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিল, ক্লান্তস্বরে বলিল, দেখা কিসের জন্যে ?

কিসের জন্যে ! কেন, তারা কি ভিখিরী যে খেতে পায় না ? বাড়িতে নেমন্তন্ন অথচ বাড়ির গিন্নীরই দেখা নেই। বেশ বটে !

সবিতা কহিল, নেমন্তন্ন হলেই কি বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা প্রথা নাকি ?

রমণীবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, প্রথা নাকি ? প্রথা নয় জানি—স্ত্রী হলে আলাপ-পরিচয় করতে কেউ চায় না—কিন্তু তারা সব জানে।

সারদার সম্মুখে সবিতা লজ্জায় মরিয়া গেল। সারদা নিজেও পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। এদিকে উত্তেজনা পাছে হাঁকাহাঁকিতে দাঁড়ায়, এই ভয় সবিতার সবচেয়ে বেশী, তাই নম্রভাবেই কহিলেন, আমি বড় অসুস্থ, তাঁকে বলো গে আজ দেখা হবে না।

কিন্তু ফল হইল উলটা। এই সহজ কণ্ঠের অস্বীকারে রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, চেঁচাইয়া উঠলেন—আলবৎ দেখা হবে। সে কোটিপতি লোক তা জানো ? বছরে আমার কত টাকার মাল কাটায় খবর রাখো ? আমি বলছি—

দরজার বাইরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং চাকরটা সম্মুখে আসিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সবিতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। বিমলবাবু ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া নিজেই একটা চৌকি টানিয় লইয়া বলিলেন, শুনতে পেলুম আপনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কালই বোধ হয় আমাকে কানপুরে যেতে হবে, হয়তো আর ফিরতে পারবো না, অমনি বোম্বাই হয়ে জাহাজে সোজা কর্মস্থলে রওনা হতে হবে। ভাবলুম, মিনিট-খানেকের জন্যে হ'লেও একবার সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যাই আপনার আতিথ্যে আজ বড় তৃপ্তিলাভ করেছি।

সবিতা আস্তে আস্তে বলিল, আমার সৌভাগ্য।

লোকটির বয়স চল্লিশ, চুলে পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় দেহ স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ ; কহিলেন, খবর পেলুম রমণীবাবু আজ-কাল প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর আপনার শরীরও যে ভালো থাকে না সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আপনার আর বছরের ফটোর সঙ্গে আজ মিল খুঁজে পাওয়া দায়—এমনি হয়েছে চেহারা।

শুনিয়া সবিতা মনে মনে লজ্জা পাইল, বলিলেন, আমার ফটো আপনি দেখেছেন নাকি ?

দেখেচি বৈ কি ! আপনাদের একসঙ্গে তোলা ছবি রমণীবাবু পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভেবে রেখেচি, ছবির মালিককে একবার চোখে দেখবো। সে সাধ আজ মিটলো। চলুন না একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন-কয়েকের সমুদ্র-যাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রস স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড় আছে, তার উপর তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়, সকাল সন্ধ্যায় সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যদি যেতে পারি ত জানবো এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে ত কথা দিয়েছি বিমলবাবু আমি আসছে সপ্তাহেই রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরও স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি ! ও হ'লো সকলের আগে।

বিমলবাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হ'লে হয়তো এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশে স্মিতমুখে বলিলেন, অনুমতি হয়ত উদ্যোগ আয়োজন করি—আমার অফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়িটার কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে? কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এখন কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবে না।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন—কেন সুবিধে হবে না. শুনি? লেখা-পড়া কাল পরশু শেষ হয়ে যাবে, দরোয়ান চাকর বাড়িতে রইলো, ভাড়াটেরা রইলো, যাবার বাধাটা কি? না সে হবে না বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বললেই হবে? আমার শরীর খারাপ—আমার দেখাশোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিমলবাবু পুনশ্চ সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল, সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত করিয়া কহিল, না। আমি যেতে পারবো না।

রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—না কেন? আমি বলছি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই।

বিমলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু, বেঁধে?

হাঁ, দরকার হয় ত তাই।

তা হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অন্যায়ের ভার নিতে পারবো না।

কি জানি, ঠিক প্রবেশমুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কিনা। বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠি—আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরের ওপর হয়তো অত্যাচার করে গেলুম—তবু যাবার পূর্বে আমার অনুরোধই রইল—আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে—দেখি কতবার না বলে তার জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন,—নমস্কার—নমস্কার রমণীবাবু, আমি চললুম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নীচে নামিয়া গেলেন। রমণীবাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল হয়ত তাহা সত্য নয়।

## সাত

সারদা বলিল, মা, খাবেন না কিছু ?

না।

এক গেলাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বলবো ?

না, দরকার নেই।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবো ?

তাই যাও সারদা, তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে।

তথাপি উঠি-উঠি করিয়াও তাহার দেরি হইতেছিল, রমণীবাবু ফিরিয়া আসিয়া ড়াইলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল, আজকের মতো কোনরকমে ন-রক্ষেটা হলো। ভদ্রলোক খাসা মানুষ, অতবড় দরের লোক তা দেমাক অহংকার. ই, তোমার জন্যে ত ভারী ভাবনা, একশবার অনুরোধ করে গেলো াল সকালে যেন একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কি জানি, নিজেই হয়তো বা একটা ক্ত ডাক্তার নিয়ে সকালে হাজির হয়ে যায়—বলা যায় না কিছু—ওদের ত আর মাদের মতো টাকার মায়া নেই—দশ-বিশ হাজার থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি। ধমার কোম্পানি— ডিরেক্টারই বলো আর শেয়ারহোল্ডারই বলো. যা করে ঐ স্টার ঘোষাল। বললুম যে তোমাকে, লোকটা কোটি টাকার মালিক। াটি টাকা! জারমানি, হল্যাণ্ডের সঙ্গে মস্ত কারবার—বছরে দু-চার র এমন য়ুরোপ ঘুরে আসতে হয়—জেনেরাল ম্যানেজার শপ্ সাহেবই ওর ইনে পায় তিন হাজার টাকা। মস্ত লোক। জাভার চিনি চালানিতেই ল বছরে—

মুনাফার রোমাঞ্চকর অংকটা আর বলা হইল না,—বাধা পড়িল। সবিতা জ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আবার ফিরে এলে,—বাড়ি গেলে না ?

কোন্ প্রসঙ্গে কি কথা! প্রশ্নটা তাঁহার আনন্দবর্ধন করিল না এবং ঝলেন যে, তাঁহার 'মস্ত লোকের' বিবরণে সবিতা বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ য়ে নাই। একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, বাড়ি! নাঃ—আজ আর যাবো না।

কেন ?

নাঃ—আজ আর—

সবিতা এবমুহূর্তে তাহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, মদের গন্ধ বেরুচ্চে—তুমি খেয়েচো ?

মদ ? আমি ? (ইশারায়) মাত্র একটি ফোঁটা—বুঝলে না—

কোথায় খেলে, এই বাড়িতে?

শোন কথা! বাড়িতে নয় তো কি শুঁড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলুম ?

মদ আনতে কে বললে ?

কে বললে! এমন কথা কখনও শুনিনি। বাড়িতে দু-দশজন ভদ্রলোক আহ্বান করলে ও একটু না আনিয়ে রাখলে কি হয়? তাই—

সকলেই খেলে?

খেলে না? ভালো জিনিস অফার করলে কোন্ শালা না খায় শুনি? অব করলে যে তুমি?

বিমলবাবু খেলেন?

রমণীবাবু এবার একটু ইতস্ততঃ করিলেন, বলিলেন, না, আজ ও একটু চ দেখিয়ে গেল। নইলে ওর কীর্তি-কাহিনী জানতে বাকী নেই আমার। জানি স

সবিতা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, জানবে বৈ কি। আচ্ছা যাও এখ রাত হয়েছে ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

বলার ধরনটা শুধু কর্কশ নয়, রূঢ়। সারদার কানেও অপমানকর ঠেকি আজ সন্ধ্যার পর হইতে সবিতার নীরস কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতা রমণীবাবু বিঁধিতেছিল, এই কথায় সহসা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন,—অ তোমার হয়েছে কি বলো ত? মেজাজ দেখি যে ভারী গরম। এতটা ত নয় নতুন-বৌ!

সারদার ভয় হইল, এইবার বুঝি একটা বিশ্রী কলহ বাধিবে, কিন্তু সবি নীরবে চোখ মুছিয়া তেমনই শুইয়া রহিল, একটা কথার জবাব দিল না।

রমণীবাবু কহিতে লাগিলেন, ওই যে বলেচি, সবাই জানে তুমি স্ত্রী নং তাতেই লেগেছে যত আগুন। কিন্তু জানে না কে? সারদা জানে না, বাড়ির লোকের অজানা? একটা মিছে কথা কতদিন চাপা থাকে? এ অপমানটা তোমায় কি করলুম শুনি?

সবিতা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মত তী ও কঠিন, কহিলেন, এ কথা তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষ মুখে আনে লজ্জা পেতো কেবল পুরুষমানুষ বলেই কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা। তো কথায় আমার অপমান হয়েচে আমি একবারও বলিনি।

সারদা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—কি করচেন মা, থামুন।

রমণীবাবু কহিলেন, মুখে বলোনি সত্যি, কিন্তু মনে ভাবচো ত তাই।

সবিতা উত্তর দিল, না, মুখেও বলিনি, মনেও ভাবিনি। তোমার পরিচয়ে আমার মর্যাদা বাড়ে না সেজবাবু। ওতে শুধু চক্ষুলজ্জা বাঁচে, ন সত্যিকারের লজ্জায় ভেতরটা আমার পুড়ে কালি হয়ে ওঠে।

কেন? কেন শুনি?

কি হবে শুনে? এ কি তুমি বুঝবে যে, আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ পায়ের ধুলোর যোগ্য নও।

সারদা পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এত রাত্তিরে কি করচে আপনারা? দোহাই মা, চুপ করুন।

কিন্তু কেহই কান দিল না। রমণীবাবু কড়া গলায় হাঁকিলেন, সত্যি? সত্যি নাকি?

সবিতা কহিল, সত্যি কিনা তুমি নিজে জানো না? সমস্ত ভুলে গেলে? সেদিন তিনি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল আমাদের রক্ষা করতে পারতো? শুধু হাড়-মাস রক্ষে করাই ত নয়, মান-ইজ্জত রক্ষে করেছিলেন। নিজে কত বড় হ'লে অতখানি ভিক্ষে দিতে পারে কখনো পারো ভাবতে? আমি তাঁর স্ত্রী। আমার সে ক্ষতি সয়েছে, এটুকু সইবে না?

রমণীবাবু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই কহিলেন, তবে বললে তুমি রাগ করতে যাও কিসের জন্যে?

সবিতা বলিল, শুধু আজই ত বলোনি, প্রায়ই বলে থাকো। কথাটা কটু, তাই শুনলে হঠাৎ কানে লাগে, কিন্তু অন্তরটা তখনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে আমার এই ভালো যে, এ লোকটা আমার কেউ নয়, এর সঙ্গে আমার কোন সত্যিকার সম্বন্ধ নেই।

সারদা অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশিক্ষিত রমণীবাবুর পক্ষে এ উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝা কঠিন, তিনি শুধু এইটুকু বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত রূঢ় এবং অপমানকর। তাই সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছেই পড়ে থাকো কিসের জন্যে?

সবিতা কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সারদা হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল, কার সঙ্গে ঝগড়া করচেন মা, রাগের মাথায় সব ভুলে যাচ্ছেন?

সবিতা সেই হাতটা সরাইয়া দিয়া কহিল, না সারদা আমি আর ঝগড়া করবো না। ওঁর যা মুখে আসে বলুন আমি চুপ করে রইলুম।

আচ্ছা, কাল এর সমুচিত ব্যবস্থা করবো, বলিয়া রমণীবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিনিট-দুই পরে সদর রাস্তায় তাঁহার মোটরের শব্দ বুঝা গেল তিনি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সারদা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সমুচিত ব্যবস্থাটা কি মা?

জানিনে সারদা। ও-কথা অনেকবার শুনেচি, কিন্তু আজো মানে বুঝতে পারিনি?

কিন্তু মিছিমিছি কি অনর্থ বাধলো বলুন ত।

সবিতা মৌন হইয়া রহিল।

সারদা নিজেও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত হলো এবার আমি যাই মা।

যাও মা।

সেই মাত্র ভোর হইয়াছে, সারদার ঘরের দরজায় ঘা পড়িল। সে উঠিয়া দ্বার

খুলিতেই সবিতা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রাজু এলেই আমাকে খবর দিতে ভুলো না সারদা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সারদা শঙ্কিত হইল, বলিল, না মা, ভুলবো কেন, এলেই খবর দেবো।

সবিতা বলিলেন, দরোয়ান খবর নিয়েছে রাত্তিরে রাজু ঘরে ফেরেনি। কিন্তু যেখানেই থাক আজ তোমাদের নিয়ে যেতে সে আসবেই।

তাই ত বলেছিলেন।

আজই আসবে বলেছিল ত?

না, তা বলেন নি, শুধু বলেছিলেন মেয়েটির অসুখে তাঁকে সাহায্য করতে।

তুমি স্বীকার করেছিলে ত?

করেছিলুম বৈ কি।

কোনরকম আপত্তি করোনি ত মা?

না মা, কোন অপত্তি করিনি।

সবিতা বলিলেন, আমি এখন তবে যাই, তুমি ঘরের কাজকর্ম সারো, সে এলেই যেন জানতে পারি সারদা। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঘরের কাজ সারদার সামান্যই, তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া রহিল,—রাখাল নিতে আসিলে যেন বিলম্ব না হয়। তোরঙ্গ খুলিয়া যে দুই-একখানি ভালো কাপড় ছিল তাহাও বাঁধিয়া রাখিল—সঙ্গে লইতে হইবে। অবিনাশ-বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বেশী ভাব, তাহাকে গিয়া জানাইয়া রাখিল ঘরের চাবিটা সে রাখিয়া যাইবে, যেন সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয়। দূর-সম্পর্কের এক বোনের বড় অসুখ, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

না মা।

তুমি হয়ত যেতে পারবে না এমন সন্দেহ তার ত হয়নি?

হওয়া ত উচিত নয় মা। আমি একটুও অনিচ্ছে দেখাই নি। তখনি রাজী হয়েছিলুম।

তবে আসচে না কেন? সকালেই ত আসার কথা। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিই আর একবার দেখে আসুক সে বাসায় ফিরেচে কি না। বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাল হইতে সারদা নিরন্তর চিন্তা করিয়াছে কে এই পীড়িত মেয়েটি। তাহার কৌতূহলের সীমা নাই, তবুও এই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। কাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়ত উত্তর মিলিত, কিন্তু তখন এ প্রয়োজন তাহার ছিল না, মনেও পড়ে নাই।

এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল পার হইয়া রাত্রি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রাখালের দেখা নাই।

আরও পরে সে যে আসিতে পারে এ আশাও যখন গেল তখন সবিতা আসিয়া সারদার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, একটা কথাও বলিলেন না। কেবল চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। সারদা মুছাইয়া দিতে গেলে তিনি হাতটা তাহার সরাইয়া দিলেন।

ঝি আসিয়া খবর দিল বিমলবাবু আসিয়াছেন দেখা করিতে।

সবিতা কহিলেন, তাঁকে বলো গে বাড়ি নেই।

ঝি কহিল, তিনি নিজেই জানেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, বাবুর সঙ্গে নয়।

সবিতার চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া গেলেন। পথে ঝি বলিল, মা ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলুন, একটু ময়লা দেখাচ্চে।

আজ এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, দাসীর কথায় হুঁশ হইল, পরিধেয় বস্ত্রটা সত্যই দেখা করিবার মতো নয়।

মিনিট দশ-পনেরো পরে যখন বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সাজ্জ রঙা উজ্জ্বল আঁচলে মুখের শুষ্কতাও ঢাকা পড়িল।

বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন, হয়ত ব্যস্ত করলুম, কিন্তু কাল বড় অসুস্থ দেখে গিয়েছিলুম আজ না এসে পারলুম না।

সবিতা কহিল, আমি ভাল আছি। আপনার কানপুরে যাওয়া হয়নি?

না। এখান থেকে গিয়ে শুনতে পেলুম আমার জ্যাঠামশাই বড় পীড়িত, তাই—

নিজের জ্যাঠামশাই বুঝি?

না' নিজের ঠিক নয়,—বাবার খুড়তুতো ভাই—কিন্তু—

এক বাড়িতে আপনাদের সব একান্নবর্তী পরিবার বুঝি?

না, তা নয়। আগে তাই ছিল বটে, কিন্তু—

এখান থেকে গিয়ে হঠাৎ তাঁর অসুখের খবর পেলেন বুঝি?

না, ঠিক হঠাৎ নয়—ভুগচেন অনেকদিন থেকে, তবে—

তা হলে কালকেও হয়ত যেতে পারবেন না—খুব ক্ষতি হবে ত?

বিমলবাবু বলিলেন, ক্ষতি একটু হতে পারে, কিন্তু মানুষ কি কেবল ব্যবসার লাভ-লোকসান খতিয়েই জীবন কাটাবে? রমণীবাবু নিজেও ত একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু কারবারের বাইরে কিছু করেন না?

সবিতা বলিল, করেন, কিন্তু না করলেই তাঁর ছিল ভালো!

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালকের রাগ আপনার আজও পড়েনি। রমণীবাবু আসবেন কখন?

সবিতা কহিল, জানিনে, না আসাই সম্ভব।

না আসাই সম্ভব? কখন গেলেন আজ?

আজকে নয়, কাল রাত্তিরে আপনাদের যাবার পরেই চলে গেছেন।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আশা করি আর বেশী রাগারাগি করে যাননি। কাল তিনি সামান্য একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই বোধ করি ও-রকম অকারণ জোর-জবরদস্তি করেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই নিজের অন্যায় টের পেয়েছেন।

সবিতার কাছে কোন জবাব না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, কাল আমার অপরাধও কম হয়নি। সিঙ্গাপুরে যেতে অস্বীকার করার পরেও আপনাকে বারংবার অনুরোধ করা আমার ভারী অনুচিত হয়েচে। নইলে এ-সব কিছুই ঘটতো না। তারই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আজ আমার আসা। কাল বড অসুস্থ ছিলেন, আজ বাস্তবিক সুস্থ হয়েছেন, না একজনের পরে' রাগ করে আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছেন বলুন ত সত্যি করে?

উত্তর দিতে গিয়া দু'জনার চোখাচোখি হইল. সবিতা চোখ নামাইয়া বলিল, আমি ভালই আছি। না থাকলেই বা আপনি তার কি উপায় করবেন বমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন, উপায় করা ত শক্ত নয়, শক্ত হচ্চে অনুমতি পাওয়া। সেইটি পেতে চাই।

না, সে আপনি পাবেন না।

না পাই, অন্ততঃ রমণীবাবুকে ফোন করে জানাবার হুকুম দিন। আপনি নিজে ত জানাবেন না।

না, জানাবো না। কিন্তু আপনিই বা জানাতে এত ব্যস্ত কেন বলুন?

বিমলবাবু কয়েক-মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, কালকের চেয়ে আজ আপনি যে ঢের বেশী অসুস্থ তা ঘরে পা দেওয়া মাত্রই চোখে দেখতে পেয়েচি—চেষ্টা করেও লুকোতে পারেন নি। তাই ব্যস্ত।

উত্তর দিতে সবিতারও ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তার পরে কহিল, নিজের চোখকে অতো নির্ভুল ভাবতে নেই বিমলবাবু, ভাড়ী ঠকতে হয়।

বিমলবাবু কহিলেন, হয় না তা বলিনে, কিন্তু পরের চোখই কি নির্ভুল? সংসারে ঠকার ব্যাপার যখন আছেই তখন নিজের চোখের জন্যেই ঠকা ভালো। এতে তবু একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

সবিতার হাসিবার মতো মানসিক অবস্থা নয়—হাসির কথাও নয়—অনিশ্চিত অজ্ঞাত আতঙ্কে মন বিপর্যস্ত, তথাপি পরমাশ্চর্য এই যে, মুখে তাঁহার হাসি আসিয়া পড়িল। এ হাসি মানুষের সচরাচর চোখে পড়ে না,—যখন পড়ে রক্তে নেশা লাগে। বিমলবাবু কথা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—ইহার ভাষা স্বতন্ত্র—পরিপূর্ণ মদিরাপাত্র তৃষ্ণার্ত মদ্যপের চোখের দৃষ্টির সহজতা যেন এক মুহূর্তে বিকৃত করিয়া দিল এবং সে চাহনির নিগূঢ় অর্থ নারীর চক্ষে গোপন রহিল না। সবিতার অনতিকাল পূর্বের সন্দেহ ও সম্ভাবিত ধারণা এইবার

নিসংশয় প্রত্যয়ে সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন লজ্জার কালি ঢালিয়া দিল। তাহার মনে পড়িল এই লোকটা জানে সে স্ত্রী নয়, সে গণিকা। তাই অপমানে ভিতরটা যতই জ্বালা করিয়া উঠুক, কড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া ইহারই সম্মুখে মর্যাদাহানির অভিনয় করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ হইল তখন অপমানের প্রত্যুত্তরে সেও অপমান কম করে নাই, কিন্তু এই লোকটি অমার্জিত-রুচি অল্প-শিক্ষিত রমণীবাবু নয়— উভয়ের বিস্তর প্রভেদ —এ হয়ত অপমানের পরিবর্তে একটা কথাও বলিবে না, হয়ত শুধু অবজ্ঞায় চাপা হাসি ওষ্ঠাধরে লইয়া বিনয়-নম্র নমস্কারে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিবে।

মিনিট দুই-তিন নীরবে কাটিল, বিমলবাবু বলিলেন, কৈ জবাব দিলেন না আমায় ?

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কি জিজ্ঞেসা করেছিলেন আমার মনে নেই।

এমনি অন্যমনস্ক আজ ?

কিন্তু ইহারও উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আমি বলছিলাম, আপনি সত্যিই ভালো নেই। কি হয়েছে জানতে পাইনে ?

না।

আমাকে না বলুন ডাক্তারকে ত স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

না, তাও পারিনে।

এ কিন্তু আপনার বড় অন্যায়। কারণ, যে দোষী সে পাচ্ছে না দণ্ড, পাচ্ছে যে মানুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ অভিযোগের উত্তর আসিল না। বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, কাল যা দেখে গেছি, আজ তার চেয়ে আপনি ঢের বেশী খারাপ। হয়ত আবার জবাব দেবেন আমার দেখার ভুল হয়েছে, হয়ত বলবেন নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে কিন্তু একটা কথা আজ বলবো অপনাকে। গ্রহ-চক্র শিশুকাল থেকে অনেক ঘুরিয়েছে আমাকে, এই দুটো চোখ দিয়ে অনেক কিছুই সংসারে দেখতে হয়েছে,—বিশেষ ভুল তাদের হয়নি—হলে মাঝ-নদীতেই অদৃষ্ট-তরী ডুব মারতো, কূলে এসে ভিড়তো না। আমার সেই দুটো চোখ আজ হলফ করে জানাচ্চে আপনি ভালো নেই—তবু কিছুই করতে পাবো না—মুখ বুজে চলে যাবো—এ যে সহ্য করা কঠিন।

আবারদুজনেরচোখে-চোখে মিলিল, কিন্তু এবার সবিতা দৃষ্টি আনত করিল না, শুধু চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সম্মুখে তেমনি নীরবে বসিয়া বিমলবাবু। তাঁহার লালসা-দীপ্ত চোখে উদ্বেগের সীমা নাই—নিষেধ মানিতে চাহে না—ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতে চায়। আর সেখানে ? অর্থ নাই, লোক নাই, অজানা কোন একটা গৃহের মধ্যে পড়িয়া সন্তান তাঁহার রোগশয্যায়। তাহার নিরুপায় মাতৃ-হৃদয় গভীর অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল—শুধু অব্যক্ত বেদনায় নয়, লজ্জায় ও দুঃসহ অনুশোচনায়। কিছুতেই আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু কোন-

মতে সংবরণ করিয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িল, কহিল, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না বিমলবাবু, আমার কিছুই চাইনে, আমি ভাল আছি। বলিয়াই একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বিমলবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু রাগ করিলেন না, বুঝিলেন ইহা কঠিন মান-অভিমানের ব্যাপার—দুদিন সময় লাগিবে।

পরদিন বেলা যখন দশটা, অনেক দূরে গাড়ি রাখিয়া দারোয়ানের পিছনে পিছনে সবিতা সতেরো নম্বর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটিকের মা বাহিরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে আপনি ?

তুমি কে মা ?

আমি ফটিকের মা। এ বাড়ির অনেকদিনের ঝি।

কোথায় যাচ্চো ফটিকের মা ?

দাসী হাতের বাটিটা দেখাইয়া কহিল, দোকানে তেল আনতে। কর্তার পা লেগে হঠাৎ সব তেলটুকু পড়ে গেলো, তাই যাচ্চি আবার আনতে।

বামুন আসেনি বুঝি ?

না মা, এখনো আসেনি। শুনচি নাকি কাল আসবে। আজো কর্তাই রাঁধচেন।

রাজু বাড়ি নেই বুঝি ?

তাঁকে চেনেন ? না মা, তিনি বাড়ি নেই, ছেলে পড়াতে গেছেন। এলেন বলে।

আর রেণু কেমন আছে ফটিকের মা ?

তেমনি, কি জানি কেন জ্বরটা ছাড়চে না মা, সকলের বড় ভাবনা হয়েছে।

কে দেখছে ?

আমাদের বিনোদ ডাক্তার। এখখুনি আসবেন তিনি। আপনি কে মা ?

আমি এদের গাঁয়ের বৌ ফটিকের মা, খুব দূরসম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকি, শুনতে পেলুম রেণুর অসুখ, তাই খবর নিতে এলুম। কর্তা আমাকে জানেন।

তাঁকে খবর দিয়ে আসবো কি ?

না, দরকার নেই ফটিকের মা, আমি নিজেই যাচ্চি ওপরে। তুমি তেল নিয়ে এসো গো।

দারোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিল, তুমি মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে মহাদেব, আমার সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো, গাড়িটা যেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

বহুৎ আচ্ছা মাইজী, বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেল।

সবিতা উপরে উঠিয়া বারান্দার যে দিকটায় কর্তা রান্নার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ কর্তার কানে গেল, কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার ফুরসত নাই, বলিলেন, তেল আনলে? ছেঁচকটা ফুটে উঠেছে ফটিকের মা, আলু-পটোল একসঙ্গে চড়াবো, না পটোলটা আগে সেদ্ধ করে নেবো ?

সবিতা কহিলেন, একসঙ্গেই দাও মেজকর্তা, যা হোক একটা হবেই।

ব্রজবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ। কখন এলে। বসো। না

না, মাটিতে না, বড় ধুলো। আমি আসন দিচ্চি বলিয়া হাতের পাত্রটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিতেছিলেন, সবিতা হাত বাড়াইয়া বাধা দিল,—করচো কি ? তুমি হাতে করে আসন দিলে আমি বসবো কি করে ?

তা বটে। কিন্তু এখন আর দোষ নেই—দিই না ও-ঘর থেকে একটা এনে ?

না।

সবিতা সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, দোষ সেদিনও ছিল, আজও আছে, মরণের পরেও থাকবে মেজকর্তা। কিন্তু সে-কথা আজ থাক। বামুন কি পাওয়া যাচ্চে না ?

পাওয়া অনেক যায় নতুন-বৌ, কিন্তু গলায় একটা পৈতে থাকলেই ত হাতে খাওয়া যায় না। রাখাল কাল একজনকে ধরে এনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার কাল একজনকে ধরে আনবে বলে গেছে।

কিন্তু এ লোকটাও যে তোমার জেরায় টিকবে না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য নয়, অন্ততঃ সেই ভয়ই করি। কিন্তু উপায় কি !

সবিতা কহিল, আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি রাখতে—রাখবে মেজকর্তা ?

ব্রজবাবু বলিলেন নিশ্চয় রাখবো।

জেরা করবে না ?

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, না গো না, করবো না। এটুকু জানি, তোমার জেরায় পাস করে তবে সে আসবে। সে আরও কঠিন। যে যাই করুক, তুমি যে বুড়ো-বামুনের জাত মারবে না তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বুঝি ঠকাতে পারিনে ?

না, পারো না। মানুষকে ঠকানো তোমার স্বভাব নয়।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল পাছে ঝরিয়া পড়িলে ব্রজবাবু দেখিতে পান।

রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুটা পুঁটুলি একটায় তরি-তরকারি, অন্যটায় সাগু বার্লি মিছরি যজ-মূল প্রভৃতি রোগীর পথ্য। নতুন-মাকে দেখিয়া প্রথমে সে আশ্চর্য হইল। তার পরে হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল। ব্রজবাবুকে কহিল, আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল কাকা বাবু এবার আপনি ঠাকুরঘরে যান, উদ্যোগ-আয়োজন করে নিন, আমি নেয়ে এসে বাকী রান্না টুকু সেরে ফেলি। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত রান্নার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া কহিল, কড়ায় ওটা কি ফুটছে ?

ব্রজবাবু বলিলেন, আলু-পটোলের ঝোল।

আর ?

আর ? আর ভাতটা হবে বৈত নয় রাজু।

এতগুলো লোকে কি শুধু ঐ দিয়ে খেতে পারে কাকাবাবু ? জল কৈ, কুটনো বাটনা কোথায়, রান্নার কিছুই ত চোখে দেখিনে। বারান্দায় ঝাঁট পর্যন্ত পড়েনি—ধুলো জমে রয়েচে, এত বেলা পর্যন্ত আপনারা করছিলেন কি ? ফটিকের মা গেল কোথায় ?

ব্রজবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, হঠাৎ পা লেগে তেলটা পড়ে গেল কিনা—সে গেছে দোকানে কিনতে—এলো বলে।

মধু ?

মধু পেটের ব্যথায় সকাল থেকে পড়ে আছে, উঠতে পর্যন্ত পারেনি। রুগীর কাজ—সংসারের কাজ—একা ফটিকের মা—

খুব ভালো, বলিয়া রাখাল মুখ গম্ভীর করিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল এক কড়া ঘোলের প্রতি, জিজ্ঞাসা করিল, এত ঘোল কিনলে কে ?

ব্রজবাবু বললেন, ঘোল নয়, ছানার জল। ভাল কাটলো না কেন বলো ত ? রেণু খেতেই চাইলে না।

শুনিয়া রাখাল জ্বলিয়া গেল, কহিল, বুদ্ধির কাজ করেছে যে খাননি। সংসারের ভার তাহার পরে, রাত্রি জাগিয়া অর্ধ-চিন্তা করিয়া,ছুটোছুটি পরিশ্রম করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত, মেজাজ রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, রাগ করিয়া কহিল, আপনার কাজই এমনি। এটুকু তৈরি করেও যে রুগীকে খাওয়াবেন তাও পারেন না।

সবিতার সম্মুখে নিজের অপটুতার জন্য তিরস্কৃত হইয়া ব্রজবাবু এমন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন যে মুখ দেখিলে দয়া হয়। কোন কৈফিয়ত তাঁহার মুখে আসিল না; কিন্তু সে দেখিবার রাখালের সময় নাই, কহিল, যান আপনি ঠাকুরঘরে, যা করবার আমিই করচি।

ব্রজবাবু লজ্জিত-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুরঘরের কোন কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই,—সমস্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। আর একবার স্নানের জন্য নীচে যাইতেছিলেন সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিলেন, আজ কিন্তু পুজো আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে মেজকর্তা দেরি করলে চলবে না।

কেন ?

কেবর উত্তর সবিতা দিল না; মুখ ফিরাইয়া রাখালকে বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর জন্যে আগে একটুখানি মিছরি ভিজিয়ে দাও ত রাজু—কাল গেছে ওঁর একাদশী—এখন পর্যন্ত জলস্পর্শ করেন নি।

রাখাল ও ব্রজবাবু উভয়েই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল; ব্রজবাবু বলিলেন এ কথাও তোমার মনে আছে নতুন-বৌ ? আশ্চর্য !

সবিতা কহিল, আশ্চর্যই ত ! কিন্তু দেরি করতে পারবে না বলে দিচ্চি। নইলে গোবিন্দর দোরগোড়ায় গিয়ে এমনি হাঙ্গামা শুরু করবো যে ঠাকুরের মন্ত্র পর্যন্ত তুমি ভুলে যাবে। যাও, শান্ত হয়ে পুজো করো গে, কোন ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফটিকের মা তেল লইয়া হাজির হইল। রাখাল স্টোভ জ্বালিয়া বার্লি চড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর দুধ নেই ফটিকের মা।

না বাবু, কর্তা সবটা নষ্ট করে ফেলেছেন।

তা হলে উপায় কি হবে? রেণু খাবে কি?

নতুন-মা এবার একটু হাসিলেন, বললেন, দুধ না-ই থাকলো বাবা, তাতে ভয় পাবার আছে কি? এ-বেলাটা বার্লিতেই চলে যাবে। কিন্তু তুমি নিজে যেন কর্তার মতো বার্লিটাও নষ্ট করে ফেলো না।

না মা, আমি অতো বেহিসেবী নই। আমার হাতে কিছু নষ্ট হয় না।

শুনিয়া নতুন-মা আবার একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। খানিক পরে সেখান হইতে উঠিয়া তিনি নিচে নামিয়া আসিলেন। উঠানের একধারে কল-ঘর, জলের শব্দেই চেনা গেল, খুঁজিতে হইল না। কবাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরে ব্রজবাবু স্নান করিতেছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সবিতা ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, মেজকর্তা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ ত, বেশ, চলো বাইরে যাই—

সবিতা কহিল, না, বাইরের বাইরের লোক দেখতে পাবে। এখানে একলা তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই।

ব্রজবাবু জড়সড়োভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি কথা নতুন-বৌ?

সবিতা কহিল, আমি এ বাড়ি থেকে যদি না যাই তুমি কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার মানে?

সবিতা বলিল, যদি না যাই তোমার সুমুখে আমার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবে না, পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবে না, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু ভয়ে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে ঠাট্টা করো নতুন-বৌ তার মাথামুণ্ড নেই। নাও সরো, দোর খোলো—দেরি হয়ে যাচ্চে।

সবিতা উত্তর দিল, আমি ঠাট্টা করিনি মেজকর্তা, সত্যিই বলচি, কিছুতে দোর খুলবো না যতক্ষণ না জবাব দেবে।

ব্রজবাবু অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ঠাট্টা না হয়তো এ তোমার পাগলামি। পাগলামির কি কোন জবাব আছে?

জবাব না থাকে ত থাকো পাগলের সঙ্গে এক ঘরে বন্ধ। দোর খুলবো না।

লোকে বলবে কি?

তাদের যা ইচ্ছে বলুক।

ব্রজবাবু কহিলেন, ভালো বিপদ। জোর করে থাকার কথা কেউ শুনেচে কখনো দুনিয়ায়? তা হলে ত আইন-কানুন বিচার-আচার থাকে না, জোর করে যার যা খুশি তাই করতে পারে সংসারে?

সবিতা কহিল, পারেই ত। তুমি কি করবে বলো না ?

এখানে থাকবে, নিজের বাড়িতেও যাবে না ?

না। নিজের বাড়ি আমার এই, যেখানে স্বামী আছে, সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়িতে ছিলুম, আর সেখানে যাবো না।

এখানে থাকবে কোথায় ?

নীচে এতগুলো ঘর পড়ে আছে তার একটাতে থাকবো। লোকের কাছে দাসী বলে আমার পরিচয় দিও—তোমার মিথ্যে বলাও হবে না।

তুমি ক্ষেপেছো নতুন-বৌ, এ কখনো পারি ?

এ পারবে না, কিন্তু ঢের বেশী শক্ত কাজ আমাকে দূর করা। সে পারবে কি করে ? আমি কিছুতেই যাবো না মেজকর্তা, তোমাকে নিশ্চয় বলে দিলুম।

পাগল ! পাগল !

পাগল কিসে ? জোর করছি বলে ? তোমার ওপর করবো না ত সংসারে জোর করবো কার ওপর ? আর জোরের পরীক্ষাই যদি হয় আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

কেন পারবো না ?

কি করে পারবে ? তোমার ত আর টাকাকড়ি নেই—গরীব হয়েছো—মামলা করবে কি দিয়ে ?

ব্রজবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ তিন দিন হইল সে সর্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্তচিত্ত অনির্দেশ শূন্য-পথ অপেক্ষা ক্ষ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছে, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত সময় পায় নাই। তাহার অসংহত রুক্ষ কেশ-রাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির 'পরে নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল। হেঁট হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, তোমার মেয়ের জন্যই ত ভাবনা নতুন বৌ। আচ্ছা, দেখি যদি—

বক্তব্য শেষ করিতে সবিতা দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিল। দু চোখ জলে ভাসিতেছে কহিল, না মেজকর্তা, মেয়ের জন্যে আর আমি ভাবিনে। তাকে দেখার লোক আছে, কিন্তু তুমি ? এই ভার মাথায় দিয়ে একদিন আমাকে এ-সংসারে তুমি এনেছিলে—

সহসা বাধা পড়িল, তাহার কথাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, বাহিরে ডাক পড়িল, রাখালবাবু ?

রাখাল উপর হইতে সাড়া দিল, আসুন ডাক্তারবাবু।

সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

## ॥ আট ॥

ঠাকুরঘরের ভিতরে ব্রজবাবু এবং বাহিরে মুক্ত দ্বারের অনতিদূরে বসিয়া সবিতা অপলক-চক্ষে চাহিয়া স্বামীর কাজগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। একদিন এই ঠাকুরের সকল দায়িত্ব ছিল তাহার নিজের, সে না করিলে স্বামীর পছন্দ হইত না। তখন সময়াভাবে অন্যান্য বহু সাংসারিক কর্তব্য তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইত। তাই, পিসশাশুড়ী নানা ছলে তাহার নানা ত্রুটি ধরিয়া নিজের গোপন বিদ্বেষের উপশম খুঁজিতেন, আশ্রিত ননদেরা বাঁকা কথায় মনের ক্ষোভ মিটাইত, বলিত, তাহারা কি বামুনের ঘরের মেয়ে নয়? দেব-দেবতার কাজকর্ম কি জানে না? পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতা কি নতুন-বৌয়ের বাপের বাড়ির একচেটে যে সে-ই শুধু শিখে এসেছে? এ-সকল কথার জবাব সবিতা কোনদিন দিত না। কখনো বাধ্য হইয়া এ-ঘরের কাজ যদি অপরকে করিতে দিতে হইত, সারাদিন তাহার মন কেমন করিতে থাকিত, চুপি চুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিত, গোবিন্দ, অযত্ন হচ্চে বাবা জানি, কিন্তু উপায় যে নেই।

সেদিন নিরবচ্ছিন্ন শুচিতা ও নিচ্ছিদ্র অনুষ্ঠানে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই না তাহার ছিল। আর আজ? সেই গোপাল-মূর্তি তেমনি প্রশান্ত-মুখে আজও চাহিয়া আছেন, অভিমানের কোন চিহ্ন ও-দুটি চোখে নাই।

এই পরিবারে এতবড় যে প্রলয় ঘটিল, ভাঙ্গা-গড়ায় এই গৃহে যুগান্ত বহিয়া গেল, এতবড় পরিবর্তন ঠাকুর কি জানিতেও পারেন নাই! একেবারে নির্বিকার উদাসীন? তাহার অভাবের দাগ কি কোথাও পড়িল না, তাহার এতদিনের এত সেবা শুষ্ক জলরেখার ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

বিবাহের পরেই তাহার গুরু-মন্ত্রের দীক্ষা হয়, পরিজনগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, এত ছোট বয়সে ওটা হওয়া উচিত নয়, কারণ অবহেলায় অপরাধ স্পর্শিতে পারে। ব্রজবাবু কান দেন নাই, বলিয়াছিলেন, বয়সে ছোট হলেও ও-ই বাড়ির গৃহিণী, আমার গোবিন্দর ভার দেব বলেই ওকে ঘরে আনা, নইলে প্রয়োজন ছিল না। সে প্রয়োজন শেষ হয় নাই, ইষ্ট-মন্ত্রও সে ভুলে নাই, তথাপি সবই ঘুচিয়াছে; সেই গোবিন্দর ঘরে প্রবেশের অধিকারও আর তাহার নাই, দূরে বাহিরে বসিতে হইয়াছে।

ডাক্তার বিদায় করিয়া রাখাল হাসিমুখে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, মায়ের আশীর্বাদের চেয়ে ওষুধ আছে নতুন মা? বাড়িতে পা দিয়েছেন দেখেই জানি আর ভয় নেই, রেণু সেরে গেছে।

নতুন-মা চাহিয়া রহিলেন, ব্রজবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাখাল কহিল, জ্বর নেই, একদম নরম্যাল। বিনোদবাবু নিজেই ভারী খুশী, বলিলেন, ও-বেলায় যদি বা একটু হয়, কাল আর জ্বর হবে না। আর ভাবনা নেই, দিন-দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠবে। নতুন-মা, এ শুধু আপনার আশীর্বাদের ফল, নইলে এমন হয় না। আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোনো যাবে, কাকাবাবু, বাঁচা গেল।

খবরটা সত্যিই অভাবিত। রেণুর পীড়া সহজ নহে, ক্রমশঃ বক্রগতি লইতেছে এই ছিল আতঙ্ক। মরণ-বাঁচনের কঠিন পথে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত সংগ্রাম করিয়া চলিবার জন্যই সবলে যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন আসিল এই আশার অতীত সু-সংবাদ। সবিতা গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া। উঠিয়া বসিলেন, চোখ মুছিয়া কহিলেন, রাজু, চিরজীবী হও বাবা,—সুখে থাকো

রাখালের আনন্দ ধরে না, মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গেছে, বলিল, মা অগেকার দিনে রাজা-রানীরা গলার হার খুলে পুরষ্কার দিতেন।

শুনিষা সবিতা হাসিলেন, হার তো তোমার গলায় মানাবে না বাবা, যদি বেঁচে থাকি বোমা এলে তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেবো।

রাখাল বলিল, এ-জন্মে সে গলা ত খুঁজে পাওয়া যাবে না মা. মাঝে থেকে আমই বঞ্চিত হলুম। জানেন ত, আমার অদৃষ্টে মুখের অন্ন ধুলোয় পড়ে—ভোগে আসে না। সবিতা বুঝিলেন, সে সে-দিনের তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রনের ব্যাপারটাই নেঙ্গিত করিল। রাখাল বলিতে লাগিল, রেণু সেরে উঠুক, হার না পাই মিষ্টি-মুখ করবার দাবী কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু সেও অন্যদিনের কথা, আজ চলুন একবার রান্না-ঘরের দিকে। এ কদিন শুধু ভাত খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে কেউ গ্রাহ্য করিনি আজ কিন্তু তাতে চলবে না, ভালো করে খাওয়া চাই। আসুন তার ব্যবস্থা কে দেবেন।

চলো বাবা যাই, বলিয়া সবিতা উঠিয়া গেলেন। সেখানে দূরে বসিয়া রাখা লকে দিয়া তিনি সমস্তই করিলেন এবং যথাসময়ে সকলের ভালো করিয়াই আ আহারাদি সমাধা হইল। সবাই জানিত সবিতা এখনো কিছুই খান নাই, কিন্ত খাবার প্রস্তাব কেহ মুখে আনিতেও ভরসা করিল না ; কেবল ফটিকের মা নুত লোক বলিয়া এবং না-জানার জন্যই কথাটা একবার বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাখা চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সকলের মুখেই আজ একটা নিরুদ্বেগ হাসি খুশী ভাব, যেন হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রে এ-বাটির উপর হইতে ভূতের উৎপাত ঘুচিয়া গেছে। রেণুর জ্বর নাই, সে অরামে ঘুমাইতেছে, মেঝেয় একটা মাদুর পাতিয়া ক্লান্ত রাখাল চোখ বুজিয়াছে, মধু সাড়াশব্দ নাই, সম্ভবতঃ তাহার পেটের ব্যথা থামিয়াছে, নীচে হইতে খনখন ঝনঝন আওয়াজ আসিতেছে বোধ হয় ফটিকের মা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আজ বেলাবেলি মাজিয়া লইতেছে। সবিতা আসিয়া কর্তার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া চৌকাঠের কাছে বসিল, ওগো, জেগে আছো ?

ব্রজবাবু জাগিয়াই ছিলেনন, বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

সবিতা কহিল কৈ আমার জবাব দিলে না।

ব্রজবাবু বলিলেন, তোমাকে রাখাল তখন ডেকে নিয়ে গেল, জবাবটা জেনে নেবা সময় পেলাম না।

কার কাছে জেনে নেবে—আমার কাছে ?

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য হচ্ছো কেন নতুন-বৌ, চিরদিন এই ব্যবস্থাই ত হয়ে এসেছে। সেদিনও ত রাখালের ঘরে অনেকদিনের মূলতুবি সমস্যার সমাধান করে তোমার কাছে। খোঁজ নিলে শুনতে পাবে তার একটারও অন্যথা হয়নি।

সবিতা নতমুখে বসিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রশ্ন যেদিক থেকেই আসুক, জবাব দিয়ে এসেছো তুমি—আমি নয়। তার পরে হঠাৎ একদিন, আমার লক্ষ্মী সরস্বতী, দুই-ই করলে অন্তর্ধান, বুদ্ধির থলিটি গেল আমার হারিয়ে তখন থেকে জবাব দেবার ভার পড়লো আমার নিজের পরে, দিয়েও এসেছি, কিন্তু তার দুর্গতি যে কি সে ত স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছো নতুন-বৌ।

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু এ যে আমার নিজের প্রশ্ন, মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু প্রশ্ন ত সহজ নয় এর মধ্যে আছে সংসার, সমাজ, পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি,আছে লৌকিক-পারলৌকিক ধর্ম-সংস্কার, আছে তোমার মেয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ, মান-মর্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ। এতবড় ভয়ানক জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে ছাড়া কে দেবে বলো ত ? আমার বুদ্ধিতে কুলবে কেন ? তুমি বললে, যদি তুমি না যাও, যদি জোর করে এখানে থাকো, কি আমি করতে পারি। কি করা উচিৎ আমি ত জানিনে নতুন-বৌ, তুমিই বলে দাও।

সবিতা নিরুত্তরে বসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত কত-কি ভাবিতে লাগিল, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, মেজকর্তা, তোমার কারবার কি সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে ?

হাঁ, সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি টাকাটা বার করে না নিলে কি হতো ?

তাতেও বাঁচতো না—শুধু ডুবতো হয়তো বছরখানেক দেরি ঘটতো !

কিছুই না। আমার সেই হীরের আংটিটা বিক্রি করে পাঁচ শ টাকা পেয়েচি তাতেই চলচে।

কোন আংটিটা ? আমার ব্রত উদযাপনের দক্ষিণে বলে আমি নিজে কিনে যেটা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম—সেইটে ? তুমি তাকে বিক্রি করেছো ?

সে ছাড়া আমার আর কিছু ছিলনা, তা তো জানো নতুন-বৌ।

সবিতা আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া কহিল, যে দুটো তালুক ছিল সেও কি গেছে ?

ব্রজবাবু বলিলেন,যায় নি,কিন্তু যাবে। বাঁধা পড়েছে উদ্ধার করতে পারবো না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিলে সবিতা প্রশ্ন করিল, তোমার এ-পক্ষের স্ত্রীর কি রইলো ?

ব্রজবাবু বলিলেন, তাঁর না যে পটলডাঙ্গায় দুখানা বাড়ি খরিদ করা হয়েছিল তা আছে। আর আছে গহনা, আছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ। তাঁর এবং তাঁর মেয়ের চলে যাবে,—কষ্ট হবে না।

রেণুর কি আছে মেজকর্তা ?

কিছু না। সামান্য খানকয়েক গহনা ছিল, তাও বোধ হয় ভুল করে তারা নিয়ে চলে গেছেন।

শুনিয়া রেণুর মা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, ভাবচি, রেণু ভালো হলে আমরা দেশে চলে যাবো। সেখানে শুধু দয়া করে মেয়েটিকে কেউ যদি নেয় ওর বিয়ে দেবো, তার পরেও যদি বেঁচে থাকি, গোবিন্দর সেবা করে পাড়াগাঁয়ে কোনমতে বাকী দিন কটা আমার কেটে যাবে—এই ভরসা।

কিন্তু সবিতার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, একটা মুশকিল হয়েছে রেণুকে নিয়ে, তাকে রাজী করাতে পারিনি। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু সে হয়েছে তোমার মতোই অভিমানী, সহজে কিছু বলে না, কিন্তু যখন বলে তার আর অন্যথা করানো যায় না। যেদিন এই বাসাটায় চলে এলাম, সেদিন রেণু বললে, চলো বাবা আমরা দেশে চলে যাই। কিন্তু আমার বিয়ে দেবার তুমি চেষ্টা কোরো না, আমার বাবাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। বললাম, আমি ত বুড়ো হয়েছি মা, কটা দিনই বা বাঁচব, কিন্তু তখন তো কি হবে বল দিকি? ও বললে, বাবা, তুমি ত আমার অদৃষ্ট বদলাতে পারবে না। ছেলে বেলায় মা যাকে ফেলে দিয়ে যায়, বিয়ের দিনে অজানা-বাধায় সমস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, বাপের রাজ-সম্পদ যার ভোজবাজীর মতো বাতাসে উড়ে যায় তাকে সুখভোগের জন্যে ভগবান সংসারে পাঠান না, তার দুঃখে জীবন দুঃখেই দুঃখেই শেষ হয়। এই আমার কপালের লেখা বাবা, আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি কষ্ট পেয়ো না। বলিতে বলিতে সহসা গলাটা তাঁহার ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, রেণু কথাগুলো বললে বিরক্ত হয়েও নয় দুঃখের ধাক্কায় ব্যাকুল হয়েও নয়। ও জানেওর মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া নেই, বললেও খুব সহজে—কিন্তু যা মুখে এলো তাই বলা নয়, খুব ভেবে চিন্তেই বলা। তাই ভয় হয়, এ থেকে হয়তো ওকে সহজে টলানো যাবে না। তবু ভাই নতুন বৌ, এ দুর্ভাগ্যেও এই আমার মস্ত সান্ত্বনা যে রেণু আমার শোক করতে বসেনি, আমাকে মনে মনেও একবারো সে তিরস্কার করেনি।

স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিতার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল, কহিল মেজকর্তা, বেঁচে থেকে সমস্তই চোখে দেখবো, কানে শুনবো, কিন্তু কিছুই করতে পাবো না?

ব্রজবাবু বলিলেন, কি করতে চাও নতুন-বৌ, রেণু তো কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবে না! আর আমি—

সবিতার জিহ্বা। শাসন মানিল না, অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, রেণু কী জানে আমি আজও বেঁচে আছি মেজকর্তা?

কথা কয়টি সামান্যই, কিন্তু প্রশ্নটি যে তাহার কতদিকে কতভাবে তাহার রাত্রির স্বপ্ন, দিনের কল্পনা ছাইয়া আছে, এ সংবাদ সে ছাড়া আর কে জানে?

পাংশুমুখে চাহিয়া উত্তরের জন্য তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল ব্রজবাবু চুপ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হাঁ সে জানে।

জানে আমি বেঁচে আছি ?

জানে। সে জানে তুমি কলকাতায় আছ—সে জানে তুমি অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছো !

সবিতা মনে মনে বলিল ধরণী দ্বিধা হও।

ব্রজবাবু কহিতে লাগিলেন, সে তোমার সাহায্য নেবে না, আর আমি—গোবিন্দ শেষের ডাক আমি কানে শুনতে পেয়েচি নতুন-বৌ, আমার গোনা-দিনফুরিয়ে এলো তবু যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়—আমার ধর্ম্মের অনুশাসন—আমার ঠাকুরের আদেশ বলে নেবো। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তৃণের চেয়েও হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় হবো। তখন যদি তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিল তাঁহার চোখ দিয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেইখানে স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তাহার সকালের কথাগুলো মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িল, তখন স্বামীর স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে তাঁহাকে জোর করিয়া বলিয়াছিল, যদি না যাই কি করতে পারো আমার ? পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়াছিল, এই ত আমার গৃহ, এখানে আছে আমার কন্যা, আছে আমার স্বামী। আমাকে বিদায় করে সাধ্য কার ?

কিন্তু এখন বুঝিল কথাগুলো তাহার কত অর্থহীন, কত অসম্ভব। কত হাস্যকর তাহার জোর করার দাবী, তাঁহার ভিত্তিহীন শূন্যগর্ভ আস্ফালন। আজ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুলত্যাগিনী নারী ও অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার পীড়িত সন্তানই শুধু নয়, মাঝখানে আছে সংসার, আছে ধর্ম আছে নীতি, আছে সমাজ বন্ধনের অসংখ্য বিধিবিধান। কেবলমাত্র অশ্রুজল ধুইয়া স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবে সে কি করিয়া ? তাই কথা কহিল না, স্বামীর উদ্দেশে আর একবার নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখালের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সে আসিয়া কহিল, আমি বলি বুঝি নতুন মা চলে গেছেন।

না বাবা, এইবার যাবো। রেণু কেমন আছে ?

ভালো আছে মা, এখনো ঘুমোচ্চে।

মেজকর্তা, আমি যাই এখন ?

এসো !

রাখাল কহিল, মা, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। কাল আবার আসবেন তো ?

আসবো বৈ কি বাবা। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পিছনে চলিল রাখাল পথে আসিতে গাড়ির মধ্যে বসিয়া সবিতা আজিকার সমস্ত কথা, সমস্ত

ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। তাহার তের বৎসর পূর্বেকার জীবন যা কিছুর সঙ্গে গাঁথা ছিল, আজ আবার তাহাদের মাঝখানেই তাহার দিন কাটিল। স্বামী, কন্যা, রাখাল-রাজ এবং কুলদেবতা গোবিন্দ-জীউ। গৃহত্যাগের পরে হইতে অনুক্ষণ আত্মগোপন করিয়াই তাহার এতকাল কাটিয়াছে, কখনো তীর্থে বাহির হয় নাই, কোন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে নাই, কখনো গঙ্গাস্নানে যায় নাই—কত পর্বদিন, কত শুভক্ষণ, কত স্নানের যোগ বহিয়া গেছে—সাহস করিয়া কোনদিন পথের বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়ায় নাই পাছে পরিচিত কাহারো সে চোখে পড়ে। সেদিন রাখালের ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটুখানি আবরণ উঠিয়াছে,—আজ সকলের কাছেই তাহার ভয় ভাঙ্গিল, লজ্জা ঘুচিল। রেণু এখনো শুনে নাই, কিন্তু শুনিতে তাহার বাকী থাকিবে না। তখন সেও হয়তো এমনি নীরবেই ক্ষমা করিবে। তাহার পরে কাহারো রাগ নাই, অভিমান নাই; ব্যথা দিতে এতটুকু কটাক্ষ পর্যন্ত কেহ করে নাই। দুঃখের দিনে সে যে দয়া করিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে ইহাতেই সকলে কৃতজ্ঞ। ব্যস্ত হইয়া ব্রজবাবু স্বহস্তে দিতে আসিয়াছিলেন তাহাকে বসিবার আসন—যেন অতিথির পরিচর্যায় কোথাও না ত্রুটি হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের আর বাকী কিছু নাই, চলিয়া আসিবার কালে সবিতা এই কথাটাই নিঃসংশয়ে জানিয়া আসিল।

রেণু জানে তাহার পিতা নিঃস্ব। সে জানে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ সৌভাগ্যের আশা নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু এই লইয়া শোক করিতে বসে নাই, দুর্দশাকে সে অবিচলিত ধৈর্যে স্বীকার করিয়াছে। সংকল্প করিয়াছে ভালো হইয়া দরিদ্র পিতাকে সঙ্গে করিয়া সে তাহাদের নিভৃত পল্লীগৃহে ফিরিয়া যাইবে—তাঁহার সেবা করিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিবে।

ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন, রেণু জানে মা তাহার বাঁচিয়া আছে—মা তাহার অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছে। স্বামীর এই কথাটা তাহার যতবার মনে পড়িল, ততবারই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহা মিথ্যা নয়—কিন্তু ইহাই কি সত্য? মেয়েকে সে দেখে নাই, রাখালের মুখে আভাসে তাহার রূপের বিবরণ শুনিয়াছে,—শুনিয়াছে সে নাকি মায়ের মতোই দেখিতে। নিজের মুখ মনে করিয়া সে-ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল, স্পষ্ট তেমন হইল না, তবুও রোগ-তপ্ত তাহার আপন মুখই যেন তাহার মানসপটে বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখ-দুর্দশার কত সম্ভব-অসম্ভব মূর্তিই যে তাহার কল্পনায় আসিতে যাইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই,—এবং সমস্তই যেন সেই একটিমাত্র পাণ্ডুর রুগ্ন মুখ-খানিকেই সর্বদিকে ঘিরিয়া। সংসারে নিরাসক্ত দরিদ্র পিতা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুই তাহার চোখে পড়ে না,—সেইখানে রেণু একেবারে একা। দুর্দিনে সান্ত্বনা দিবার বন্ধু নাই, বিপদে ভরসা দিবার আত্মীয় নাই—সেখানে দিনের পর দিন তাহার কেমন করিয়া কাটিবে? যদি কখনো এমনি অসুখে পড়ে—তখন? হঠাৎ যদি বৃদ্ধ পিতার পরলোকের ডাক আসে—সেদিন? কিন্তু উপায় নাই! উপায় নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া তাহারি চোখের উপর যেন সন্তানকে তাহার কাহারা হত্যা করিতেছে।

সবিতার চৈতন্য হইল যখন গাড়ি আসিয়া তাহার দরজায় দাঁড়াইল। উপরে উঠিতে ঝি আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, বাবু বড় রাগ করছেন।

কখন এলেন তিনি ?

অনেকক্ষণ। বড় ঘরে বসে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

তিনি কখন এলেন ?

একটু আগে। এখন হঠাৎ সে-ঘরে গিয়ে কাজ নেই মা, রাগটা একটু পড়ুক।

সবিতা ভ্রূকুটি করিল, কহিল, তুমি নিজের কাজ করো গে।

সে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছে, বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ ?

ভালো আছি। বসুন।

তিনি বসিলে সবিতা নিজেও গিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিল। বিমলবাবু বলিলেন, শুনলুম আপনি দুপুরের পূর্বেই বেরিয়েছিলেন—আজ আপনার খাওয়া পর্যন্ত হয়নি।

সবিতা কহিল, না তার সময় পাইনি।

রমণীবাবু মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল আজ ?

সবিতা কহিল, আমার কাজ ছিল।

কাজ সমস্ত দিন ?

নইলে সমস্ত দিন থাকতে যাবো কেন ? আগেই ত ফিরতে পারতুম।

রমণীবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, শুনতে পাই আজকাল প্রায়ই তুমি বাড়ি থাকো না—কাজটা কি ছিল একটু শুনতে পাইনে ?

সবিতা কহিল, না, সে তোমার শোনবার নয়। বিমলবাবু, আজও আপনার যাওয়া হলো না ?

বিমলবাবু বলিলেন, না হলো না। জ্যাঠামশাই একটু না সারলে বোধ করি যেতে পারবো না।

কথাটা তাঁহার শেষ হইবামাত্র রমণীবাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তুমি বাইরে গিয়েছিলে ?

সবিতা শান্তভাবে উত্তর দিল, তুমি ত তখন ছিলে না।

জবাবটা ক্রোধ উদ্রেক করিবার মতো নয়, কিন্তু তিনি রাগিয়াই ছিলেন, তাই হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—থাকি না-থাকি সে আমি বুঝবো, কিন্তু আমার হুকুম ছাড়া তুমি এক-পা বার হবে না আজ স্পষ্ট করে বলে দিলুম। শুনতে পেলে ?

শুনিতে সকলে পাইলেন ; বিমলবাবু সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, রমণীবাবু আজ আমি উঠি—কাজ আছে।

না না আপনি বসুন। কিন্তু এই সব বেলা আপনা আমি যে বরদাস্ত করিনে তাই শুধু ওকে জানিয়ে দিলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল, বেলাল্লাপনা তুমি কাকে বল ?

বলি, তুমি যা করে বেড়াচ্চো তাকে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোকে।

কাজ থাকলেও যাবো না ?

না। আমি যা বলবো সেই তোমার কাজ। অন্য কাজ নেই।

তাই ত এতকাল করে এসেচি সেজবাবু, কিন্তু এখন কি আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয় ?

অবিশ্বাস তার প্রতি কোনদিন হয় না, তবু ক্রোধের উপর রমণীবাবু বলিয়া বসিলেন, হয়, একশোবার হয়। তুমি সীতা না সাবিত্রী যে অবিশ্বাস হতে পাবে না ? একজনকে ঠকাতে পেরেচো, আমাকে পারো না।

বিমলবাবু লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইঁহাদের কলহের মাঝখানে কথা বলাও চলে না, কিন্তু সবিতা স্থির হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে রমণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, সেজবাবু, তুমি জানো আমি মিছে কথা বলিনে। আমাদের সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হলো। আর তুমি আমার বাড়িতে এসো না।

কলহ-বিবাদ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, কিন্তু সমস্তই এক-তরফা। হাঙ্গামা, চেঁচামেচির ভয়ে চিরদিনই সবিতা চুপ করিয়া গেছে, পাছে গোপন কথাটা কাহারো কানে যায়। সেই নতুন-বৌয়ের মুখের এতবড় শক্ত কথায় রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সমক্ষে। মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, কার বাড়ি এ ? তোমার ? বলতে একটু লজ্জা হলো না ?

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, আমার লজ্জা হওয়া উচিত সেজবাবু, তুমি সত্যি কথাই বলেচো। না, এ-বাড়ি আমার নয়, তোমার—তুমিই দিয়েছিলে। কাল আমি আর কোথাও চলে যাবো, তখন সবই তোমার থাকবে। তেবো বৎসর পরে চলে যাবার দিনে তোমার একটা কপর্দকও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না, সমস্ত তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম।

এই কণ্ঠস্বরে রমণীবাবুর চমক ভাঙ্গিল, হতবুদ্ধির মতো বলিলেন, কাল চলে যাবে কি রকম ?

হাঁ, আমি কালই চলে যাবো।

চলে যাব বললেই যেতে দেবো তোমাকে ?

আমাকে বাধা দেবার মিথ্যে চেষ্টা করো না সেজবাবু, আমাদের সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এ আর ফিরবে না।

এতক্ষণে রমণীবাবুর হুঁশ হইল যে ব্যাপারটা সত্যই ভয়ানক হইয়া উঠিল ; ভয় পাইয়া কহিলেন, আমি কি সত্যিই বলেচি, নতুন-বৌ এ-বাড়ি তোমার নয়, আমার ? রাগের মাথায় কি একটা কথা বার হয়ে যায় না ?

সবিতা কহিল, রাগের জন্য নয়। রাগ যখন পড়ে যাবে—হয়তো দেরি হবে—তখন বুঝবে এতবড় বাড়ি দান করার ক্ষতি তোমার সইবে না, চিরকাল কাঁটার মতো তোমার মনে এই কথাটাই ফুটবে যে, আমাদের দুজনের দেনা-পাওনায় একলা তুমিই

ঠকেচো। দাঁড়িপাল্লায় একটা দিক যখন শূন্যে দেখবে তখন অন্যদিকে বাটখারার ভার তোমার বুকে যাঁতার মতো চেপে বসবে—সে সহ্য করার শিক্ষা তোমার হয়নি। কিন্তু আর তর্ক করার জোর আমার নেই—আমি বড় ক্লান্ত। বিমলবাবু, আর বোধ করি দেখা হবার অবকাশ হবে না—আমি কালকেই চলে যাবো।

কোথায় যাবেন?

সে এখনো জানিনে।

কিন্তু যাবার আগে দেখা হবেই। আমি আবার আসবো।

সময় পান আসবেন। আজ কিন্তু আমি চললুম। এই বলিয়া। সবিতা আজ উভয়কেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বিমলবাবু বলিলেন, রমণীবাবু আমার নমস্কার নিন—চললুম।

## নয়

এতবড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকী রহিল না, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটেরা সবাই শুনিল কাল রাত্রে বর্তা ও গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অন্য কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃদু হাসিয়া স্বকার্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহারা সম্বন্ধে তাহা পারিল না। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে, সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। শহরে এত অল্পমূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলিবে না, ভয় এই শুধু নয়, তাহাদের কতদিনের ভাড়া বাকী পড়িয়া আছে এবং কতভাবেই না এই গৃহস্বামিনীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া ম্লান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলাবলি করচে মা?

কি কথা সারদা?

ওরা বলচে আজই এ-বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন।

ওরা সত্যি কথাই বলেচে সারদা।

সত্যি কথা! সত্যিই চলে যাবেন আপনি?

সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখনো স্থির করিনি, শুধু যেতে যে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারচে না মা, ভাবচে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে। আমিও ভাবতে পারিনে মা, বিনা-মেঘে আমাদের মাথায় এতবড় বজ্রপাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে কোথায় ভেসে যাবো। তবু, ওরা যা জানে না আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেচি মা, সম্প্রতি এ বাড়ি আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেছে যে সে আর সইছে না, কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হতে পারে না!

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারে না সারদা ? এ বাড়ি আমার তেতো হয়ে উঠেছে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েছি। কিন্তু বারো বংসর ভুল করেছি বলে আরো বারো বংসর ভুল করতে হবে, এ আমি আর মানবো না—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, মা, আমার ত কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন ?

নতুন মা বলিলেন, যার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করোনি। অনুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জ্বালায় হতবুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক আবার তোমার কাছে তাকে আসতে হবে ; কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে ত তোমাকে সহজে খুঁজে পাবে না মা।

সারদা নতমুখে কহিল, না মা, তিমি আর আসবেন না।

এমন কখনো হয় না সারদা,—সে আসবেই।

না মা, আসবেন না। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্য সবিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না, কিন্তু অতি বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল, যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—কোথাও একলা যাওয়া চলে না, সঙ্গে দাসী একজন চাই—আমি আপনার সেই দাসী মা।

কী করে জানলে সারদা আমি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ ? কে তোমাকে বললে এ কথা ?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু শুধু কি এ কথা আমিই জানি মা, জানে সবাই। এ কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায় লেখা আছে আপনার সর্বাঙ্গে, আপনি হেঁটে গেলে টের পায়। বাবু কি একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি একটু অপমানের কথা বলেছিলেন—এমন কত ঘরেই ত হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হলো না, সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্ছেন। বড়ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারো থাকে মা ?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারে না, সে ভয়েও নয়, আপনার অনুগ্রহের লোভেও নয়। সে হলে এ ছলনা কোনদিন না কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারে না সে শুধু এইজন্যেই মা।

সবিতা সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো, সে আমি জানি।

সারদা কহিল, কেবল ভালবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলে করি। তাই কল্পনা করা

দূরে থাক, ও কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জন দিয়ে কেমন করে চলে যা বেশ ?

কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

উপায় যদি না থাকে, আমাদেরও সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। আর, আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা ?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড়-ঘর থেকেই যদি এসে থাকি তুমিও তেমন ঘর থেকে আসো নি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমিই বা দেবো কেন ?

সারদা জবাব দিল, তা হলে দাসীর কাজ করবো না, আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন, তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সইবে না মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহে না, কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত। সবিতার নিজের মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামি-গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পান না। তাহার পরে সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে ধীরে ধীরে অনেক সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে-সকল সত্যই কি আজ ভার বোঝা ? সত্যই কি প্রয়োজন একে-বারে ঘুচিয়াছে ? আবার নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন ? সারদার সতর্ক বাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্বিঘ্ন আশ্রয়-ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়তো আজ আর তাঁহার নাই। পুণ্যময় স্বামি গৃহবাসের বহু স্মৃতি মানস পটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল, সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শান্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্য প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নগরীর অশুচি জীবনযাত্রার ঘূর্ণাবর্তে পাক খাইয়া ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর সন্ধান মিলিবে না। মনে মনে মানিতেই হইল সে নতুন-বৌ আর তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে. এ আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হউক, সে আশ্রয় বিসর্জন দিয়া শূন্য হাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন ; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ ও ঘৃণা অহরহ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে, তাহার—তাহার লালসালিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অতুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত অতি-প্রৌঢ় ব্যক্তির শয্যা পার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য সবিতা যেন হতচেতন হইয়া রহিলেন।

মা ?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা ?

সত্যি-সত্যিই চলে যাবেন না ত ?

আজ না হলেও একদিন তো যেতে হবে।

কেন যেতে হবে ? এ-বাড়ি তো আপনার।

না, আমার নয়, রমণীবাবুর।

এতদিন এই নামটা তিনি মুখে আনিতেন না যেন সত্যই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোশ খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল, হিন্দু-নারীর কানে ইহা বাজিবেই, এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা তো সবাই জানি, এ-বাড়ি তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের কতটুকু স্বত্ব জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল, শুধু মৌখিক ? লেখাপড়া হয়নি ? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা ?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্বস্বান্ত হইয়াও সুদে-আসলে সেদিন তাহা তিনি প্রত্যাপর্ণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করেছেন, এখন রাগের উপর যদি তিনি অস্বীকার করেন ?

সবিতা অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দেবো না। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা, রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার সুমুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক-মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়িটাও যেতে বসেছে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয় না ? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন, একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিল না বলেই তো বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে এতবড় পাপের কাজে ত আমার সাহস হতো না কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়,—কিছুই গ্রাহ্য করেন না—এমনি কি ক'রে সম্ভব হয় মা। বোধ হয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড় নই মা। কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নয়। সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাতে তো কোন গোলযোগ ঘটবে না মা ?

সবিতা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর দান সারদা,—সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগ ঘটার সাধ্য কার ?

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার

পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিল না। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে সে সংবরণ করিল, তখন কি তিনি বলিলেন, কি তিনি করিলেন এই সকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

সারদার বিস্ময়ের সীমা নাই—নতুন-মার এতখানি আত্ম-বিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নীচে হইতে ডাক আসিল—মাইজী।

সবিতা সচেতন হইয়া সাড়া দিলেন—কে মহাদেব?

দারোয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ি আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, মা, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখাল-রাজবাবু আছেন, তিনি কখনো রাগ করবেন না।

কেহ সঙ্গে যায়, এ ইচ্ছা সবিতার ছিল না, বলিলেন, রাগ হয়তো কেউ করবে না, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা?

সারদা কহিল, আমি সব জানি মা। রেণু অসুস্থ, আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার চেয়েও বেশী সাধ হয়েছে আমার রেণুর বাপকে দেখার,—প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নেবো। এই বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি-রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি-রকম মনে হয় সারদা? জমকালো ধরনের মস্ত মানুষ—না?

সারদা বলিল, না মা, তা মনে হয় না। কিন্তু তখন থেকেই ত ভাবচি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্ছে না।

কেন হচ্চে না সারদা?

হচ্চে না বোধ হয় এইজন্যে মা, তিনি ত কেবল রেণুর বাপ নয়, তিনি আপনারও স্বামী যে! মনে মনে কিছুতে যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারচি নে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয়—একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—মাথায় শিখা, চুলগুলি প্রায় পেকে এসেছে, গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, পূজায়, উপবাসে, আচারে, নিয়মে শীর্ণ এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

না মা, হয় না। আপনার হয়?

না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ-অপছন্দর জিনিস নয়, তাঁকে নির্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হোলো শাস্ত্রের বিধি, মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু

এ তর্ক কারা করে জানো মা, তারাই করে যারা সত্যি করে আজও মানুষেরর মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির আগুন জ্বেলে জীবনের পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার যাত্রায় স্বামীর রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দুদিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমন কথাটাকে ঠিক সত্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না, বুঝিল, এ তাঁর পরিতাপের গ্লানি, প্রতিক্রিয়ার অতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জনা-ভিক্ষা। ইচ্ছা হইল না প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বেদনা বাড়ায়, কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, বলিল, একটা কথা জানতে ইচ্ছে মা, কিন্তু—

সবিত কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আমাকে চাও না—এই ত? আর লজ্জা বাড়বে না সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেসা কর।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচে না। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, হয়তো জানতে চাও এই যদি সত্যি তবে আমারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেকদিন অনেকরকমে ভেবে দেখেচি, কিন্তু আমার গত জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা

যদিচ সারদা নিজেও কর্মফল মানে, তথাপি নতুন-মার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন, বলিলেন, আর এক জন্মের অজানা কর্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ জন্মের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলকধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেচে বলো ত? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?

এবার সারদা কথা কহিল সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেন নি মা?

না মা, সেদিনও না—কোনদিনই না।

তবু পদস্খলন হলো কেন?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচমকা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই তো দেখলুম,আজ হয়তো সর্বনাশের পাঁকের তলায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দুচোখ জলে ভেসে গেছে—ভেবেই পাইনি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে। দেখে তিরস্কার করবো কি নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা দোষে দুঃখের পালা যাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের পরে। কেন হয় জানিনে সারদা,

কিন্তু এমনিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিল না, মাথা নাড়িয়া বাঁধা-রাস্তার পাকা-সিদ্ধান্তের অনুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিল না এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা?

সবিতা উত্তর দিলেন না, আর তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাইরে শূন্য চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ি কালকের মত অপেক্ষা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নীচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠতেই চোখে পড়িল একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল, পাতিয়া দল এবং সবিতার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

সেই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু বাষ্প সমস্ত দেহ বারংবার কাঁপিয়া উঠিল এবং পর-ক্ষণেই দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন ইহা লজ্জাকর, হয়তো এ-অশ্রুর কোন মর্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইল না শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

## দশ

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ আপ্লাবিত আলোড়িত সাগরজল কিছুতেই যেন শেষ হইতে চাহে না। মেয়েটি কিন্তু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না, দুর্বল ক্লান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতে ছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদ্দামই যদি শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতেই ঘুচাইতে পারেন না, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল। কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে তাই বোধ হয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল—বোধ হয় যা' মনে আসিল তাই—বলিল, আজ তুমি কেমন আছো দিদি?

ভাল আছি।

জ্বর আর হয়নি?

না, আমি তো টের পাইনি।

ডাক্তার এখনো আসেন নি?

না তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কৈ, রাখালবাবুকে ত দেখচি নে? তিনি কি বাড়ি নেই?

না, তিনি পড়াতে গেছেন।

তোমার বাবা ?

তিনি সকালে বেরিয়েচেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল, এবারে সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে অনেক সংকোচের পরে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তুমি চিনতে পেরেছো রেণু ?

চিনবো কি করে, আমার তো মুখ মনে নেই।

বুঝতেও পারোনি ?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা পেরেচি। রাঙ্গুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচি নে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, নাম আমার সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখনও বলেন নি ?

না। এ-সব কথা আমাকে তিনি বলবেন, বলা ত উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনায় যতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো সে খুঁজিয়া পাইল না। মিনিট-খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল, কিন্তু একটু পরেই এক ঘটি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোবার জল এনেচি—উঠুন।

এই আহ্বানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই স্খলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট-কয়েক পরে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার কোড়ে এবং সম্মুখে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা আহ্নিকের জায়গা করে রেখেচি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোন দিয়া শুধু জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন আপনি চার-পাঁচদিন কিছু খাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধুলোয়-জলে লুটোপুটি করে একাকার হয়েছে, সে কিন্তু আমার দোষ নয় মা, সারদাদিদির। হ্যাঁ মা, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু আমার এ রকম শক্ত হোলো কেন মা ? ছেলে-বেলায় খুব কষে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন ? পাড়াগাঁয়ের ঐ বড়ো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়দিনের জ্বরে তাহার এলোমেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠেই চাপা রহিল। কথা বাহির না হউক, কিন্তু এই অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না ; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই তাঁহার অজানা নয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন। মেয়ে তাঁহাকে নীচে

স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁহাকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার যাই রাঁধি গে? আপনাকে কিন্তু খেতে হবে।

যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো, না খেয়ে আপনি নিস্তার পাবেন না।

নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুমি নিজে যে বড় দুর্বল, এখনো যে পথ্যই করোনি।

রেণু বলিল, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েচি আজ আর কিছু খাবো না। একটু দুর্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন মা? রাজুদার আসতে দেরি হবে, বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এতগুলি লোক খেতে পাবে না যে। তা ছাড়া আমাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাঁধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্চো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, মা, ভুলে গেছেন। আপনি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধেছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ কথার উত্তর আসিল না। সারদা বলিল, কিন্তু আবার জ্বর হতে পারে ত রেণু!

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বোধ হয় হবে না—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো সারদাদিদি, যতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে ত? আমাদের করবার ত আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সামান্যই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত-আটদিনের উপবাসে দুর্বল। মেয়েটা মরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ-জীবনে পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধ করি সবিতার আর কিছুতে মিলিত না যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ্য করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পুজো আহ্নিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন সারদা-দিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন, এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন উপবাস করে থাকলেই আর দোষ হয় না। সত্যিই নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ-কাজ

কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন না ; অথচ চিরদিন ঢিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায় তাঁহার প্রায়ই অযথা বিলম্ব ঘটিয় যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

জবাব না পাইয়া রেণু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মার বেলা সইতো না, খেতে একটু দেরি হলেও তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, দেশের বাড়িতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হতো না, উপোস করে কাটাতে হতো তার সংখ্যা নাই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেন নি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি ?

হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

তোমার বাবা কি বলেন ?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন'বচ্ছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের উপর। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে—পারবে ত মা ? বললুম, পারবো বাবা। তখন থেকে আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পুজো না হওয়া পর্যন্ত আমিই বাড়িতে না খেয়ে থাকি ; কিন্তু আজ থাকতুম না মা। জ্বরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিল না ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মর্মান্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটা কথারও উত্তর দিলেন না। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়ম-পালনে আর তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মেয়েটা কতটুকু বা বলিয়াছে ! তাহার বিমাতার উত্তপ্ত-চিত্তের সামান্য একটুখানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় হতশ্রদ্ধার তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই ত। এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়তো বিশেষ দোষেও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাঁহার কল্পনায় বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটিই হয়তো তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্তের জন্যও বুঝে নাই, তাহার কতদিনের কত মুখ ভার, কত চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অনুবিদ্ধ শান্তিহীন দিন, কত বেদনা-বিক্ষত দুঃখময় স্মৃতি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-হীনা, কোনস্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও শাসনে এই দুটি প্রাণীর—তাহার স্বামী ও কন্যার—দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ, কিসের জন্য ? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাহারি আপনার, সে-বোঝা যদি অপরে বহিতে না পারে,

সে দোষ কি তাহাকে দিবার ? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার ? অধর্মের মার যে এমন নির্দয়, একাকী এত দুঃখেও যে সংসার সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্বে এমন করিয়া আর সে উপলব্ধি করে নাই। গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে তাহার নিশ্বাস পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, তথাপি, প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রতিকার কি নাই ? সংসারে চিরস্থায়ী ত কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতির জগতে অবিনশ্বর ? কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সে-ই বিদ্যমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না ?

মা, বাবা এসেছেন।

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্তের জন্য সে সমস্ত বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত দেরি করলে যে ? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে ? দেখো ত বেলার দিকে চেয়ে ?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভভাবে বিলম্বের কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন ; সবিতা বলিলেন, কিন্তু আর বেলা করতে পাবে না। ঠাকুর-পুজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্চি !

তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেণু, দে ত মা আমার গামছাটা, জামাটা ছেড়ে চট্ করে নেয়ে আসি।

না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েছে, আমি তোমাকে সেজে দিই।

মা ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের উপর এত দরদ আর কারও হয় না নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠকলে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিলেন, ঠকতে আপত্তি নেই মেজকর্তা, কিন্তু এই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগে না, মা-ও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত-বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে ?

হাঁ।

মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনি ত ?

না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরীবের ঘর, কিছুই নেই। হয়তো তোমার কষ্ট হলো নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, সে হবে না মেজকর্তা, তুমি আমাকে

কটু কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে ত শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবুর মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বৌ। বলছিলুম, আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে!

সবিতা কহিলেন, দেখা দরকার মেজকর্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকতো। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধ হয় তিনিই টেনে এনেছেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বলিতে বলিতে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জনা করেন না মেজকর্তা?

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

কিন্তু কি করে জানতে পারবো?

তা জানিনে নতুন-বৌ, সে দৃষ্টি বোধ করি তিনিই দেন।

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

দিলেন?

কি জানো—

সে শুনতে চাইনে, দিলে কিনা বলো?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের ত জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্মভীরু লোক, কিন্তু দিনকাল এমন পড়েচে যে, মানুষে ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠে না। তাছাড়া নন্দ সা এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েচে ভাইপোদের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

সে আমি জানি। কেননা ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবো না। নন্দ সাকে আমি ভুলিনি।

কি করবে,—নালিশ?

হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখছি এক তিলও বদলায় নি।

কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেছে নাকি? দুঃসময় কার বেশী তোমার চেয়ে? কিন্তু কাকে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার মতো কৃতঘ্নের ঋণও শেষ কপর্দকও দিয়ে শোধ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটা পর্যন্ত আদায় দিয়ে, তবে তাঁরা অব্যাহতি পাবে।

তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের?

রাগ তো নয়, আমার জ্বালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয় স্বজন—কর্মচারী,—স্ত্রী পর্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লে না। এবার আমার

সঙ্গে তাদের বোঝা-পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনে না, কিন্তু তারা চেনে।

ব্রজবাবুর বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার দুবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিল। বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বৌ মরেছে জেনে যারা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাববে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়তো গয়ায় পিণ্ড দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিল, তারা যা ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু তুমি পিণ্ড দিতে না ছুটলেই হলো—ঐখানেই আমার ভাবনা। নিজে করবে না ত সে কাজ?

ব্রজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

উত্তর দিলে না যে?

ব্রজবাবু আরও কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। অপরাহ্ণ সূর্যের কতকটা আলো জানালা দিয়া মেঝের উপর রাঙ্গা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,তাহার প্রতি সবিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এর মতোই আমার বেলা পড়ে এলো নতুন-বৌ, পাওনা বুঝে নেবার আর সময় নেই। কিন্তু তুমি ছাড়া সংসারে বোধ হয় আর কেউ নেই যে বোঝে আমি কত ক্লান্ত। ছুটির দরখাস্ত পেশ করে বসে আছি, মঞ্জুরি এলো বলে। যা নিয়েচি, যা দিয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ হয়ে গেছে। হিসেব ভালো হয়নি জানি, গোঁজামিল অনেক রয়ে গেছে, কিন্তু তবু তার জের টানতে আর আমি পারবো না। তোমার এ অনুরোধ ফিরিয়ে নাও।

সবিতা একদৃষ্টে চাহিয়া শুনিতেছিলেন স্বামীর কথাগুলি, শেষ হইলে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি আর পারবে না মেজকর্তা? সত্যিই কি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচো?

সত্যিই বড় ক্লান্ত নতুন-বৌ, সত্যিই আর পারবো না। কত যে ক্লান্ত সে তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না; তারা বলবে আলস্য, বলবে জড়তা, ভাববে আমার নিরাশার হা-হুতাশ। তারা তর্ক করবে, যুক্তি দেবে, মেরে মেরে এখনো ছোটাতে চাইবে—তারা কথাটাই কেবল জেনে রেখেছে যে, কলে দম দিলেই চলে। কিন্তু তারও যে শেষ আছে এ তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করলে তুমি খুশী হবে?

খুশী হবো কিনা জানিনে, কিন্তু শান্তি পাবো।

কি এখন করবে?

রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাবো। সেখানে সব গিয়েও যা বাকী থাকবে তাতে কোন মতে আমাদের দিনপাত হবে। আর যারা আমাদের ত্যাগ করে কলকাতায় রইলো তাদের ভাবনা নেই, সে তো তুমি আগেই শুনেচো।

রেণুর ভার কাকে দিয়ে যাবে মেজকর্তা?

দিয়ে যাবো ভগবানকে। তাঁর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই, সে আমি জেনেচি।

সবিতা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ভগবানে তাঁহার অবিশ্বাস নাই; কিন্তু

নিজের মেয়ের সম্বন্ধে অতবড় নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হতেও পারে না। শঙ্কায় বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু ইহার উত্তর যে কি তাহাও ভাবিয়া পাইল না। শুধু যে কথাটা তাহার মনের মধ্যে অহরহ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল তাহাই মুখে আসিয়া পড়িল, বলিল, মেজকর্তা, আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে কি আমার অপরাধের দণ্ড দিতে? প্রতিশোধের আর কি কোন পথ খুঁজে পেলে না?

ব্রজবাবু বলিলেন, না হয় তুমিই নিজে পথ বলে দাও! আমাদের রতন খুড়ো ও রতন খুড়ীর কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজী আছ? এত দুঃখেও সবিতা হাসিয়া ফেলিল, সলজ্জে কহিল, ছি ছি, কি কথা তুমি বলো!

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো?

প্রস্তাবটা এত হাস্যকর যে বলামাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিল, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা।

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্যোজ্জ্বল একটুমাত্র হাসির কিরণে ঘরের গুমট অন্ধকার যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দণ্ড দিতে পারি? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পায়ে ঠেলে চলে গেলে, সেদিনই আমি স্থির করেছিলাম, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তোমার যা কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অঋণী হবো।

সবিতার বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই নতুন-বৌ, সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেন না উভয়ের দেখা হয়—সকল সম্বন্ধ যেন এইখানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিল, আমি বুঝেছি মেজকর্তা। ইহপরকালে আর যেন না তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়—এই ত?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল, সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমরা কবে বাড়ি যাবে মেজকর্তা?

যত শীঘ্র পারি।

এখন যাই তবে?

এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাষাণ স্তূপ-উধের্বাৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও সে তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্ধও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে, আজিকার পূর্বে এ কথা সে কবে ভাবিয়াছিল!

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াও সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মুক্তি পাবে

না মেজকর্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মানুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেছো, কিন্তু আমাকে পারলে না। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়তো তা জানতে পারবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। যাইবার সময় রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এই নীরবতার মন্ত্র সে-ও হয়তো তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়িতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা, একবার নেমে দাঁড়াতে হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভয়কে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমরা বাড়ি চলো।

## এগার

এক সপ্তাহ পূর্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা সতেরো নম্বর বাড়িতে আপনি ত যাবেন না—আজ সন্ধ্যেবেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধুলো দেন।

কেন রাজু ?

কাকাবাবুর জন্যে কিছু ফল-মূল কিনে এনেছি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজী হয়েছেন আসতে।

কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেছেন ?

তিনি না ডাকুন আমি ত ডাকচি মা। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেছেন গুছিয়ে-গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিতেন, ব্রজবাবু কোথাও কিছু খান না, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে,—বোধ হয় ভাবিয়াছে এ কৌশলেও যদি আবার দুজনের দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেকচিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহার্দ্র-চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা, আমি যাবো না। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে, ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই, কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়িভাড়ার আয়ে দিন ভালোই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি ত রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, বারো বৎসরব্যাপী প্রতিদিনের সম্বন্ধ, অথচ কত শীঘ্র কত সহজেই না ঘুচিয়া যায়। তাহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙ্গে সেদিন সকালেও সে জানিত না, রাত্রিটাও কাটিবে না, সমস্ত ছাড়িয়া তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্বপ্নেও সে কি কল্পনা করিতে পারিত এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে ? তবু সহিল ত ! আবার সহিল তাহারই। বারো বছর কাটিয়া গেল, আজও সে তেমনি বাঁচিয়া আছে

তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল, কোথাও আটক খাইয়া বাঁধিয়া রহিল না।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল সে আজও তাহার কারণ জানে না। যতই ভাবিয়াছে, আত্মধিক্কারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজে বিচার নিজে করিতে গেছে ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই—হেতু নাই—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিংবা, হয়তো এমনই জগৎ—অঘটন এমনি অকারণে ঘটিয়াই জীবন-স্রোত আর-একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের মতি, মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে, নালিশ করিতে গিয়া আসামীর তল্লাশ মিলে না।

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেন না। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করে না, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবে, নিষেধ করামাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল। নিরবিচ্ছিন্ন একত্র-বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিল না—নিঃশেষে মুছিয়া দিল।

হয়তো এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাহার মেয়ের মতো, মায়ের মতো। বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চেনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে, কখনো উঠানে, কখনো বা চলন-পথে। সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল, কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া সবিতার হৃদয়ের অন্তস্থলে! কিন্তু এই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার ঘর ভাঙিগয়া এমনি সহসা অদৃশ্য হইবে।

আরও একজন আসিয়াছেন তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর-প্রকৃতির লোক, স্বল্প-ক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই—দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আর্তের মিনতি, নাই উন্মাদ ব্যভিচার—শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এইমতো—

পূবের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলে, ভালই ত আছি।

কিন্তু ভালো ত দেখাচ্ছে না? যেন শুকনো-শুকনো।

কৈ না।

না বললে শুনবো কেন? খাওয়া-দাওয়ার কখনো যত্ন নিচ্ছেন না। অবহেলা

করলে শরীর থাকবে কেন—দুদিনেই ভেঙে পড়বে যে।

না ভাঙবে না, শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই যেন বাধা হয়ে উঠেচে। এটাকে ভেঙে ফেলাই এখন দরকার—না? সত্যি কিনা বলুন ত?

সবিতা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

বিমলবাবু বলেন, গাড়িটা পড়ে রয়েছে, মিছিমিছি ড্রাইভারের মাইনে দিচ্চেন, বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে যান না কেন?

বেড়াতে আমি ত কোনকালেই যাইনে বিমলবাবু।

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন, তা বটে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই। আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

না।

কালও আসেন নি ত?

না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়তো কোন বাজে কাজে ব্যস্ত আছে।

বাজে কাজে? ঐ তাঁর স্বভাব, না?

হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্যমনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া ডাকেন, বলেন, কৈ, আজ আমাকে জল দিলে না মা? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, আজ তা হলে আসি।

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ায়, নমস্কার করিয়া বলে, আসুন।

দিন-তিনেক পরে এমনিধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠিবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিল, আজ আপনার কাজের একটু আমি ক্ষতি করবো। এখনি যেতে পাবেন না, বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয়, এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিল কেউ বলেনি, এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ—মিছে সময় নষ্ট হয় ত?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে; কিন্তু এইজন্যেই কি কখনো বসতে বলেন না? সত্যি বলুন ত?

এ কথা সত্য নয়, কিন্তু এই লইয়া সবিতা বাদানুবাদ করিল না, বলিল, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

হাঁ, প্রায়ই হয়।

তিনি আর এখানে আসেন না—আপনি জানেন?

জানি বৈ কি।

আর কি তিনি এ-বাড়িতে আসবেন না?

সে-কথা জানিনে। বোধ হয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আজ সকালের ডাকে একটা দলিল এসে পৌঁছেচে। এই বাড়ি রমণীবাবু আমাকে বিক্রি-কবালায় রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। আপনি জানেন ?

জানি।

কিন্তু দেবার ইচ্ছেই যদি ছিল, সোজা দানপত্র না করে বিক্রি করার ছলনা কেন ? দাম ত আমি দিইনি।

কিন্তু দানপত্র জিনিসটা ভালো না।

সবিতা বলিল সে আমি জানি বিমলবাবু। আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিনে আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে, আমাকে দান করার কারণ দেখাতে বলিলে এমন সব কথা লিখতে হতো, যা কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের নয়। তবু বলি এ মিথ্যের চেয়ে সেই ছিল ভালো।

ই তপূর্বে এরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলে নাই। বিমলবাবু মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয় নতুন-বৌ।

নতুন-বৌ সম্বোধনটা নূতন। সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে খুশী হইল, কিন্তু, কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিল, ঠিক এই জিনিসটিই আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েছেন, কিন্তু কেন দিলেন ? তাঁর দান নেওয়ার তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্যে নিতে যাবো বলুন ?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কি হল উত্তর না দিলে দলিলফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো বিমলবাবু।

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েছি, পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়িটা আপনার কিনে রেখেচি।

টাকা তিনি নিলেন ?

হাঁ ভেতরে ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল আর যেন পেরে উঠছিলেন না।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, শুনেচি আপনার অনেক টাকা। এ ক'টা টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকি রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন, কিন্তু আমি নেবো কি বলে ?—না, সে হবে না—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবো না। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও ত নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয় না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিনে কিন্তু সে কথা যাক। এখানে আর কেউ নেই শুধু আপনি আর আমি। আমাকে

বলতে সংকোচ হয়, এ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই—বলুন ত এই কি সত্যি এই কি আপনার মনের কথা ?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানাবো কেন ? জানিয়ে ত লাভ নেই।

লাভ নেই তা-ও জানেন ?

হাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সংবরণ করিয়া কহিল, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু ?

না, জানিনে। শুধু যা ঘটেছে—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বৌ, তার বেশী নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিল—যা ঘটেছে সে কি তবে আমার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু ? ও দুটো কি একেবারে আলাদা ? বলুন ত সত্যি করে ?

তাঁহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখনি নিঃসংকোচে বলিলেন, হাঁ, ও দুটো এক নয় নতুন-বৌ। অন্ততঃ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই অসংশয়ে জানতে পেরেছি ও দুটো এক নয়।

ইহার অর্থটা যদিচ স্পষ্ট হইল না, তথাপি কথাটা সবিতাকে অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিল, স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলুম—আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি ত ভালো মেয়ে নই—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি, এ কথা কি আপনার মনে আসে না ?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদি-বা আসতে চেয়েছে তখনি সরিয়ে দিয়েছি।

কেন ?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেছে, এই করেছে, অতএব ওর এ-ই করা চাই, এ জবাব পাবেন আপনি তাদেরি পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশী পড়েছি নতুন-বৌ।

পড়ালে কে ?

সে ত একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাস্টার বদল হয়েছে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে, কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাস্টার যিনি, আড়ালে থেকে এঁদের যিনি নিযুক্ত করে ছিলেন তাঁকে ত দেখিনি, কি করে আপনার কাছে তাঁর নাম করবো বলুন ?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় খুব ধার্মিক লোক, না বিমলবাবু ?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্মিক লোক, আপনি কাকে বলেন ? আপনার স্বামীর মতো ?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তাঁকে কি চেনেন ? তাঁর সঙ্গে জানাশুনো আছে নাকি ?

বিমলবাবু তাহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্বের মতোই শান্তস্বরে

বলিলেন, হাঁ চিনি। একদিন কোনমতে কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, গেলুম তাঁর কাছে। অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্তাও অনেক হলো—না নতুন-বৌ, ধর্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েছেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেছেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই। ধার্মিক লোক আমি নয়!

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই, সমস্ত কৌতূহলের মূল কারণ সে নিজে! থামিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, ওখানে মিল না থাক, কোথাও কি আপনাদের মিল নেই? দুজনের স্বভাব কি সম্পূর্ণ আলাদা?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনাকে দেবো না, অন্ততঃ দেবার এখনো সময় আসেনি।

অন্ততঃ বলুন এ কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে বেউ ছেড়ে চলে গেল কি করে?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, বেউ মানে আপনি ত? কিন্তু ছেড়ে চলে ত' আপনি যাননি। সব ই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

এ-ও শুনেছেন?

শুনেছি বৈ কি।

সমস্তই?

সমস্তই শুনেচি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিল, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু এত জেনেও আমাকে ভালোবাসলেন কি করে বলুন তো?

ভালোবাসি এ কথা ত আজো বলিনি নতুন-বৌ।

না, বলেন নি বলেই ত এ কথা এমন সত্যি করে জানাতে পেরেচি বিমলবাবু। কিন্তু, মনে ভাবি সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই—বাকী যেটুকু আছে তাও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে মানুষ কি ভেবে?

বিমলবাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়তো সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়তো পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপ-যৌবনের লোভে নয়, এ কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এ কথা আমি সত্যিই বুঝেচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল।

সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, এমনি করে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেন না আমার?

জবাব নেই নতুন-বৌ। শুধু জানি আপনাকে আমি পাবো না—পাবার পথ নেই আমার।

কেন নেই? কি করে বুঝলেন সে কথা?

বুঝেচি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বৌ। একদিন অনেক মেয়েরেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট করে—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিলে তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে-যে ভেসে গেলো আজ খবরও জানিনে।

একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-হেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল, শুধুই ঐশ্বর্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালোবাসেন নি?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বৈ কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল, কিন্তু খেলা ভাঙলো—তাকে রাখতে পারলুম না। দোষ তাকে দিইনে, কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকী নেই, ভালোবাসার ধনকে ছোট করে ধরে রাখা যায় না—তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল,—এই কি আপনার ভয়?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বৌ--এখন এই আমার ব্রত, এর থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেচি, আপনার স্বামীকে দেখে এসেচি। কি করে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে তিনি চলে গেছেন তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকী কিছু নেই, এর পরে আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোর যে বন্ধ। জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবো না, আবার তার চেয়েও বেশী জানি যে, ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই ত বলেছিলুম নতুন-বৌ, নিন আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলে। এই বাড়িটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়।

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল, কত কথাই যে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দেশ নাই, শেষে মুখ তুলিয়া কহিল, এ বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমল-বাবু? এ মিথ্যের আবরণ টিঁকবে কেন? নর-নারীর মূলে সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে?

বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো, কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবো না। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো দু'চোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আমাকে ডাকবেন—বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, কহিল, আপন পরিচয় পেতে আর বাকী নেই বিমলবাবু চোখের এ-দৃষ্টি আর ইহজীবনে বদলাবে না। শুধু আশীর্বাদ করুন, যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা যেন সইতে পারি।

বিমলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে আমি বসবো না, শুধু প্রার্থনা করবো, যেমন করেই এসে থাক এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

কিন্তু চিরস্থায়ীই ত হয়ে রইলো।

তাও জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকী আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায় নি। আশীর্বাদ তোমাকে যদি করতেই হয়, এই আশীর্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিল না, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। মুখ যখন সে তুলিল তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে; মৃদুকণ্ঠে কহিল, তারক বর্ধমানের কোন একটা গ্রামে মাস্টারি করে, সে আমাকে ডেকেছে। যাবো দিনকতক তার কাছে?

যাও।

তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে?

থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আপিস খুলেচি, তার অনেক কাজ বাকী।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা ত অনেক জমালে—আর কি করবে?

প্রশ্ন শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, জমাই নি, ওগুলো আপনি জমে উঠেছে নতুন-বৌ, ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি, সময় হলে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল,—এ বাড়িটায় আর আমার দরকার ছিল না—ভেবেছিলাম ভালোই হলো যে গেলো, একটা ঝঞ্ঝাট মিটলো; কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। ভাড়াটেরা রইলো এদের দেখো।

দেখবো।

আর একটি অনুরোধ করবো, রাখবে?

কি অনুরোধ নতুন-বৌ?

আমার মেয়ে, আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাঁদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিল না, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে কপালে ঠেকাইল, সে স্বামীর উদ্দেশে, না বিমলবাবুকে, বোধ করি নিজেও জানিল না। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো—সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, আমি বাপের বাড়িতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো ত?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েছেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়,

কিন্তু এমনি করেই বোধ করি সে-বুড়োর বিচিত্র খেলার রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ রুজু করে দেবো। কি বলো ?

দূরে সারদাকে বার-কয়েক যাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না মা ? উঠতে হবে ?

সারদা ভারী অপ্রতিভ হইয়া বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না কখ্খনো না। দেরি হয়ে গেছে আপনার—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবো না মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে।

চললুম।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সারদার অনুরোধে যোগ দিল না।

বিমলবাবু প্রত্যহের মতো আজও প্রতি-নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

## বার

রমণীবাবু আর আসেন না, হয়তো ছাড়াছাড়ি হইল। দুজনের মাঝখানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায় না। আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষণ্ণ মুখ—পূর্বের তুলনায় কত-না প্রভেদ। জ্যৈষ্ঠের শূন্যময় আকাশ আষাঢ়ের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়, তৃণ-পুষ্পে, গাছে গাছে লাগিয়াছে অশ্রু-বাষ্পের সকরুণ স্নিগ্ধতা, তেমনি জলে-স্থলে, গগনে-পবনে সর্বত্র দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায়, আচরণে উগ্রতা ছিল না তাঁর কোনদিনই, তথাপি কিসের একটা অজানিত ব্যবধানে এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ির মেয়েরা এই কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু মোটের উপর ছিলেন ভালোমানুষ লোক, থাকিতেন পরের মতো, কাহারো ভালোতেও না, মন্দতেও না। মাঝে মাঝে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য অসদাচরণ করেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেকেরই, তবু সেই যাওয়ার কলঙ্কিত-পথে নতুন-মার সকল কালি যদি এতদিনে ধুইয়া যায় ত শোকের পরিবর্তে তাহারা উল্লাসবোধই করিবে। এ-যেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া নিজেরাই নির্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে না থাকিলে তাহারাই বা দাঁড়াইবে কোথায় ? আজ সারদা এই বিষয়েই তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসীমা, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হলো। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকো—তোমাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবে না, মা বলে দিলেন।

তবে বুঝি মা আর কোথাও যাবেন না সারদা ?

যাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেশীদিন থাকবেন না বললেন।

আনন্দে পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অন্য সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিমলাবাবু বিদায় লইবার পরে সবিতা আসিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করে। পূর্বে তাহার আহ্নিক সারিতে বেশী সময় লাগিত না, কিন্তু এখন লাগে দু'তিন ঘণ্টা। কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে, কোনদিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নীচে নামিয়া নিজের গৃহকর্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন? তার পরে কুণ্ঠিত-স্বরে কহিল, না-জানি কত ভুলচুকই হয়েছে! না?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুলচুক শুধরে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটা ত কিছুই এগোয় নি দেখচি।

না। সময় পাইনে যে।

পাও না কেন?

কি করে পাবো বলুন? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

নতুন-মার দাসী-চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলো না কেন তোমারো সময়ের দরকার—তোমারো কাজ আছে। এ কিন্তু ভারী অন্যায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম অন্যায় দেবতা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। পরকে অকারণ পীড়ন করলে নিজের হয় জ্বর, ঘরের মধ্যে একলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটে না। এত রোগা দেখচি কেন বলুন ত?

রাখাল বলিল, রোগা নই, বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা হঠাৎ অকাজ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয় ত কি! হলো জ্বর, তাও ঢাকতে হলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওটা লিখেই না হয় দিলুম, কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি?

কাজে লাগবে না? তুমি বলো কি সারদা?

সারদা কহিল, এই বলচি যে, এ-সব কিচ্ছু কাজে লাগবে না। আর যদিই বা লাগে আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। একছত্রও আর আমি লিখবো না।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবে না ত আমার শোধ দেবে কি করে?

ধার শোধ দেবো না—ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল, তাহার হাতটা নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো কিন্তু সাহস করিল না। বরঞ্চ, একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারো না ও-গুলোর সত্যিই দরকার আছে?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হায়রান করার—আর কিছু না। কেবল কতকগুলো রামায়ণ-মহাভারতের কথা—এখান-সেখান থেকে নেওয়া—ঠিক যেন যাত্রা দলের বক্তৃতা। ও-সব কিসের জন্যে লিখতে যাবো?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা হইল বিস্ময়াপন্ন তার ঢের বেশী হইল বিপদাপন্ন। বস্তুতঃ লেখাগুলো তাই বটে। সে যাত্রার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারীদের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু-মহলে প্রকাশ করে না, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায় না যে তাহা নয়, কিন্তু

এ আষে তাহার ট্রামের মাশুলের সংকুলান হয় না। তাহার ইচ্ছা নয় যে, উপার্জনের এই পথটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারী লজ্জার তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিত বলিয়া প্রচার করিয়াছিল হয়তো তাহা সত্য নয়, হয়তো বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়তো বা তাহার চেয়েও রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল কারণ, সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিদ্যা—যতটা জানে আইন স্টাইনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সফোক্লিজের অ্যানটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় পাছে গর্তে পা পড়ে। যাত্রার পালা লেখার লক্ষ্যটাও তাহার এই-জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল—আগে ত তুমি ঢের ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমন দুষ্টু হয়ে উঠলে কি করে?

সারদা হাসিয়া কহিল, দুষ্টু হয়ে উঠেচি?

ওঠোনি? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি?

বলচি। আগে আপনি বলুন ছ-সাতদিন আসেন নি কেন?

শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশী। এ-কে শরীর খারাপ বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, যাকে নানী বলে ডাকেন, সে-ও ছিল শয্যাগত। স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে করতে হয়েচে সাগু-বার্লি তৈরি। শুনি আপনার বন্ধুবান্ধব আছে অনেক, তাদের কাউকে খবর দেননি কেন?

প্রশ্নটা রাখালের নতুন নয়—গত বছরেও প্রায় এমনিই অবস্থাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল—এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না যে, সংসার বন্ধু-সংখ্যা যাহার অপরিমিত, দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব?

সারদা বলিল, তারা যাক, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেন না কেন?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা! নতুন-মা! যাবের আমার সেই পচা এঁদো-পড়া বাসায় সেবা করতে? তুমি কি যে বলো সারদা তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অসুখের সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে?

সারদা কহিল, যে-ই দিক, কিন্তু দুঃখ এই যে সময়ে দিলে না। শুনে নতুন-মা বললেন, রাজু আমার রেণুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মুখে অন্ন যুগিয়ে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা করে, নিজের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে ডাক্তার-বদ্যির ঋণ শুধে। আর ও যখন পড়লো অসুখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্টার জল কল থেকে আনতে, উনুন জ্বেলে আপনি করলে ক্ষিধের পথ্যি তৈরি, ও ওষুধ পেলে না আনবার লোক নেই বলে কিন্তু আমাকে খবর দেবে কেন মা—আমাকে তার বিশ্বাস ত নেই। মেয়ের অসুখে পরের নাম করে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে—দিইনি ত। বলিতে বলিতে সারদার নিজের চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেবতা? কেরানীগিরি করে আজও টাকা শোধ দিইনি, সেই রাগে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা, তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো করেই তুলচো। জ্বর কি কারো হয় না? দুদিনেই ত সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে দয়া আমাদের ওপর,—আপনাকে না। আসলে আপনি ভারী খারাপ লোক। বিষ খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেন না—হাসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে ত এই, আবার অন্যদিকে অসুখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তাও আপনার সইলো না। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেন না? কি করেছিলুম আপনার? এ জন্মের ত দোষ দেখিনে, একি গতজন্মের দণ্ড নাকি?

রাখাল জবাব দিতে পারিল না, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখচোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্‌ভ করিয়া দিল কিসে!

সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতে বলিতে পারিত না, কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল—নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন—আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃ পথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জ্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না। বলিতে লাগিল, জানেন দেবতা, জানি আমি, কেন আপনি আজো বিয়ে করেন নি। আসলে মেয়েদের ওপর আপনার ভারী ঘৃণা। কিন্তু এ-ও জানবেন যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতির নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার হলো কি বলো ত সত্যি আজ আমার ভার রাগ হয়েচে।

কেন?

কেন! কিসের জন্য আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন?

দিলেই বা কি হতো? সেখানে অন্য কোন মেয়ে নেই,—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুম না ত কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

ফিরে আসবেন না তা আপনাকে অনেকবার বলেচি—আপনি বলবেন তুমি জানলে কি করে? তার জবাব এই যে, আমি জানবো না ত সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ ছাড়া আরো একটা কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ বাড়িতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার ঘরে এসে বসেন—যদি যেতে না দিই, ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন ত?

এ কি তামাশা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে লজ্জা বাড়িবে বৈ কমিবে না, তাই জোর করিয়া কোনমতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে ত অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত দরকার হতো না। কিন্তু আজ এলে তাকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো—সে কত যে

সয়েচে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়,—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ সারদা অন্য জন। তার পুনর্জন্মে তার পরে আর কারো দাবী নেই।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেবতা হাসপাতালে বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞেসা করেচেন, তুমি কোথায় যেতে চাও; উত্তরে আমি বার বার কেঁদে বলেচি, আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই। শুধু একটা স্থান ছিল—সেই-খানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝপথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনবাবুকে দেখে রাখুন, শুধু বাড়ির লোকের মুখে তাঁর নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্বামী নন? সবই মিথ্যে?

হাঁ, সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্বামী নন।

তবে কি তুমি বিধবা?

হাঁ, আমি বিধবা।

আবার কিছুকাল নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো?

রাখাল কহিল, না সারদা, আমি অতো অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে চুপ করিল। তখনই বুঝিল, এ উল্লেখ অনধিকার চর্চা, এ তাহার আপনা অপমান। একি বিশ্রী কটু কথা মুখ দিয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল।

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুষ করেছিলেন—।

রাখাল কহিল, হাঁ, তিনি আমার মা-ই-ত। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছেন কিনা বলতে চাও না, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যে যাবে না এ আমি নিশ্চয় বুঝেচি, কিন্তু কি এখন করবে?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন মার কাজ করবো।

কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি ত নয়—মায়ের সেবা। অন্ততঃ, বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকী, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সে সমস্যার মীমাংসা হয় না।

সারদা বলিল, যত টাকারই দরকার হোক, আপনার কেরানীগিরি করতে আমি পারবো না। বরঞ্চ ছোট্ট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নীচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে ত ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিল, বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জানবেই না— ঘুষ দিয়ে লোকে বলে না—আমার লজ্জা কিসের ?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার সাহসে বাধল,—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঝি বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

মার আহ্নিক কি শেষ হয়েচে ?

হাঁ, হয়েছে, বলিযা সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেন না মার সঙ্গে দেখা করতে ?

রাখাল কহিল, তুমি যাও আমি পরে যাবো।

পরে কেন ? চলুন না দুজনে একসঙ্গে যাই। বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল ঘরখানি যে রসে, মাধুর্যে নিবিড় হইয়া উঠিল সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিযাছে, কতদিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন ? বক্ষের নিগূঢ় অন্তস্তলে এ কে কথা কয় ? কি বলে ? স্বর অস্ফুটে কানে আসে, ভাষা বুঝা যায় না কেন ? কত শত মেয়েকে সে চেনে, কতদিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্যে গল্পে-গানে হাসিতে-কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই—মনের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে কিন্তু সারদার—এই একটিমাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে-বিস্ময় আজ মূর্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল, এ জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা ? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল ? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই ? এই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না ?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই,—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন বৃহত্তরের আশায় ? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হাঁটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত স্বৈরাচারের কলঙ্ক-প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু-সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন্ দুঃসাহসে ? আবার তখনি মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে যাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপালে, নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়—গাড়ির বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো তার পরে যমে মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখে সেই প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া ? কি করিয়া ভুলিবে সে তাহারি হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ করিয়া সেই দু'চোখের জল মুছিয়া বলা— আর আমি মরবো না দেবতা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল— অঙ্গীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু, মা ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেটা উলটাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধুলা লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না আসার কথা, তাহার অসুখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেন না, শুধু স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা মস্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা, আমাকে মার্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জ্বরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন যত জ্বালাতন আমি করেছি তত আপনার রেণুও না। তারপর হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদলে—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে তোলা ছিল সে তখনি শুধু টের পেলুম। ঠাকুরঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর ত সইতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেছেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? চাকরবোয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখ নি।

রাখাল সহাস্যে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্যে। অভ্যাস ত নেই, দুঃখের দিনে মনে পড়ে না মা, বিসংসারে আমার কোথায় কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেন না—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়াল হইতে বোধ হয় শুনিতেছিল, সুমুখে আসিয়া বলিল, দেবুতাকে খেয়ে যেতে বলুন না মা, সেই ত বাসায় গিয়ে ওঁকে নিজেই রাঁধতে হবে।

নতুন-মা বলিলেন, আমি কেন সারদা, ও নিজেই ত বলতে পারো মা। তার পরে স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি বাঁধতে হয় এ যেন ও সইতে পারে না—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন এ কথা সারদা একটি দিন ভোলে না।

পলকের জন্য রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন স্ত্রী কে যে কি করে তার স্বামী ফেলে দিয়ে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন। এবং বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার ওঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেন না।

সবিতা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে দু-চারদিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আমাকে মানুষ—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন, ওর না আছে বাড়িঘর, না আছে আত্মীয়-

স্বজন, না আছে উপার্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম, কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দুবেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অন্যায় আদেশ মা কখনো দেবেন না।

সারদা বলিল, কিন্তু, দিলে?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নিয়তি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিল খাবার তৈরী হইয়াছে। রাখাল বুঝিল, এ আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরি করে সে গ্রামটি নদীর একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে সে ধরেছে দিন-কয়েক গিয়ে তার ওখানে থাকি। স্থির করেচি যাবো।

প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেচে না কি?

চিঠিতে নয়, দিন-দুয়েকের ছুটি নিয়ে সে নিজে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে। যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে ও উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কলকাতায়? আমি ত জানিনে।

সবিতা বলিলেন, জানো না? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি শুধু দুটো দিনের ছুটি কিনা।

রাখাল আর কিছু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অসুখের পূর্বের দিনই সে তারককে একখানা পত্র লিখিয়াছে। তাহাতে বলিয়াছে, ইদানীং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন কয়েকের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়িতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

## তের

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, ভারী অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেবতা?

খাবো বৈ কি। যেদিন বলবে।

তবে পরশু। এমনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

রাখাল সংশয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়া এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত খাওয়ার মধ্যে নেই দেবতা, দোষ আছে চুপি-চুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানিয়ে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনি।

সত্যি পারো না, না বলতে হয় তাই বলচো?

অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবো না, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া

রাখালের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, বেশ, তাই হবে—পরশুই আসবো বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশী নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করিল না। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি ভেবেছিলুম হয়তো আপনার রাত হবে, কিংবা হয়তো ভুলেই যাবেন, আসবেন না।

ভুলে যাবো এ তুমি কখনো ভাবোনি সারদা, এ তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই?

দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন, বাহুল্য কিছুতে নাই। রাখাল খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এমনই আমি মনে মনে চেয়েছিলুম সারদা, কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলুম আরও পাঁচজনের মতো যত্ন দেখানোর আতিশয্যে কত বাড়াবাড়িই না করবে! কত জিনিস হয়তো ফেলা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি করোনি।

সারদা কহিল, জিনিস ত আমার নয় দেবতা, আপনার। নিজের হলে বাড়াবাড়ি করতে ভয় হোতো না, হয়তো করতুমও—নষ্টও হোতো।

ভালো বুদ্ধি তোমার!

ভালোই ত। নইলে আপনি ভাবতেন মেয়েটার অন্যায় ত কম নয়। দেনা-শোধ দিল না, আবার পরের টাকায় বাবুয়ানি করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, টাকার দাবী ছেড়ে দিলুম সারদা, আর তোমাকে শোধ করতে হবে না, ভাবতেও হবে না। কেবল খাতাটা দাও, আমি ফিরে নিয়ে যাই।

সারদা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তা হলে ছাড়া রফা হয়ে গেল বলুন? এর পরে আপনিও টাকা চাইতে পাবেন না, আমিও না। অভাবে দিদি মরি তবুও না। কেমন?

রাখাল বলিল, তুমি ভারী দুষ্টু সারদা। ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলে না?

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেবতা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে, কেউ চিনতেই পারে না।

একটুখানি থামিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা থাক, কিন্তু জীবনবাবুর কথা বলি। সত্যই আমাকে তিনি চিনতে পারেন নি। সে বুদ্ধিই তাঁর ছিল?

রাখাল কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, বুদ্ধি থাকলে কি করা তাঁর উচিত ছিল না।

উচিত ছিল পালিয়ে না যাওয়া। উচিত ছিল বলা, আর আমি পারিনে সারদা, এবার তুমি ভার নাও।

বললে ভার নিতে?

নিতুম বৈ কি। ভেবেচেন ভার নিতে পারে শুধু পুরুষ, মেয়েরা পারে না। পারে। আমি দেখিয়ে দিতুম কি করে সংসারের ভার নিতে হয়।

রাখাল বলিল, এতই যদি জানো ত আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

ভেবেছেন মেয়েরা বুঝি এইজন্যে আত্মহত্যা করে? এমনি বুদ্ধিই পুরুষদের। বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া কহিল, আমি করেছিলুম আপনাকে দেখতে পাবো বলে। নইলে পেতুম না ত,—আপনিও থাকতেন আমার কাছে তেমনি অজানা।

রাখালের মুখে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। তাহার আর কোন শিক্ষা না হোক, মেয়েদের কাছে সাবধানে কথা বলার শিক্ষা হইয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল দেবতা, আপনি বিয়ে করেন নি কেন? সত্যি বলুন না।

রাখাল মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া বলিল, তোমার এ খবর জেনে লাভ কি?

সারদা বলিল, কি জানি কেন আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করে। সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনি যা-তা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ কিছুতে শুনবো না, আপনাকে বলতেই হবে।

রাখাল বলিল, সারদা, আমাদের সমাজে কারও বা বিয়ে হয়, কেউ বা নিজে বিয়ে করে। আমার হয়নি দেবার লোক ছিল না বলে। আর নিজে সাহস করিনি গরীব বলে। জানো ত, সংসারে আপনার বলতে আমার কিছু নেই।

সারদা রাগ করিয়া বলিল, এ আপনার অন্যায় কথা দেবতা। গরীব বলে কি মানুষের বিয়ে হবে না? তার সে অধিকার নেই? জগতে তারা এমনি আসে আর যাবে, কোথাও বাসা বাঁধবে না? কিন্তু সে ত নয়, আসলে আপনি ভারী ভীতু লোক—কিচ্ছু সাহস নেই।

রাখাল তাহার উত্তাপ দেখিয়া হাসিয়া অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল, বলিল হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত সত্যিই আমি ভীতু মানুষ—অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাই।

কিন্তু ভাগ্য ত চিরকালই অনিশ্চিত দেবতা, সে ছোটবড় বিচার করে না, আপনি নামে আপনি চলে যায়।

তা-ও জানি, কিন্তু আমি যা,—তাই। নিজেকে ত বদলাতে পারবো না সারদা।

না-ই বা পারলেন? যে স্ত্রী হয়ে আপনার পাশে আসবে বদলাবার ভার নেবে সে সে—নইলে কিসের স্ত্রী? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে।

করতেই হবে নাকি?

সারদা এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর জোর দিয়া বলিল, হাঁ করতেই হবে, নইলে কিছুতে আমি ছাড়বো না। এখুনি বলছিলেন কেউ ছিল না বলেই বিয়ে হয়নি, এতদিনে আপনার সেই লোক এসেচি আমি। তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো কি করে গরীবের ঘর চলে, কি করে সেখানেও যা-কিছু পাবার সব পাওয়া যায়। কাঙালের মতো আকাশে হাত পেতে কেবল হায় হায় করে মরার জন্যেই ভগবান গরীবের সৃষ্টি করেন নি, এ বিদ্যে তাকে দিয়ে আসবো।

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল মনে মনে সত্যিই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু মুখে বলিল, এ বিদ্যে শিখতে যদি সেনা পারে—শিখতে না যদি চায়, তখন আমার দোষ

ভার নেবে কে সারদা ? কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো ?

সারদা অবাক হইয়া রাখালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কারো কাছে না। মেয়েমানুষ হয়ে এ কথা সে বুঝবে না, স্বামীর দুঃখের অংশ নেবে না, বরঞ্চ তাকে বাড়িয়ে তুলবে এমনি হতেই পারে না দেবতা। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবো না।

আর একবার রাখাল জিহ্বাকে শাসন করিল, বলিল না যে মেয়েদের আমি কম দেখিনি সারদা, কিন্তু তারা তুমি নয়। সারদাকে সবাই পায় না।

জবাব না দিয়া রাখাল নিঃশব্দে আহারে মন দিয়াছে, দেখিয়া সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, কৈ কিছুই ত বললে না দেবতা।

এবার রাখাল মুখ তুলিয়া হাসিল, বলিল, সব প্রশ্নের উত্তর বুঝি তখনি মেলে ? ভাবতে সময় লাগে যে !

সময় ত লাগে, কিন্তু কত লাগে শুনি ?

সে কথা আজই বলবো কি করে সারদা ? যেদিন নিজে পাবো, উত্তর তোমাকেও জানাবো সেদিন।

সেই ভালো, বলিয়া সারদা চুপ করিল ! ঘরের মধ্যে একজন নীরবে ভোজন করিতেছে, আর একজন তেমনি নীরবে চাহিয়া আছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল, ও কি ?

সারদা সলজ্জে মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু না ত। একটু পরে বলিল, পরশু বোধ হয় আমরা হরিণপুরে যাচ্চি দেবতা।

পরশু ? তারকের ওখানে ?

হাঁ। কাল শনিবার, তারকবাবু রাতের গাড়িতে আসবেন, পরের দিন রবিবারে আমাদের নিয়ে যাবেন।

যাওয়া স্থির হোলো কি ক'রে ?

কাল নিজেই তিনি এসেছিলেন।

তারক এসেছিল কলকাতায় ? কৈ, আমার সঙ্গে ত দেখা করেনি।

একদিন বৈ তো ছুটি নয় —দুপুরবেলায় এলেন, আবার সন্ধ্যার গাড়িতেই ফিরে গেলেন।

একটু পরে বলিল, বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না ?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

ওঁর মতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেবতা ?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দেখাইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিদ্যেই নয়, যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর। বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত ভারী বোঝা—যাবার সময় নিজে তুলে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে রাখলেন। আপনি কখনো পারতেন না দেবতা।

রাখাল স্বীকার করিল, না, আমি পারতাম না সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্বল।

কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেন নি। তারকবাবু বলছিলেন, চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায় মেলে তাকে জিজ্ঞেসা করলে না কেন? তার জবাবটা হয়তো আমার কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ জিজ্ঞেসা করবো; কিন্তু এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের,—আসলে সত্যিও নয় তাঁর জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর ওপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের ওপর? এ সন্দেহ তোমার হলো কি করে?

কি জানি কি করে হলো, কিন্তু হয়েচে তাই বললুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিল না।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা ছোট্ট জায়গার ছোট্ট ইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি নারাজ। সেখানে বড় সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েছে সংকুচিত, বুদ্ধি রয়েচে মাথা হেঁট করে, তাই শহরে ফিরে আসতে চান। এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার, না তার সারদা?

না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। মাকে বলছিলেন আমি শুনেচি।

শুনে নতুন-মা কি বললেন?

শুনে মা খুশীই হলেন। বললেন, তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অন্যায়। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

করবেন কি করে?

সারদা বলিল, শক্ত নয় ত দেবতা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন ত কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য কি?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানে না। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন আমি বলচি।

মিনিট-কয়েক পরে হাতমুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তার পরে অদূরে মেঝের উপরে বসিয়া বলিল, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন?

চলে গেছেন? কৈ না! কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন, কিন্তু এখানে আর আসেন না। যেতে তাঁকে হতোই—এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিল না—কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল করে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ করি আমার কাছ থেকে জীবনবাবুও যায়নি। এই বলিয়া সে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘটতোই, কিন্তু উপলক্ষ্য হলেন আপনি। সেই যে রেণুর অসুখে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন, আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অন্যায়

যাকে ভেঙ্গে গড়লো, এ ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেন না। আমাকে ডেকে বললেন, সারদা, রাজুকে আজ আমার চাই-ই, নইলে বাঁচবো না। এসো তুমি আমার সঙ্গে। যা-কিছু মাবের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায়, তার পরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ি, কিন্তু সব খালি, সব শূন্য। নোটিশ ঝুলছে বাড়ি ভাড়া নেবার।

জানা গেল না কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো বা নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার---পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলেছে খাওয়া দাওয়া নাচ-গান আনন্দ কলরব কিছু নেই, কেবল বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম—এছাড়া সান্ত্বনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি।

সেদিন বিমলবাবু ছেলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে, বললেন, চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটীপতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না, সে হবে না। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে কথা মা না জানতেন তা নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে এখন মুখ দেখানো ছিল বোধ করি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি, কথাগুলি মৃদু, বললেন, অনধিকার-প্রবেশের অন্যায় হলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসে পারলাম না। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন, ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা, ভালো আপনি নেই। কিছুকাল আগে ছবি আপনার দেখেছি, আর আজ দেখছি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমিই বুঝি। এ চলতে পারে না, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিঙ্গাপুরে? সেখানে আমি থাকি—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে আমার। হাওয়ারও শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্বের দেহ আবার ফিরে আসবে,—চলুন—।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেন না?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় ত নেই, মেয়ে যে পীড়িত স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জ্বলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যেতে পারবো না।

তার পরে শুরু হলো অপমান আর কটু কথার ঝড়। সে যে কত কটু আমি বলতে পারবো না দেবতা। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে যেখানে যত ছিল নোংরামির আবর্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলো না যে, মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়—রক্ষিতা। সতীর মুখোশ পরে ছদ্মবেশে রয়েছে শুধু একটা

গণিকা। তখন আমি একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম, পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এতবড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেবতা?

রাখাল নিষ্পলক-চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়াছিল, এবার ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্তি। রমণীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কিনা বলো? ভাবচো কি বসে?

মার কণ্ঠস্বর পূর্বের চেয়েও মৃদু হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম? কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙেচে। আর তুমি এসো না এ-বাড়িতে, আর যেন না আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ-বাড়ি কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ি আমার নয়, তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু এ জবাব রমণীবাবু আশা করেন নি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হলো—ভয় পেয়ে নানাভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মনে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েচে, কিছুতেই সে আর ফিরবে না।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা কে ভেবেছিল।

রাখাল কহিল, তারপরে?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেবতা! বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মার অপমান তাঁর কি-যে লাগলো—তিনি ছিলেন পর—একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ি কিনে নিয়ে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় যেতে হতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুশী করিতে পারিল না, তাহার মন যেন দমিয়া গেল। বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়তো তাঁর কাছে কিছুই নয়—কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া ত তাঁর প্রকৃতি নয়!

সারদা বলিল, হয়তো তিনি আর পর নয়, হয়তো নেওয়ার চেয়ে না নেওয়ার অন্যায় হতো ঢের বেশী।

রাখাল বলিল, এ ভাবে বুঝতে শিখলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হলো, আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়তো দেখা হবে।

সারদা তড়িৎবেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন করে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবো না।

তুমি হঠাৎ বলো কাকে ? রাত হলো যে—যাবো না ?

যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেন না ?

আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন ? দেখা করার শর্তও ত ছিল না। চুপি চুপি এসে তেমনি চুপি চুপি চলে যাবো এই ত ছিল কথা।

সারদা বলিল, না, সে শর্ত আমি আর মানবো না। দেখার প্রয়োজন নেই বলচেন ? মার নিজের না থাক আপনারও কি নেই ?

রাখাল বলিল, যে প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে—সে কখনো ঘুচবে না,—কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখতে পাইনে সারদা।

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গূঢ় বেদনা সে চাপা দিতে পারিল না, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল আজ একটা প্রার্থনা করি দেবতা, ক্ষুদ্রতা ঈর্ষা আর যেখানেই থাক আপনার মনে যেন না থাকে। দেবতা বলে ডাকি, দেবতা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে যে তাঁর যাওয়া হবে না।

আমি না বললে যাওয়া হবে না ? তার মানে ?

মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললেন, ছেলে বড় হলে তার মত নিতে হয় মা। জানি, রাজু বারণ করবে না, কিন্তু সে হুকুম না দিলেও যেতে পারবো না সারদা।

এ কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তর স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বলিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিল না, তথাপি দু'চোখ অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বলো তাঁকে, কাল আসবো পায়ের ধুলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিল না।

## চোদ্দ

তারক আসিয়াছে লইতে। আজ শনিবারের রাত্রিটা সে এখানে থাকিয়া কাল দুপুরের ট্রেনে নতুন-মাকে লইয়া যাত্রা করিবে। সঙ্গে যাইবে জন-দুই দাসী-চাকর এবং সারদা। তাহার হরিণপুরের বাসাটা তারক যথাসম্ভব সুব্যবস্থিত করিয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে নগরের সকল সুবিধা পাইবার নয়, তথাপি আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লেশ না হয়, তাঁহাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় এখানে আসিয়া বিপর্যয় না ঘটে, এদিকে তাহার খর দৃষ্টি ছিল। আসিয়া পর্যন্ত বারে বারে সেই আলোচনাই হইতেছিল। নতুন-মা যতই বলেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বাবা, পাড়াগাঁয়েই জন্মেচি, আমার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তারক ততই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলে, বিশ্বাস করতে মন চায় না মা, যে কষ্ট সাধারণ দশজনের সহ্য হয় আপনারও তা সইবে। ভয় হয়, মুখে কিছুই বলবেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীর ভেঙ্গে যাবে।

ভাঙবে না তারক, ভাঙবে না। আমি ভালোই থাকবো।

তাই হোক মা। কিন্তু দেহ যদি ভাঙে আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না তা বলে রাখচি।

নতুন-মা হাসিয়া বলিলেন, তাই সই। তুমি দেখো, আমি মোটা হয়ে ফিরে আসবো।

তথাপি পল্লীগ্রামের কত ছোট ছোট অসুবিধার কথা তারকের মনে আসে। নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সে যথাসাধ্য ভালোই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু খাওয়াই ত সব নয়। গোটা-দুই জোর আলো চাই, রাত্রে চলাফেরায় উঠানের কোথাও না লেশমাত্র ছায়া পড়িতে পাবে। একটা ভালো ফিলটারের প্রয়োজন, খাবার বাসন-গুলোর কিছু কিছু অদল-বদল আবশ্যক। জানালার পর্দাগুলো কাচাইয়া রাখিয়াছে বটে, তবু নতুন গোটাকয়েক কিনিয়া লওয়া দরকার। নতুন-মা চা খান না সত্য, কিন্তু কোনদিন ইচ্ছা হইতেও পারে। তখন ঐ কষ-লাগা কানা-ভাঙ্গা পাত্রগুলো কি কাজে আসিবে? এক সেট নূতন চাই। আহ্নিকের সাজসজ্জা ত কিনতেই হইবে। ভালো ধূপ পাড়াগাঁয়ে মিলে না—সে ভুলিলে চলিবে না। এমনি কত-কি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে সে বাজারে চলিয়া গেছে, এখনো ফিরে নাই।

বাক্স-বিছানা বাঁধাছাঁদা চলিতেছে, কালকের জন্য ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী সারদা নয়। বিমলবাবু আসিলেন দেখা করিতে। প্রতাহ যেমন আসেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন-বৌ, কতদিন থাকবে সেখানে?

সবিতা বলিল, যতদিন থাকতে বলবে তুমি ততদিন। তার একটি মিনিটও বেশী নয়।

কিন্তু এ কথা কেউ শুনলে যে তার অন্য মানে করবে নতুন-বৌ!

অর্থাৎ নতুন-বৌয়ের নতুন কলঙ্ক রটবে, এই তোমার ভয়,—না? এই বলিয়া সবিতা একটুখানি হাসিল।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, ভয় ত আছেই। কিন্তু আমি সে হতে দেবো কেন?

দেবে না বলেই ত জানি, আর সেই ত আমার ভরসা। এতদিন নিজের খেয়াল আর বুদ্ধি দিয়েই চলে দেখলুম, এবার ভেবেচি তাদের ছুটি দেবো। দিয়ে দেখি কি মেলে, আর কোথা গিয়ে দাঁড়াই।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সবিতা বলিতে লাগিল, তুমি হয়ত ভাবচো হঠাৎ এ বুদ্ধি দিলে কে? কেউ দেয়নি। সেদিন তুমি চলে গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম পথের বাঁকে তোমার গাড়ি হলো অদৃশ্য, চোখের কাজ শেষ হলো, কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে সঙ্গে কতদূর যে গেলো তার ঠিকানা নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম—একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সেদিন পর্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো, হঠাৎ একসময় আমার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, তোমার যৌবন গেছে, রূপ ত আর নেই। তবুও যদি উনি ভালোবেসে থাকেন সে তাঁর মোহ নয়, সে সত্যি। সত্য কখনো বঞ্চনা করে না—তাকে তোমার ভয় নেই। যা নিজে মিথ্যে নয়, সে কিছুতে তোমার মাথায় মিথ্যে অকল্যাণ এনে দেবে না, তাকে বিশ্বাস করো।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমাকে সত্যি ভালোবাসতে পারি, এ তুমি বিশ্বাস করো নতুন-বৌ?

হাঁ করি। নইলে ত তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার ত আর রূপ নেই।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, এমন ত হতে পারে আমার চোখে তোমার রূপের সীমা নেই। অথচ রূপ আমি সংসারে কম দেখিনি নতুন-বৌ।

শুনিয়া সবিতাও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য মানুষ তুমি। এ-ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, তুমি নিজেও কম আশ্চর্য নয় নতুন-বৌ। এই ত সেদিন এমন ক'রে ঠকলে, এতবড় আঘাত পেলে, তবু যে কি করে এত শীঘ্র আমাকে বিশ্বাস করলে আমি তাই শুধু ভাবি।

সবিতা কহিল, আঘাত পেয়েচি সত্যি, কিন্তু ঠকিনি। কুয়াশার আড়ালে একটানা দিনগুলো অবাধে বয়ে যাচ্ছিল এই তোমরা দেখেচো। হয়তো এমনি ই চিরদিন বয়ে যেতো—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীর জীবন যেমন করে কেটে যায় জেলের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ উঠলো ঝড়, কুয়াশা গেল কেটে, জেলের প্রাচীর পড়লো ভেঙেচুরে। বেরিয়ে এলুম অজানা পথের 'পরে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি অপরিচিত বন্ধু, হাত বাড়িয়ে দিলে। এ-কে কি ঠকা বলে? কিন্তু কি বলে তোমাকে ডাকি বলো ত?

আমার নামটা বুঝি বলতে চাও না?

না মুখে বাধে।

বিমলবাবু বলিলেন, ছেলেবেলায় আমার আর একটা নাম ছিল দিদিমার দেওয়া। তার ইতিহাস আছে। কিন্তু সে নামটা যে তোমার মুখে আরো বেশী বাধবে নতুন-বৌ।

কি বলো ত, দেখি যদি মনে ধরে।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, পাড়ায় তারা ডাকতো আমাকে দয়াময় বলে।

সবিতা বলিল, নামের ইতিহাস জানতে চাইনে,—সে আমি বানিয়ে নেবো। ভারী পছন্দ হয়েচে নামটি—এখন থেকে আমিও ডাকবো দয়াময় বলে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই ডেকো। কিন্তু যা জিজ্ঞেসা করেছিলুম সে ত বললে না।

কি জিজ্ঞেসা করেছিলে দয়াময়?

এত শীঘ্র আমাকে ভালোবাসলে কি করে?

সবিতা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ভালোবাসি এ কথা তো বলিনি। বলেচি, তুমি বন্ধু, তোমাকে বিশ্বাস করি। বলেচি, যে ভালোবাসে তার হাত থেকে কখনো অকল্যাণ আসে না।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবিতা কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু, আমার কথা শুনে চুপ করে রইলে যে তুমি? কিছু বললে না ত?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, বলবার কিছুই নেই নতুন বৌ,—তুমি ঠিক কথাই বলেচো। ভালোবাসার ধনকে সত্যিই কেউ আপন হাতে অমঙ্গল এনে দিতে পারে না। তার নিজের দুঃখ যতই হোক না সইতে তাকে হ'বেই।

সবিতা কহিল, কেবল সইতে পারাই ত নয়। তুমি দুঃখ পেলে আমিও পাবো যে।

বিমলবাবু আবার একটু হাসিয়া বলিলেন পাওয়া উচিত নয় নতুন-বৌ। তবু যদি পাও, তখন এই কথা ভেবো যে, অকল্যাণের দুঃখ এর চেয়েও বেশী।

এ কথা কি তোমার পক্ষেও খাটে দয়াময় ?

না, খাটে না। তার কারণ, আমার মনের মধ্যে তুমি কল্যাণের প্রতিমূর্তি, কিন্তু তোমার কাছে আমি তা নয়। হতেও পারিনে। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে, জানি নানা কারণে এমনিই জগৎ। তুমি এলে আমার বিগত দিনের ত্রুটি যেতো ঘুচে, ভবিষ্যৎ হতো উজ্জ্বল, মধুর শান্ত, তার কল্যাণ ব্যাপ্ত হতো নানাদিকে আমাকে করে তুলতো অনেক বড়—

কিন্তু আমি নিজে দাঁড়াবো কোনখানে ?

তুমি নিজে দাঁড়াবে কোনখানে ? বিমলবাবু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সে-ও বুঝতে পারি নতুন-বৌ। তুমি হয়ে যাবে অপরের চোখে ছোট, তারা বলবে তোমাকে লোভী, বলবে—আরও যে-সব কথা তা ভাবতেও আমার লজ্জা করে। অথচ, একান্ত বিশ্বাসে জানি একটি কথাও তার সত্য নয় তার থেকে তুমি অনেক দূরে—অনেক উপরে।

সবিতার চোখ সজল হইয়া আসিল। এমন সময়েও যে লোক মিথ্যা বলিতে পারিল না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দয়াময়, আমি আনবো তোমার জীবনে পরিপূর্ণ কল্যাণ, আর তুমি এনে দেবে আমাকে তেমনি পরিপূর্ণ অবলাণ,—এমন বিপরীত ঘটনা কি ক'রে সত্যি হয় ? কি এর উত্তর ?

বিমলবাবু বলিলেন, এর উত্তর আমার দেবার নয় নতুন-বৌ। আমার কাছে এই আমার বিশ্বাস। তোমার কাছেও এমনি বিশ্বাস যদি কখনো সত্য হয়ে দেখা দেয়, তখনি কেবল মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে, এর উত্তর পাবে,—তার আগে নয়।

সবিতা কহিল, উত্তর যদি কখনো না পাই, সংশয় যদি না ঘোচে, তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস যদি চিরদিন এমনি উলটো মুখেই বয়, তবু তুমি আমার ভার বয়ে বেড়াবে ?

বিমলবাবু বলিলেন, যদি উলটো মুখেই বয়, তবু তোমাকে আমি দোষ দেবো না। তোমার ভার আজ আমার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, আমার আনন্দের সেবা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য যদি কখনো কল্পান্তের বোঝা হয়ে দেখা দেয়, সেদিন তোমার কাছে আমি ছুটি চাইব। আবেদন মঞ্জুর করো, বন্ধুর মতোই বিদায় নিয়ে যাবো—কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র রেখে যাবো না তোমার কাছে এই শপথ করলাম নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে বিমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবছো বলো ত ?

ভাবচি সংসারে এমন ভয়ানক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন ? একের ভালবাসা যেখানে অপরিসীম অপরে তাকে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায় না কেন ?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, খোঁজা সত্যি হলেই তবে পথ চোখে পড়ে, তার আগে নয়। নইলে অন্ধকারে কেবলি হাতড়ে মরতে হয়। সংসারে এ পরীক্ষা আমাকে বহুবার দিতে হয়েচে।

পথের সন্ধান পেয়েছিলে ?

হাঁ প্রার্থনায় যেখানে কপটতা ছিল না, সেখানেই পেয়েছিলাম।

তার মানে ?

মানে এই যে, যে কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, তাকে না মঞ্জুর করার শক্তি কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয় না নতুন-বৌ।

সবিতা কহিল, আমি যাই কেন না চাই দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে ত ছলনা নেই তবে কেন সে আমার কাছে ব্যর্থ হলো ?

বিমলবাবু বলিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বৌ। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় করে পেতে—সে আমি পেয়েচি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা মানি, কিন্তু নিজের যে বিশ্বাসকে আমি আজো দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুব্ধতা-বশে, দুর্বলতা বশে তাকে যদি, ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ—তুমিও না।

সবিতা নীরবে চাহিয়া রহিল। যা অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন যে তাহা সম্ভব হইবে সে ভাবিয়া পাইল না। দয়াময়ের কাছে নীচু হইয়া বুকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কৈ ?

সারদা আসিয়া বলিল, রাখালবাবু এসেছেন মা।

রাজু ? কৈ সে ?

এইত মা আমি, বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল। তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল, পরে বিমলবাবুকে নমস্কার করিয়া, মেঝেয় পাতা গালিচার উপরে গিয়া বসিল।

সবিতা বলিলেন, তারক এসেছে আমাকে নিতে, কাল যাবো আমরা তার হরিণ-পুরের বাড়িতে। শুনেচো রাজু ?

রাখাল কহিল, সারদার মুখে হঠাৎ শুনতে পেয়েছি মা।

হঠাৎ তো নয় বাবা। ওকে যে তোমার মত নিতে বলেছিলুম।

আমার মত কি আপনাকে জানিয়েছে সারদা ?

সবিতা বলিলেন, না। কিন্তু জানি সে তোমার বন্ধু, তার কাছে যেতে তোমার আপত্তি হবে না।

রাখাল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আমার মতামতের প্রয়োজন নেই মা। আমার চেয়েও আপনাদের সে ঢের বড় বন্ধু।

এ কথায় সবিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে রাজু ?

রাখাল কহিল, সমস্ত কথার মানে খুলে বলতে নেই মা, মুখের ভাষায় তার অর্থ বিকৃত হয়ে ওঠে। সে আমি বলবো না, কিন্তু আমার মতামতের 'পরেই যদি আপনাদের যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করে তাহলে যাওয়া আপনাদের হবে না। আমার মত নেই।

সবিতা অবাক হইয়া বলিলেন, সমস্ত স্থির হয়ে গেছে যে রাজু। আমার কথা পেয়ে তারক জিনিসপত্র দোকানে কিনতে গেছে, আমাদের জন্যেই তার পল্লীগ্রামের বাসায় সকল প্রকারের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে—আমাদের যাতে কষ্ট না হয়—এখন না গিয়ে উপায় কি বাবা ?

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, উপায় যে নেই সে আমি জানি। আমার মত

নিয়ে আপনি কর্তব্য স্থির করবেন সে উচিতও নয়, প্রয়োজনও নয়। কাল সারদা বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন ছেলে বড় হলে তার মত নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। আপনার মুখের এ কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো, কিন্তু যে ছেলের শুধু পরের বেগার খেটেই চিরকাল কাটলো, তার বয়েস কখনো বাড়ে না। পরের কাছেও না, মায়ের কাছেও না। আমি আপনার সেই ছেলে নতুন-মা।

সবিতা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন; রাখাল বলিল, মনে দুঃখ করবেন না নতুন-মা, মানুষের অবজ্ঞার নীচে মানুষের ভার বয়ে বেড়ানোই আমার অদৃষ্ট। আপনারা চলে যাবার পরে আমার যদি কিছু করবার থাকে আদেশ করে যান, মায়ের আজ্ঞা আমি কোন ছলেই অবজ্ঞা করবো না।

সারদা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে যেন আর সহিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আপনি অনেকের অনেক কিছুই করেন, কিন্তু এমন করে মাকে খোঁটা দেওয়াও আপনার উচিত নয়।

সবিতা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সারদা বলে বলুক রাজু, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বার হবে না।

রাখাল কহিল, তার মানে আপনি ত সারদা নয় মা। সারদাদের আমি অনেক দেখেচি, ওরা কড়া কথার সুযোগ পেলে ছাড়তো না, তাতে কৃতজ্ঞতার ভারটা ওদের লঘু হয়। ভাবে দেনা-পাওনা শোধ হলো।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, ওকে তুমি বড্ড অবিচার করলে। সংসারে সারদা একটিই আছে, অনেক নেই রাজু।

সারদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারকের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে রাজু?

না মা, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

আমাদের নিয়ে যাবার কথা তোমাকে জানায়নি সে?

কোনদিন না। সারদা বলে, আমার বাসাতে যাবার সে সময় পায় না। কিন্তু আর নয় মা, আমার যাবার সময় হলো, আমি উঠি। এই বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমলবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নাই, এইবার কথা কহিলেন। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবে না নতুন-বৌ? এমনি অপরিচিত হয়েই দুজনে থাকবো?

সবিতা বলিলেন, ও আমার ছেলে এই ওর পরিচয়। কিন্তু তোমার পরিচয় ওর কাছে কি দেবো দয়াময়, আমি নিজেই ত এখনো জানিনে।

যখন জানতে পারবে দেবে?

দেবো। ওর কাছে আমার গোপন কিছুই নেই। আমার সব দোষ-গুণ নিয়েই আমি ওর নতুন-মা।

রাখাল কহিল, ছেলেবেলায় যখনই কেউ আমার আপনার রইলো না, তখন আমাকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, মা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন, তখন থেকে মা বলেই জানি। চিরদিনই মা বলেই জানবো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে আর একবার নতুন মার পায়ের ধুলো লইল।

বিমলবাবু বলিলেন, তারকের ওখানে তোমার নতুন মা যেতে চান কিছুদিনের জন্যে, এখানে ভালো লাগচে না বলে। আমি বলি যাওয়াই ভালো, তোমার সম্মতি আছে?

রাখাল হাসিয়া কহিল, আছে।

সত্যি বলো রাজু। কারণ তোমার অসম্মতিতে ওঁর যাওয়া হবে না। আমি নিষেধ করবো।

আপনার নিষেধ উনি শুনবেন?

অন্ততঃ নিজের কাছে নতুন-বৌ এই প্রতিজ্ঞাই করেছেন। এই বলিয়া বিমলবাবু একটুখানি হাসিলেন।

সবিতা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ এই প্রতিজ্ঞাই করেছি। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করবো না।

শুনিয়া রাখালের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তকালের জন্য রুক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করিয়া সহজ গলায় বলিল, বেশ, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করুন, আমার আপত্তি নেই নতুন-মা। এই বলিয়া সে আর কোন প্রশ্নের পূর্বেই নীচে নামিয়া গেল।

নীচে পথের একধারে দাঁড়াইয়াছিল সারদা। সে সম্মুখে আসিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে যেতে হবে দেবতা।

কেন?

সারদাদের অনেক দেখেচেন বললেন! আপনার কাছে তাদের পরিচয় নেবো।

কি হবে নিয়ে?

মেয়েদের প্রতি আপনার ভয়ানক ঘৃণা। কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা কি দিয়ে শোধ করে আপনার কাছে বসে তার গল্প শুনবো।

রাখাল বলিল, গল্প করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

সারদা বলিল, কাজ আমারও আছে। কিন্তু আমার ঘরে যদি আজ না যান, কাল শুনতে পাবেন সারদারা অনেক ছিল না, সংসারে কেবল একটিই ছিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে রাখাল স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনটির কথা—যেদিন সারদা মরিতে বসিয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, বলুন কি করবেন?

রাখাল কহিল, থাক কাজ। চলো তোমার ঘরে যাই।

## পনের

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন?

সারদা বলিল, যাবার আগে আর একবার আপনার পায়ে ধুলো আমার ঘরে পড়বে বলে।

ধুলো ত পড়লো, এবার উঠি ?

এতই তাড়া ? দুটো কথা বলবারও সময় দেবেন না ?

সে-দুটো কথা ত অনেকবার বলেছো সারদা। তুমি বলবে দেবতা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেচেন, কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল কিনে দিয়েছেন, নতুন-মাকে বলে বাকী বাড়িভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবু যদি যাবার পূর্বে আর একবার বলতে চাও বলে নাও। কিন্তু একটু চটপট করো, আমার বেশী সময় নেই।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন না হোক ভারী মিষ্টি। যতবার শোনা যায় পুরোনো হয় না—ঠিক না দেবতা ?

হাঁ ঠিক। মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শুনোয়, আমি অস্বীকার করিনে। সময় থাকলে বসে বসে শুনতুম। কিন্তু সময় হাতে নেই। এখুনি যেতে হবে।

গিয়ে রাঁধতে হবে ?

হাঁ।

তারপরে খেয়ে শুতে হবে ?

হাঁ।

তারপরে চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় পড়ে সারা রাত ছটফট করতে হবে না দেবতা ?

এ তোমাকে কে বললে ?

কে বললে জানেন ? যে-সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই,—সে-ই।

রাখাল বলিল, তা হলে সে-সারদাও তোমাকে ভুল বলেছে। আমি এমন কোন অপরাধ করিনে যে, দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছটফট করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমোই। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সারদা কহিল, বেশ আর ভাববো না। আপনার কথাই শুনবো, কিন্তু আমিই বা কোন্ অপরাধ করেছি যার জন্যে ঘুমোতে পারিনে—সারারাত জেগে কাটাই ?

সে তুমিই জানো।

আপনি জানেন না ?

না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই।

সময় নেই—না ? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা দেবতা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন ? কেন বলচেন না, সারদা হরিণ-পুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মার ইচ্ছে হয় তিনি যান, কিন্তু তুমি যাবে না। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত ?

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইল না, তাই কতকটা হতবুদ্ধির তোই কহিল, তোমরা স্থির করেচো যাবে, খামকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের ন্যে ?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই ত সবচেয়ে ড় কারণ দেবতা।

না, কেন-একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলে না। তোমাকে নিষেধ করার আমার ধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক খেয়াল, সেই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা রিণপুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, অন্যায় অধিকার আমি কারো, পরেই াটাই নে।

রাগ করে বলছেন না ত ?

না, আমি সত্যিই বলচি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়,— কান-মতেই সত্যিই নয়। আমাকে বারণ করুন দেবতা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি, ামার হরিণপুরে যাওয়া হবে না, দেবতা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না তোমাকে নিষেধ করতে আমি ারবো না। সে অধিকার আমার নেই।

সারদা বলিল, ছিল অধিকার। কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল রের হুকুম মেনে মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস গেছে ুচে, ভরসা গেছে নিজের 'পরে। যে লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই ার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষিণী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন।

এ তুমি কাকে বলচো ? আমাকে ?

হাঁ, আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি মনে রাখবো ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে বারণকরায় আমার াভ কি ? এ যদি বোঝাতে পারো হয়তো এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল, স্বেচ্ছায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে, ই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছে করে না ?

জেনে কি হবে ?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়তো কিছুই হবে না। য়তো আমার সময় এসেছে বোঝবার। তবু একটা কথা বলি দেবতা অকারণে নির্মম তে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়।

রাখাল জবাব দিল, সে আমিও জানি। কিন্তু অকারণে অতি-কোমলতাও ামার প্রকৃতি নয়। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে কহিল দখো সারদা, হাসপাতালে যেদিন তোমার চৈতন্য ফিরে এলো, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে,

সেদিনের কথা মনে পড়ে কিছু ? তুমি ছলনা করে জানলে তুমি অল্পশিক্ষিত সহজ সরল পল্লীগ্রামের মেয়ে, নিঃস্ব ভদ্রঘরের বৌ। বললে, আমি না বাঁচালে তোমার বাঁচার উপায় নেই। তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। সেদিন আমার সাধ্যে যেটুকু ছিল অস্বীকারও করিনি। কিন্তু আজ সে-সব তোমার হাসির জিনিস। তাদের অবহেলায় ফেলে দিলে। আজ এসেচেন বিমলবাবু—ঐশ্বর্যের সীমা নেই যাঁর—এসেচে তারক এসেচেন নতুন মা। সেদিনের কিছুই বাকী নেই আর। এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল বল ত ?

অভিযোগ শুনিয়া সারদা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তার পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার কথায় মিথ্যে কিন্তু ছলনা ছিল না দেবতা। সে মিথ্যেও শুধু মেয়ে-মানুষ বলে। তার লজ্জা ঢাকতে। একেই যখন আমার চরিত্র বলে আপনি ভুল করলেন তখন আর আমি ভিক্ষে চাইবো না। কাল মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন জিনিসপত্র কিনতে। আমার কিন্তু দরকার নেই। যে টাকাগুলো আপনি দিয়েছিলেন সে কি ফিরিয়ে দেবো ?

রাখাল কঠিন হইয়া বলিল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পেলে আমার সুবিধে হয়। আমি বড়লোক নই সারদা, খুবই গরীব সে তুমি জানো।

সারদা বালিশের তলা হইতে রুমাল বাঁধা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, তা হলে এই নিন। কিন্তু টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ হয় এ নির্বোধ আমি নই। তবু বিনা দোষে যে দণ্ড আমাকে দিলেন সে অন্যায় আর একদিন আপনাকে বিঁধবে। কিছুতে পরিত্রাণ পাবেন না বলে দিলুম।

রাখাল কহিল, আর কিছু বলবে ?

না।

তা হলে যাই। রাত হয়েছে।

প্রণাম করিতে গিয়া সারদা হঠাৎ তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার পরে নিজেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললুম।

সারদা বলিল, আসুন।

পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইল না এইমাত্র সে পুরুষের অযোগ্য এ সকল মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করিয়া আসিল সে কিসের জন্য! কিসের জন্য এই সব রাগারাগি ? কি করিয়াছে সারদা ? তাহার অপরাধ নির্দেশ করাও যেমন কঠিন তাহার নিজের জ্বালা যে কোনখানে, অঙ্গুলি সংকেতও তেমনি শক্ত। রাখালের অন্তর আঘাত করিয়া তাহাকে বারে বারে বলিতে লাগিল, সারদা ভদ্র. সারদা বুদ্ধিমতী, সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়ে না। সারদা তাহার কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তাহা বহুবার বহুপ্রকারে জানাইতে বাকী রাখে নাই। পায়ের 'পরে মাথা পাতিয়া আজও জানাইতে সে ত্রুটি করে নাই। আরও একটা কি যেন সে বারংবার আভাসে জানায় হয়তো তাহার অর্থ শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, হয়তো সে আরও গভীর আরও বড়। হয়তো।

ভালোবাসা। রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে দুলিয়া উঠিল। বহুদিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, এ-বস্তু এমনি অভাবিত যে, সে আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, আমি গরীব বলেই তো ভাঙালবৃত্তি নিতে পারিনে। অন্নাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না —এ যে অসম্ভব।

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে। তথায় কে যেন বারবার বলে, বাহিরের ঘটনায় এমনিই বটে, কিন্তু যে অন্তরের পরিচয় সেই প্রথম দিন হইতে সে নিরন্তর পাইয়াছে সে-বিচারের ধারা কি ওই আইনের বই খুলিয়া মিলিবে? যে মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ সেই সরদাকেই আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল ঝি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

ঝি কহিল, না দাদা, ও বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায় সমস্ত যোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিল না। ইতিপূর্বেও এমন কতদিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বল্পাহার রাত্রের ভূরিভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ তাহার কথা শুনিয়া রাখালের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েছো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দশা হবে বল ত? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদা-বাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝির চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই ত। কিন্তু বুড়ো হয়েচি, মরবো না? কতদিন বলেচি তোমাকে, কিন্তু কান দাও না—হেসে উড়িয়ে দাও এবার আর শুনবো না, বিয়ে তোমাকে করতে হবে! দু'দিন বেঁচে থেকে চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবো না দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে সে সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘরবাড়ি নেই, বাপ-মা আপনার লোক নেই, মোটা-মাইনের চাকরি নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস্! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এ-সে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাও না নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে, তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা যে দিলে; কিন্তু বৌ এসে খাবে কি বলো তো? খাবি খাবে নাকি!

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা; গেরস্ত-ঘরে সবাই যা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবে না,—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। শৌখিন মানুষ—ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন-চারটা পাত্রে নানাবিধ তরকারি এবং মাংস। অনেকদিন ধরিয়া এ কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে—বলিতে কিছুই হয় না।

ঠাঁই করিয়া, খাবার পাত্র সাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিব্য দিয়া গেল পেট ভরিয়া খাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি, পড়ে আছে তাহলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল বলিল, তাই হবে নানী, পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবো না।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িল। খাবার তৈরির প্রায় ঘণ্টা দুই দেরি, এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে একখানা বই টানিয়া লইল, কিন্তু কিছুতে মন দিতে পারে না, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে,—ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছু বুঝিতে বাকী নাই। এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার। মনে মনে লজ্জার অবধি রহিল না, ইচ্ছা করিল, আজিকার সমস্ত ঘটনা কোনমতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের যে কাহিনী সারদা আজও কাহাকে বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। সেই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকারণ লাঞ্ছনা। অথচ ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক আমার রান্না—এই রাত্রেই ফিরে গিয়ে আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে সারদা, কিন্তু যে-সব কথা তোমাকে বলে গেছি সে-সব সত্যি নয়, সে একেবারে মিথ্যে।

কুকারের খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরের আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাটীতে পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে।

আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখে পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলে রাজু?

না মা, বাসায় গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসি। কাল ত আর সময় পাওয়া যাবে না।

না, আমরা সকালেই রওনা হবো।

বিমলবাবু বলিলেন, তারক কি ফিরেচে?

সবিতা কহিলেন, না। ছেলেটা কি যে এত আমাদের জন্য কিনচে আমি ভেবে পাইনে।

বিমলবাবু এ কথার জবাব দিলেন। বলিলেন, সে জানে তার অতিথি সামান্য ব্যক্তি নয়। তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত আয়োজন তার করা চাই।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, তাহলে তার উচিত ছিল তোমার কাছে ফর্দ লিখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আমার ফর্দ তার সঙ্গে মিলবে কেন নতুন-বৌ? ও যার যা আলাদা। তবেই মন খুশী হয়।

এ আলোচনায় রাখাল যোগ দিতে পারিল না, হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। খানিক পরে নিজেকে একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সারদাকে ত তার ঘরে দেখলাম না নতুন-মা?

সবিতা বলিলেন, আজ কি তার ঘরে থাকবার জো আছে বাবা। তারক খাবে, বামুনঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে দুপুরবেলা থেকেই এক রকম রাঁধতে লেগেছে। কত কি যে তৈরি করচে তার ঠিকানা নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, সে আমাকেও যে খেতে বলেছে নতুন-বৌ।

তোমারও নেমন্তন্ন নাকি?

হাঁ, তুমি ত কখনো খেতে বললে না, কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

আজ তাই বুঝি বসে আছো এতক্ষণ? আমি বলি বুঝি আমার সঙ্গে কথা কইবার লোভে। বলিয়া সবিতা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

বিমলবাবুও হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেলে খোঁটা দিতে নেই নতুন-বৌ। ভারী পাপ হয়।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইল। এই হাসা-পরিহাসে আর একবার তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা তোমাকে খেতে বলেনি রাজু?

না, মা।

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, তাহলে বুঝি ভুলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই সারদাকে ডাকিতে লাগিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজুকে খেতে বলোনি সারদা ?

না মা বলিনি।

কেন বলোনি ? মনে ছিল না বুঝি ?

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, মনেই ছিল না রাজু, কিন্তু এ ভুলও অন্যায়।

রাখাল কহিল, মনে না-থাকা দুর্ভাগ্য হতে পারে নতুন-মা, কিন্তু তাকে অন্যায় বলা চলে না। সারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে এখন বুঝি আপনাকে রাঁধতে হবে ? বললাম, হাঁ। প্রশ্ন করলেন, তারপর খেতে হবে ? বললাম, হাঁ। কিন্তু এর পরেও আমাকে খেতে বলার কথা ওঁর মনেই এলো না। কিন্তু এটা জেনে রাখবেন নতুন-মা, এ মনে না-থাকা ন্যায় অন্যায়ের অন্তর্গত নয়, চিকিৎসার অন্তর্গত। এই বলিয়া রাখাল নীরসহাস্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সারদা তেমনি নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল মনে মনে বুঝিল অন্যায় হইতেছে, তাহার কথা মিথ্যা না হইয়াও মিথ্যার বেশী দাঁড়াইতেছে, তবু থামিতে পারিল না। বলিল, তারক এখানে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করে না। সারদা বলেন তাঁর সময়াভাব। সত্যি হতেও পারে, তাই সময় করে আমিই দেখা করতে এলাম, খেতে আসিনি নতুন-মা।

একটু থামিয়া বলিল, সারদার হয়তো সন্দেহ আমাকে তারক পছন্দ করে না, আমার সঙ্গে খেতে বসা তার ভালো লাগবে না। দোষ দিতে পারিনে মা, তারক এখানে অতিথি, তার সুখ-সুবিধেই আগে দেখা দরকার।

সারদা তেমনি নির্বাক্। সবিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, তারক অতিথি, কিন্তু তুমি যে আমার ঘরের ছেলে রাজু। আমি অসুবিধে কারো ঘটাতে চাইনে, যার যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু আমার ঘরে আমার কাছে বসে আজ তুমি খাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, না সে হয় না। কহিল, আমার বুড়ো নানী বেঁচে থাক, আমার কুকার অক্ষয় হোক, তার সিদ্ধ রান্নাই আমার অমৃত, বড়ঘরের বড়-রকমের খাওয়ায় আমার লোভ নেই নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, লোভের জন্যে বলিনে রাজু, কিন্তু না খেয়ে আজ যদি তুমি চলে যাও, দুঃখের আমার সীমা থাকবে না। এ তোমাকে বললুম।

অপরাধ ঢের বেশী বাড়িয়া গেল, রাখাল নির্মম হইয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না নতুন মা। মনে হয় এ শুধু কথার কথা, বলতে হয় তাই বলা। কে আমি, যে আমি না খেয়ে গেলে আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না ? কারো জন্যেই আপনার দুঃখবোধ নেই। এই আপনার প্রকৃতি।

দুঃসহ বিস্ময়ে সবিতার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বলো কি রাজু ?

কেউ বলে না বলেই বললাম নতুন-মা। আপনার সৌজন্য, সহৃদয়তা, আপনার বিচার বুদ্ধির তুলনা নেই। আর্তের পরম বন্ধু আপনি, কিন্তু দুঃখীর মা আপনি নয়। দুঃখবোধ শুধু আপনার বাইরের ঐশ্বর্য, অন্তরের ধন নয়। তাই যেমন সহজে গ্রহণ করেন, তেমনি অবহেলায় ত্যাগ করেন। আপনার বাধে না।

বিমলবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, আপনি আমার অনেক করেছেন নতুন-মা, সে আমি চিরদিন মনে রাখবো। কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, দেহ-মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আপনার সঙ্গে আর বোধ করি আমার দেখা হবে না। হয় এ ইচ্ছাও নেই। কিন্তু নিজের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এবার যেন আপনাকে তিনি দয়া করেন—অজানার মধ্যে থেকে জানার মধ্যে এবার যেন তিনি আপনাকে স্থান দেন। শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলাটা ধরিয়া আসিল।

সবিতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কথা শুনিয়া রাগ করিলেন না, বরং গভীর স্নেহের সুরে বলিলেন, তাই হোক রাজু, ভগবান যেন তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। আমার অদৃষ্টে যেন তাই ঘটতে পায়।

চললাম নতুন-মা।

সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, কিছু কি হয়েছে বাবা?

কি হবে নতুন-মা?

এমন কিছু যা তোমাকে আজ এমন চঞ্চল করেছে। তুমি ত নিষ্ঠুর নও - কটু কথা বলা ত তোমার স্বভাব নয়!

প্রত্যুত্তরে রাখাল হেঁট হইয়া শুধু তাঁহার পায়ের ধুলো লইল, আর কিছু বলিল না। চলিতে উদ্যত হইলে বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, বিশেষ পরিচয় নেই দু'জনের, কিন্তু আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।

রাখাল ইহারও জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল। কালকের মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেবতা?

কি চাও তুমি?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হয়তো আপনার কথাই সত্যি।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন বলেই আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

## ষোল

সকালের প্রথম গাড়ীটি অনর্গল ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে পলাশ পুর স্টেশন ছাড়িয়া পরবর্তী স্টেশনের উদ্দেশে আগাইয়া যাইতে লাগিল। এক সময় আবছা অন্ধকারে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলো যন্ত্র-দানবটি। কেবলমাত্র তাহার পিছনের লাল-আলোটিকে গুটিগুটি আগাইয়া যাইতে দেখা গেল। গাড়ী হইতে নামিয়া যাত্রীদের কেহ পায়ে হাঁটিয়া, কেহ বা গরুর গাড়ী করিয়া নিজ নিজ ঠিকানা অনুযায়ী রওনা হইয়া গেলো। ব্রজবাবুর সে উপায় নাই। স্টেশন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পথ পাড়ি দিলে তবেই স্বগ্রামে পৌঁছাইতে পারিবেন। ভোরের আলো দেখা না দেয়া পর্যন্ত রেণুকে লইয়া স্ব-গ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করিতে তাঁহার মন সরিতেছে না। শীতের শেষ রাত্রি। একে অন্ধকার এখনও ভালভাবে কাটে নাই, তাহার উপর অন্ধকারের দোসর জমাট বাঁধা কুয়াশার দাপটও কম নয়। তাই ব্রজবাবুকে অনন্যোপায় হইয়া ভোরের আলোর প্রত্যাশায় থাকিতেই হইবে। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ি হইতে গরুর গাড়ী আসে নাই। আসিবার কথাও ছিল না। তিনি ত আর তাঁহার খুড়তুতো ছোট-ভাই নবীন বাবুকে আগে ভাগে চিঠি দিয়া আসেন নাই। অতএব তাঁহার গাড়ী পাঠাইবার প্রশ্নই ওঠে না।

এক সময় সূর্য-আকাশে রক্তিম ছোপ দেখা দিল। আম-কাঁঠালের গাছের ফাঁক দিয়া থালার মত গোলাকার রক্তবর্ণ লজ্জাতুর সূর্যটি একটু একটু করিয়া উঁকি দিতে লাগিল। প্রকৃতির বুকে শুরু হইল আলো-আঁধারীর খেলা। চারদিক ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া ব্রজবাবু রওনা দিবার উপযুক্ত সময় জ্ঞানে রেণুকে লইয়া স্বগ্রামের উদ্দেশে পা বাড়াইলেন।

রেণু ইতিপূর্বে গ্রাম দেখে নাই। কলিকাতার অন্ধকার গলিতে তাহার জন্ম। বাল্যের ও কৈশোরের দিনগুলি সেইখানেই কাটাইয়াছে। তাই বাংলার গ্রাম্য পরিবেশ দেখার সৌভাগ্য হইতে সে বঞ্চিতই রহিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে তাহার কৌতূহলী চোখের মণি দুইটি পথের দুই ধারের ধানক্ষেত, আখখেত, আম কাঁঠালের বাগান আর ফলন্ত নারিকেল গাছের মাথায় মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজবাবুর বুকের ভিতরও এক অভাবনীয় খুশীর জোয়ার বহিয়া যাইতে লাগিল. দীর্ঘ শহর-জীবন যাপনের পর আবার আবাল্য পরিচিত গ্রামের রাঙামাটির ছোঁয়া পাইয়া যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দে তাঁহার মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে রক্তিম সূর্যটি ক্রমে সোনালি বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশের গা-বাহিয়া অনেকখানি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। পথের অদূরবর্তী হাট খোলা দেখিয়া তিনি অন্তরে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় সাধ হইল ছুটিয়া যাইয়া একটিবার হাটটি ঘুরিয়া আসেন। জীবনের কত সকাল, কত দুপুরই তিনি এই হাট-খোলায় কাটাইয়াছেন লেখাযোখা নাই। দেখিলেন, চাষীরা আনাজ প্রভৃতি লইয়া হাটে যাইতেছে। আবেগ-উচ্ছ্বাস দমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। পথ

চলিতে চলিতেই হাটগামী চাষীদিগের নিকট হইতে জানিয়া লইলেন, এই বছর আমাদের উৎপাদন কেমন হইয়াছে, আলুর ফলন কেমন ? সোনামুগের বর্তমান বাজার দর কত ? এককথায় গাম্য-জীবনের সেই পুরাতন অভ্যাসগুলি তাঁহার মনের গোপন কন্দর হইতে বার বার উঁকি মারিতে লাগিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বহু শৈশব ও কৈশোর স্মৃতি তাঁহার মানসপটে একে একে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গেলেন তিনি। এই মুহূর্তে রেণু ও কাঁধের পুটুলিটি তাঁহার ইচ্ছা-পূরণের বড় অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঝাড়া হাত-পা থাকিলে কিছুক্ষণ অন্ততঃ দীঘির পাড়ের তালগাছের ছায়ায় বসিয়া স্মৃতি মন্থন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভে প্রয়াসী হইতেন। তাঁহার বক্ষ নিঙড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া সকালের নির্মল বাতাসকে বিষাদময় করিয়া তুলিল।

ব্রজবাবু এক সময় তাঁহার একমাত্র মেয়ের হাত ধরিয়া নিজ গ্রামের নিকটবর্তী বুড়া শিব তলায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, রেণু মুখ ফুটিয়া না বলিলেও পথশ্রমে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। যদিও আর মাত্র মাইল খানেক পথ পাড়ি দিতে পারিলেই স্বগ্রামে পৌঁছাইতে পারিবেন। তথাপি কিছুক্ষণ বিশ্রামের মাধ্যমে ক্লান্তি অপনোকনের উদ্দেশে কাঁধের পুটুলিটি বটগাছের ছায়ায় নামাইয়া বলিলেন, এখানে বসে একটু জিরিয়ে নাও মা। অনভ্যাসের ফলেই পথশ্রম একটু বেশীই মনে হচ্ছে। নাও, বসে একটু জিরিয়ে নাও। গ্রামের মানুষের কাছে দু'-তিন ক্রোশ পথ পায়ে-হেঁটে পাড়ি দেয়া কোনই সমস্যাই না। তুমি জিরিয়ে নাও—আমি ঐদিকটা একটু ঘুরে দেখে আসি ধানের ফলন কেমন হ'ল। এইবার অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ঐ সে ক্ষেতগুলো দেখতে পাচ্ছ, সবই আমাদের। তোমার নবীনকাকা দেখাশোনা করে।

রেণু বিস্ময়ভরা চোখে অদূরবর্তী সোনালি ধানের ক্ষেতগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিল, তাই নাকি বাবা ! এ-গুলো সবই আমাদের জমি। কেমন সুন্দর ধান হয়েছে, তাই না ? মনে হচ্ছে, কে যেন মাঠময় সোনা ছড়িয়ে রেখেছে।

ব্রজবাবু স্মিত হাস্যে বলিলেন, দেশে এসেছ, এখানেই তো থাকবে মা। সবে এলে, দু'-একদিন বিশ্রাম করে নাও। তারপর আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখাব।

অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যাসুন্দর বাচস্পতি মহাশয় তখন সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। আচমকা ব্রজবাবুকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সমাজে তাঁহার আর একটি বিশেষ পরিচয় রহিয়াছে। সমাজপতি চার পাঁচখানি গ্রাম ছাড়িয়া তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি। গ্রামের একান্তে তাঁহার বসতবাড়ি। বাড়িতেই একটি টোল আছে তাঁহার। উত্তরাধিকার সূত্রে টোলটির মালিকানা ও কর্তৃত্ব তাঁহার উপর বর্তাইয়াছে। ঠিক তেমনি সমাজপতির পদটিও উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি লাভ করিয়াছেন, মনে করা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার পিতা আমৃত্যু এই পদে সগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী

বিদ্যাসুন্দর বাচস্পতি মহাশয় পিতার সেই গৌরব সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই বয়সেও তাঁহার ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।

বিদ্যাসুন্দর বাচস্পতি মহাশয় পার্শ্ববর্তী গ্রামে শুভ উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে চলিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বেও পার্শ্ববর্তী চার-পাঁচ খানি গ্রামের যাবতীয় যজন-যাজনের কার্য তিনিই সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু ইদানিং নিষ্ঠুর বার্ধক্য জনিত কারণে তাহা আর সম্ভব হইতেছে না। সাধ থাকিলেও সাধ্যে কুলাইতেছে না বলিয়া তাঁহার আক্ষেপও কম নহে। শারীরিক ক্ষমতার সহিত অর্থাগমেও ভাঁটা পড়িয়াছে। কিন্তু নিকটে যদি কোন যজন যাজনের ডাক পড়ে, আর প্রাপ্তির সম্ভাবনা যদি আশানুরূপ হয় তবেই তিনি বৌলওয়ালা খড়ম জোড়া পায়ে গলাইয়া, তালিদেয়া ছাতাটি বোগলে লইয়া যজমান বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াইয়া থাকেন। যাহাই হউক, ব্রজবাবুকে বুড়া শিবতলায় দেখিয়া বাচস্পতি মহাশয় অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ব্যাপারটি তাঁহার নিকট একেবারেই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্যও বটে। পুরু কাচের চাঁদির চশমাটি উঁচু করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, কে হে, ব্রজ না? জ্যাঠামশাই ব্রজবাবু ব্যস্ত পায়ে আগাইয়া যাইয়া বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। কথা বলিতে বলিতে তিনি বাচস্পতি মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। এইবার মেয়েকে বলিলেন, রেণু, দাদুকে প্রণাম কর।

রেণু উঁকিয়া প্রণাম করিতে গেলে বাচস্পতি মহাশয় যন্ত্রচালিতের মত অকস্মাৎ দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন, থাক, থাক, প্রণামের আর দরকার নেই। কি হে ব্রজ এ কি তোমার সেই মেয়েটি নাকি হে?

ব্রজবাবু তাঁহার ইঙ্গিত টুকু বুঝিতে না পারিয়া পূর্বের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই স্মিতহাস্যে বলিলেন, সেই মেয়ে বলতে কি বুঝাতে চাইছেন জ্যাঠামশাই? আমার ও একই মেয়ে। এ-ই সেই রেণু।

বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের মুখে অকস্মাৎ কেমন বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিল। অনেক কষ্টে মনের ভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন, ব্রজ, এরইতো আশীর্বাদ গায়ে-হলুদ হয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় নাই, তাই না।

ব্রজবাবুর বুকের ভিতর কে যেন অকস্মাৎ হাতুড়ির আঘাত হানিল। চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই। বরাতগুনে মেয়েটির জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

ফ্যাকাশে মুখে বাচস্পতি মহাশয় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রেণুর দিকে এক পলক চাহিয়াই প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করিলেন, ও।

বাচস্পতি মহাশয় আর মুহূর্তমাত্র না দাঁড়াইয়া খড়মে গম্ভীর খটাস্-খটাস্ শব্দ করিয়া গন্তব্য স্থলের উদ্দেশে হাঁটিতে লাগিলেন।

ব্রজবাবু বাচস্পতি মহাশয়ের মনের কথা বুঝিতে না পারিলেও তিনি যে রেণুকে দেখিয়া প্রীত হন নাই এইটুকু অন্তত অনুমান করিতে পারিলেন।

ব্রজবাবু রেণুকে লইয়া নিজের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। উঠানে পা দিয়া সামনেই দুইটি শিশুকে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের একটির বয়স বছর আটেক,

আর দ্বিতীয়টির বয়স ছয়ের কাছাকাছি। ব্রজবাবু ও রেণুকে হঠাৎ দেখিয়া শিশু দুইটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া আগন্তুক দুইজনের দিকে তাকাইয়া রইল। বড় ছেলেটি তাঁহাদের চিনিতে না পারিয়া এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর হইতে তাহাদের বাবাকে ডাকিয়া আনিল। অবনীবাবু ভিতর-বাড়িতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ছেলের ডাকে ব্যস্ত-পায়ে বাহিরে আসিয়া ব্রজবাবুকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন। মুহূর্তে বিস্ময়ের ভাবটুকু কাটাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্রজবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মেজদা, আপনি হঠাৎ এমনভাবে আসিলেন যে? আগে চিঠি দিয়ে এলে আমি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকতে পারতুম।

ব্রজবাবু বলিলেন, চিঠি দিয়ে আসার সময় পাইনি ভাই।

অবনীবাবু তাঁহার হাত হইতে পুটুলিটি লইয়া ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন, তোমাদের জ্যাঠু, প্রণাম কর।,

শিশুরা যে-যেইখানে ছিল ব্যস্ত-পায়ে ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আগন্তুক ব্রজবাবুর দিকে পরমুহূর্তে রেণুর মুখের দিকে এক পলক তাকাইয়া উভয়কে প্রণাম করিল। রেণুর অবনীবাবুকে সভক্তি প্রণাম করিল।

অবনীবাবু বলিলেন, চলুন মেজদা, ভেতরে চলুন। তিনি আহ্লাদিত হইয়া ব্রজবাবু ও রেণুকে ভিতর-বাড়িতে লইয়া গেলেন।

ব্রজবাবু স্নান সারিয়া ফলাহার করিতে করিতে অবনীবাবুকে বলিলেন, বয়স হয়েছে, কলকাতার সঙ্গে এখন আর নিজেকে খাপ খাইয়ে চালাতে পারছি না অবনী। তাই ভাবছি, জীবনের শেষ দিন ক'টা বাড়িতেই কাটাব।

ব্রজবাবুর বাড়িতে আগমনের উদ্দেশ্য পাকাপাকি জানিতে পারিয়া অবনীবাবুর মুখ অকস্মাৎ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কোন অদৃশ্য হাত যেন তাঁহার মুখে কালি ছিঁটাইয়া দিয়াছে। এতদিন স্ত্রী-পুত্র কন্যা লইয়া সম্পূর্ণ বাড়ি ও জোতজমি নির্বিবাদে ভোগদখল করিতে ছিলেন। স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেন নাই তাঁহার মেজদা কোনদিন এই বাড়ি ও সম্পত্তির উপর হাত বাড়াইতে পারেন। কিন্তু আজ এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইল। ব্রজবাবুর কথার কি উত্তর দিবেন তিনি সহসা গুছাইয়া উঠিতে পারিলেন না।

খুড়তুতো ছোট-ভাই অবনীবাবুকে নীরব দেখিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, কি হে অবনী, চুপ করে-রইলে যে? হঠাৎ করে এসে তোমাদের আবার বিপদে ফেল্লুম না তো?

অবনীবাবু জোর করিয়া মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ কী বলছেন মেজদা! নিজের বাড়িতে এসেছেন, থাকবেন, এতে আর অসুবিধে কি থাকতে পারে!

ঠিকই অসুবিধের আর কি থাকতে পারে। দ'ভাই এক জায়গায় থাকলে বল ভরসাও তো কম নয়।

তবে কথা হচ্ছে—

কি হে? কিসের কথা বলচো ভাই? কি কথা?

বলছি, দীর্ঘদিন কলকাতার জাঁকজমকের মধ্যে কাটিয়ে এলেন, কত জৌলুষ, ক'

কর্মব্যস্ততা। হঠাৎ করে গ্রামের গতিহীন জীবনের সঙ্গে আবার নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন কিনা ভাবছি।

জীবনের বড় অংশ তো গ্রামেই কাটিয়েছি। কলকাতার হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বাস করলেও আমার মন কিন্তু প্রতিনিয়ত এ-গ্রামের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে ভাই অবনী। কথা বলিতে বলিতে ব্রজবাবু খাদ্য নিঃশেষিত হাতের কাঁসার জামবাটিটি মেঝেতে নামাইয়া রাখিলেন।

অবনীবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—আপনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু রেণুর কথাও তো ভুলে গেলে চলবে না মেজদা। জন্ম তার কলকাতা শহরে। এতখানি বয়স হ'ল, কলকাতা ছেড়ে গ্রামের মুখ কোনদিন দেখেনি। জলের মাছকে হঠাৎ করে ডাঙায় তুল্‌লে যেমন দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, মেয়েটির অবস্থা আবার—

কিছু হবে না ভাই। মানুষ তো পরিস্থিতির দাস। দেখবে, রেণু দু'দিনেই এখানকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

তবে তো আর কথাই নেই মেজদা।

আলোচনা আর অধিক অগ্রসর হইল না। অবনীবাবুর বড়ছেলে হুকা আনিয়া ব্রজবাবুর হাতে তুলিয়া দিলো।

অবনীবাবু বলিলেন, মেজদা, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি বরং পশ্চিম পাড়ার ক্ষেত থেকে একবারটি ঘুরে আসি। শুনলুম, ধান পেকে গেছে, কাটার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্রজবাবু হুঁকো-হাতে চৌকিতে গিয়া বসিলেন।

অবনীবাবু পাশের ঘরে যাইয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাহার স্ত্রী কুমুদিনী রান্না-ঘর হইতে আসিয়া ঘরের দরজার পাল্লা হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখের তারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটি ভাঁজ ফেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, কোথাও বেরচ্ছো নাকি?

অবনীবাবু ফতুয়ার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে অন্যমনস্কভাবে স্ত্রীর কথার উত্তর দিলেন, হাঁ, একবারটি পশ্চিম পাড়ার ক্ষেত থেকে ঘুরে আসব, ভাবচি। বোধ হয় ধান পেকে গেছে, কাটার ব্যবস্থা করা দরকার।

কিন্তু এদিকের খবর কি? জিজ্ঞেস করেচ? কথাবার্তা কিছু হলো?

অবনীবাবু অকস্মাৎ হোঁচট খাওয়ার মত চমকাইয়া মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইলেন।

কুমুদিনী এইবার মুখ ফুটিয়া মনের কথা সরাসরি প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না। চোখে-মুখে পূর্বের বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তার ছাপটুকু অক্ষুন্ন রাখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, মেজভাশুর কি কন্যারত্নটিকে নিয়ে এখানেই বসবাসের চিন্তা করছেন, নাকি দু'-চার-দিনের জন্য—

এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা করে এসেছেন।

একি তোমার অনুমান, নাকি কথাটি ওনার কাছে পেড়েছিলে?

হাঁ, আমি সরাসরি তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে চেয়েছিলুম।

তারপর ?

তারপর আবার কি ? বাড়ির লোক বাড়িতে ফিরে এসেছেন, বসবাস করবেন, খুবই স্বাভাবিক কথা।

সবই বুঝলুম। কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের কথা, ছেলে-মেয়েদের কথা একবারটি ভেবে দেখেচ ?

তোমার কথা সবই বুঝেচি। আমিও সে ব্যাপারটি নিয়ে মোটেই ভাবনা-চিন্তা যে করি নি, তাও নয়। কিন্তু যা স্বাভাবিক তাকে অনিচ্ছায় হলেও মেনে নেয়া ছাড়া গত্যান্তরও তো কিছু দেখছি নে।

তোমার কথায় ও কাজে সেরকম কোন লক্ষণই কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না। যাঁর মাথার ওপর এত বড় একটা বিপদ তিনি কিনা মাঠে যাচ্ছেন, ধান কাটার চিন্তা করছেন। মাথার লাঠি আগে হাত দিয়ে ঠেকাও। তাতে দু-দশ টাকার ধান যদি ঝরে পড়ে সে-ক্ষতি তবু সইতে পারবে। কিন্তু এ-সুযোগ—

অবনীবাবু আগ্রহান্বিত হইয়া স্ত্রীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, সুযোগ ? কিসের সুযোগের কথা বলচো ? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছো, খুলে বলবে কি ?

কুমুদিনী মুখ ঝাঁড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি সংসার করচো নিজের ভাল-মন্দের দিকটা কি কোনদিনই তোমার মাথায় আসবে না ! আমি না থাকলে তুমি কবেই উঠোনে কুয়ো খুঁড়তে।

ভনিতা রেখে কি বলতে চাইছো খোলসা করে বল। নইলে আমি মাঠে চল্লুম। বকবক করে নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় আমার নেই। অবনীবাবু বেশ রাগত স্বরেই কথাটি স্ত্রীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

কুমুদিনী পূর্বের ন্যায় ঠাণ্ডা মাথায় বেশ গুছাইয়া বলিতে লাগিলেন—দেখো মেজদি কেচ্ছা কেলেঙ্কারী করে রমনীবাবুর হাত ধরে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বংশের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিয়ে গেলেন। ব্যাপারটি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল ! কত সমালোচনা, ঘন ঘন বৈঠক—সবই ভুলে খেলে নাকি !

মেজবৌ সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, ভুলেও তো আর এমুখো হন নি। ওর কপাল নিয়ে চলে গেছেন। আমাদের তো শাপে বরই হলো।

কুমুদিনী ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কেন ? মেজ-বৌঠানের জন্য প্রাণ কাঁদছে নাকি ? যাওনা, হাতে-পায়ে ধরে ওনাকেও নিয়ে এসে ষোল কলা পূর্ণ করলেই ত হয়, রাধা কোথায় ?

অবনীবাবু উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বুঝেছি, তুমি কিছুতেই হেঁয়ালি ছেড়ে সাজা কথার ধারে কাছে দিয়েও যাবে না। যত খুশী বকবক করতে থাক, আমি চল্লুম।

কুমুদিনী বলিলেন, দেখো, আমার পরিষ্কার কথা শুনে নাও, মেজ-ভাশুরের মেয়েকে নিয়ে এখানে থাকা চলবে না।

থাকা চলবে না ?

না। কিছুতেই সম্ভব নয়। ধুমসি মেয়েটার আশীর্বাদ গায়ে-হলুদ সবই হয়ে গিয়েছিল, শোন নি, আমাদেরও ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করতে হবে। মেয়ে বিয়ে দিতে হবে, ছেলে বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনতে হবে।

অবনীবাবু ফ্যাকাশে মুখে নীরব চাহনি মেলিয়া ক্রোধোন্মত্তা স্ত্রীর মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

কুমুদিনী বলিয়া চলিলেন, তুমি কি ভেবেছ, এরপর এ মেয়েকে নিয়ে ঘর করলে কেউ তোমার মেয়ে নিয়ে যেতে পক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে দুয়ারে এসে হাজির হবে? নাকি তোমার ঘরে মেয়ে বিয়ে দেবার জন্য চৌকাঠে মাথা ঠুকবে? তাই বলছি কি, এই পাপ কি করে মানে মানে বিদেয় করবে ভেবে দেখো। শুধু কি তা ই? বেশ তো বাড়ি, জমি-জায়গা বাগান, পুকুর একা ভোগ করছো। এবার মেজ ভাশুর ভাগ বসালে তোমার ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ বলতে কি আর থাকবে? শেষ বয়সে বুড়ো-বুড়ি ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে নাকি?

সমস্যা আছে খুবই জানি। কিন্তু সমাধানের পথ কিছু বলতে পার?

সব দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা কোরো না। এইটি পুরুষ মানুষের কাজ নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনা চিন্তা করে যা হোক একটা উপযুক্ত বিহিত বের কর। এমন কিছু করো, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। মেজ-ভাশুর অন্ততঃ আমাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না, এমন কিছু একটা উপায় খুঁজে বের কর।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া অবনীবাবু বলিলেন, সবই তো বুঝলুম। কি করে যে উভয়কূল রক্ষা হয় ভেবে দেখতে হবে। কথা বলিতে বলিতে তিনি মাঠের উদ্দেশে পা বাড়াইলেন। পথ চলিতে চলিতে তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। বস্তুত তিনি উভয় সংকটে পড়িলেন। ব্রজবাবুর প্রতি অবিচার করিলে চরম অধার্মিকের কাজ হইবে। কারণ বাড়ি-ঘর জমি-জায়গা যাহা কিছু প্রায় সবই এক সময় ব্রজবাবু নিজ হাতে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। ইহার জন্য তিনি অকাতরে বহু শ্রম দান করিয়াছিলেন। বহু ঘাম ঝড়াইয়াছিলেন, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কন্টোপাজি বহু অর্থব্যয়ে পৈত্রিক আমলের জীর্ণ বাড়িটার সংস্কার করিয়া বসবাসের উপযোগী করি তুলিয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও দুইটি নূতন কোটা-ঘর তৈয়ারী করিয়া ঘরের অভাব দ করেন। চাষের জমির পরিমাণও একমাত্র নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সম্বল করিয়া অন্ত দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। দীর্ঘদিন এইসব ভোগ করা তাঁহ অদৃষ্টে কুলাইলো না। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সবিতা দেবী এমন এক কুক করিয়া বসিলেন যাহা কাহারো কাছে মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। দারুণ প্রভাব পতিপত্তিশালী ব্রজবাবু লজ্জায়-ঘৃণায়-অপমানে মাটির সহিত মিশিয়া গেলেন। সবি রমণীবাবুর হাত ধরিয়া গৃহত্যাগ করিবার পর মাত্র মাস দুই-তিন ব্রজবাবু কোনরক এই বাড়িতে মৃতপ্রায় অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। তাহার পরই তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া

কাটাইয়া দিয়াছেন। সেই হইতে অবনীবাবুই সম্পূর্ণ বাড়ি ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া নির্বিবাদে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ব্রজবাবু কোনদিন আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিবেন, সম্পত্তির অংশ দাবী করিবেন ইহা তাঁহার নিকট বাস্তবিকই অকল্পনীয়, ভাবনার অতীত। সেই অসম্ভবই আজ বাস্তবে পরিণত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া অবনীবাবুর পক্ষে ব্রজবাবুকে তাঁহারই নিজহাতে গড়িয়া তোলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা কি করিয়া সম্ভব। বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া এমন একটি অধার্মিক ও অকৃতজ্ঞতা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আবার তাঁহাকে প্রশ্রয় দিলে দুইদিক দিয়া সমস্যার মুখোমুখি হইতে হইবে। প্রথমতঃ তাঁহার পুত্র কন্যার ভাগ্যে সম্পত্তির পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ নিজের বোকামি ও ভালমানুষির জন্য আমৃত্যু স্ত্রীর বাক্যবানে জর্জরিত হইতে হইবে, এই ভয়ও তাঁহার বুকের মধ্যে শিকড় গাঁথিয়া পাকা হইয়া বসিতে লাগিল।

অস্থিরচিত্ত অবনীবাবুর পক্ষে বেশীক্ষণ মাঠে থাকা সম্ভব হইল না। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, ব্রজবাবু স্নান-আহ্নিক সারিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছেন। ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনী যদিও তাঁহাকে আহারাদি সারিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজবাবু কিছুতেই সম্মত হন নাই। দীর্ঘদিন পর দুইভাই মিলিত হইয়াছেন। উভয়ে একত্রে বসিয়া আহার করিবেন, সেই আশাতেই অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বাড়ি ফিরিয়া অবনীবাবু আর সময় নষ্ট না করিয়া তেল মাখিয়া, গামছা কাধে সোজা ঘাটে চলিয়া গেলেন। কোনরকমে দুই-তিনটি ডুব দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

খাইতে বসিয়া অবনীবাবু সর্বক্ষণ প্রায় মৌনব্রত ধারণ করিয়াই রহিলেন।

এই বছর ধানের ফলন কেমন হইয়াছে, পুকুরে মাছ ছাড়িয়াছে কিনা, গত মরশুমে রবি-শস্য কেমন হইয়াছিল, এমন বহু বিচিত্রন্ন প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। অবনীবাবু সাধ্যমত সংক্ষেপে তাঁহার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

আহারাদির পর ব্রজবাবু পশ্চিম দিকের বারান্দায় গিয়া হুকা লইয়া খেজুরপাতার পাটিতে বসিলেন। বারান্দার এককোণে এক চিলতে রৌদ্র আসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে। ব্রজবাবু রৌদ্রের টুকরাটুকু পিঠে ধারণ করিয়া পরম তৃপ্তিতে তামাক সেবন করিতে লাগিলেন।

এইদিকে অবনীবাবু নিজের ঘরে আসিয়া একটি তেলচিটা পড়া কম্বল গায়ে চাপাইয়া দিবানিদ্রার চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। ইহা তাঁহার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে একটু গড়াগড়ি না দিলে বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন। সবেমাত্র একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছে। ঠিক তখনই স্ত্রী কুমুদিনী পান চিবাইতে চিবাইতে তাঁহার শয্যার পাশে বসিলেন। ছোট্ট করিয়া উচ্চারণ করিলেন, কি গো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

স্ত্রীর ডাকে অবনীবাবুর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া শুইলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কি ? কিছু বলবে ?

হাঁ, বলবো নিশ্চয়ই।

—কি হয়েছে ? যা বলবার বলেই ফেল।

—কিছু চিন্তা করলে? নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়লে। কি করবে, ভেবেছ কিছু?

মেজদার কথা ত?

হাঁ, তোমার পূজনীয় দাদাটির কথাই বলছি। কি করে আপদ বিদেয় করবে পথ খুঁজে পেলে কিছু?

এমন করে বলতে নেই। আমার দাদা। তোমারও ত গুরুজন, প্রণম্য ব্যক্তি।

কুমুদিনী হাত নাড়িয়া রীতিমত খেঁকাইয়া উঠিলেন, গুরুজন। প্রণম্য ব্যক্তি। এমন ঢেরের গুরুজন দেখেছি। তোমার দাদা, তোমার প্রণম্য, তুমি মাথায় তুলে নাচ গে। আমার দ্বারা ওসব ন্যাকামি হবে না, বলে দিচ্ছি। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে!

শোন, গুরুজনের নামে এসব বলে নরকে যাবার পথ পরিষ্কার কোরো না।

তুমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, পাপ-পুণ্য নিয়ে থাকগে। আমার দ্বারা— অবণী তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, শোন, শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সমূহ বিপদ, কি করে হাসিল হতে পারে, যুক্তি-বুদ্ধি কিছু থাকলে বল?

ব্যাপারটি খুব সহজেই সমাধা করা যেতে পারে, অবশ্য যদি আমার বুদ্ধিমত কাজ কর।

অবণীবাবু যেন হতাশার জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে একটু আশার আলো দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীর ওপর তাহার এমনিতেই যথেষ্ট আস্থা রহিয়াছে। বিবাহের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহুবারই তাঁহার পাকা বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছেন।

এই কারণেই প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নামের সহিত বহুল প্রচলিত একটি বিশেষণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার তেমন আক্ষেপ নাই। স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া যদি বাস্তবিকই বৈষয়িক ব্যাপারে লাভবান হওয়া যায় তবে এই রকম অপবাদ তিনি হাজারবার শুনিতে প্রস্তুত। আজও এই আকস্মিক উদ্ভূত সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান তাঁহার দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন।

স্ত্রীর মুখ হইতে সমস্যা সমাধানের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র অবণীবাবু ব্যস্ত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। অত্যুগ্র আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, শোন, রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরেই রক্ষিত ছিল, আশাকরি অজানা নয়।

অবণীবাবু চোখ দুইটি কপালে তুলিয়া বলিলেন, ঠিক বুঝলুম না। একটু খোলসা করে বল।

আঃ মরণ! তোমাকে নিয়ে কি করে যে বিশটা বছর আমি ঘর করলুম, নিজেই ভেবে অবাক হচ্ছি।

অবণীবাবু নীরব চাহনি মেলিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, রেণুকে দিয়েই মেজো-ভাশুরকে কাবু করতে হবে। তার য়ের সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে তো?

হাঁ, তা ত হয়েই ছিল।

শুধুমাত্র পাকা-কথাই নয়, আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ সবই হয়ে গিয়েছিল।

হাঁ, খুবই সত্য কথা। এত কিছু সত্বেও মেয়েটার বিয়ে হলো না। মেয়েটার কপাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অবণীবাবু বলিলেন।

কুমুদিনী কপাল চাপড়াইয়া রীতিমত হায় হায় করিয়া উঠিলেন, আমি ভাবছি কি রে ঘাড় থেকে আপদ নামানো যায়, আর তিনি কিনা তারই দুঃখে কাঁদতে বসলেন! ান, এসব ন্যাকামি রাখ! মাথার ওপরে যাঁর খাঁড়া ঝুলছে, তাঁর নাকিকান্না মানায়

এখনি সমাজপতি বাচস্পতি মশাইয়ের সঙ্গে দেখা কর। গোপনে সব কথা তাঁকে

যে-মেয়ের আশীর্বাদ গায়ে-হলুদ প্রভৃতি হওয়ার পরও বিয়ে হয় না সমাজের খে তারা অপাঙক্তেয়।

অবণীবাবু স্ত্রীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, অবশ্যই অপাঙক্তেয়। সমাজ ছুতেই তাকে ঠাঁই দেবে না।

তবে? বাচস্পতি মশাইকে ব্যাপারটি জানিয়ে এসো গে। আর বিশেষ করে নুরোধ করবে, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যেন এর উপযুক্ত বিহিত করেন।

চমৎকার বুদ্ধি!

তবে ওনাকে এ-ও অনুরোধ করবে, তুমি যে এ-ব্যাপারে আগ্রহী। অর্থাৎ তুমি আগ বাড়িয়ে ওঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করতে গেছ, বিধানের জন্য অনুরোধ করেছ য়া করে কথাটা যেন গোপন রাখেন। এতে কার্যতঃ ফল হবে, সাপও মরবে, লাঠিও াঙবে না। তোমার পূজনীয় মেজদা অন্ততঃ তোমার ওপর বিরূপ ধারণা করবেন না।

স্ত্রী পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে অবণীবাবু বিবেকের দংশনে মর্মাহত হইলেও জের স্বার্থ ও পুত্র কন্যার ভবিষ্যতের চিন্তাকে গুরুত্ব না দিয়া পারিলেন না। ার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি দড়ি হইতে ফতুয়াটি কাঁধে লইলেন। এইবার জবাবুর অজ্ঞাতে চুপি চুপি বাচস্পতি মহাশয়ের দুয়ারে হাজির হইলেন।

বাচস্পতি মহাশয় যজমান বাড়ি হইতে যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মাত্র কিছুক্ষণ গই বাড়ি ফিরিয়াছেন। শীতের বেলার সহিত দৌড়াইয়া পারা যায় না। একে াকর্ম সারিতে সারিতে সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলো। তাহার স্বপাক আহার সারিতে বৈকাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলো। বাড়ি ফিরিতে প্রায় া হইয়া যায়। দাওয়ায় জলচৌকি পাতিয়া সবে আয়াশ করিয়া একটু তামাক ান আরম্ভ করিয়াছেন। ঠিক তখনই অবণীবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। আভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সভক্তি প্রণাম সারিয়া করজোড়ে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিতে বেন। তাঁহাকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়াই সমাজপতি রীতিমত গর্জন করিয়া লেন, তোমাদের ব্যাপার কি হে অবণী!

অবণীবাবু শুষ্ক কণ্ঠে কোনরকমে উচ্চারণ করিলেন, আজ্ঞে জ্যাঠামশাই—

তাঁহাকে মাঝ-পথে থামাইয়া দিয়া সমাজপতি বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, দেখ অবণী, তোমাকে আমি একটু অধিক স্নেহ করি মিথ্যে নয়।

আজ্ঞে জ্যাঠামশাই, আমি তা হাজারবার স্বীকার করি। তোমরা যদি আমার সে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের বুকে যা খুশী করে অব্যহতি পাবে ভেবে থাক, খুব ভুল করবে।

অবণীবাবু অপরাধীর দৃষ্টিতে মাথা নীচু করিয়া সমাজপতির সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সমাজপতি বাচস্পতি মহাশয় কণ্ঠস্বরের কর্কশতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিতে লাগিলেন, তোমার মেজদা ব্রজ—আমি দাদার কথাই বলতে এসেছি জ্যাঠামশাই।

মেজদার কথা বলতে এসেছ? তার হয়ে উমেদারী করতে এসেছ অবণী? শোন সমাজের বুকে এতবড় অনাচার আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না, এ তোমাকে পরিষ্কার বলে রাখছি।

অবনীবাবু হাতকচলাইয়া অধিকতর ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, জ্যাঠামশা আমার মনের কথা, আপনার কাছে শরণাপন্ন হওয়ার কারণ হয়ত ঠিক বুঝাতে পারছি ন আপনি যদি দয়া করে আমার কথা ধৈর্য ধরে শোনেন বড়ই বাধিত হবো।

অবনীবাবু এইবার বাচস্পতির কাছে তাঁহার আগমনের হেতু এক এক করিয়া নিবে করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন, সমাজের অনুশাসন অমান্য কি ব্রজবাবুকে বাড়িতে ঠাঁই দিবার এতটুকুও উৎসাহও তাঁহার নাই। বরং তাঁহাকে বিতা করিয়া স্ত্রী-পুত্র কন্যার ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ লই সমাজপতির শরণাপন্ন হইয়াছেন। সব শেষে এই অনুরোধ করিতেও ভুলিলেন না, যি যে সমাজপতির নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, কথাটি যেন ব্রজবা কাছে গোপন থাকে।

বাচস্পতি মহাশয় অবনীবাবুকে ন্যায় বিচারের আশ্বাস দিয়া ও তাঁহার বি প্রার্থনার কথা গোপন রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বাড়ি পাঠাইলেন।

ব্রজবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না, তাঁহার খুড়তুতো ছোট-ভাই তাঁহারই নি হাতে গড়া বাড়ি হইতে তাড়াইবার জন্য কিভাবে গোপন ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন।

অবনীবাবু বাড়ি ফিরিবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাজপতি বাচস্পতি মহ তাঁহার ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া লণ্ঠন হাতে ব্রজবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। দু খড়মের গম্ভীর খটখট শব্দ শুনিয়া অবনীবাবু ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়ে যেন কিছুই জানেন না এমন ভান করিয়া ব্যস্ততা সহ বলিলেন, জ্যাঠামশাই, এত অন্ধকারের মধ্যে আপনি হঠাৎ যে?

বাচস্পতি মুখ বিকৃত করিয়া রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বলিয়া উঠিলেন, ব্রজ কোথ তোমরা ভেবেছ কি, বলতে পার?

কেন জ্যাঠামশাই? কি হয়েছে?

কি হয়েছে? তোমরা সমাজের বুকে কী অন্যায়-অত্যাচার করে বেড়াচ্ছ, বুঝতে ারছ না?

ইতিমধ্যে ব্রজবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া বিষন্ন মুখে নিতান্ত অপরাধীর মত াচস্পতির সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাচস্পতি যেন তেলেবেগুনে লিয়া উঠিলেন, ব্রজ, কাজটা ভাল কর নাই।

ব্রজবাবু করজোড়ে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, জ্যাঠামশাই, কি হয়েছে। আমি া কিছুই বুঝছি না!

কত বড় অন্যায় করেছ, বুঝার মত ক্ষমতা তোমার যদি থাকত তবে আর গা-মুখো ত না ব্রজ। সকালেই তোমাকে সর্তক করে দিতাম। একে শুভকাজ সম্পন্ন করতে ছিলুম, তাড়া ছিল। তার ওপর সবে গাঁয়ে পা দিয়েছ মনে এলেও কথাটি তখন খফুটে বলা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

কি কথা জ্যাঠামশাই! হয়েছে কি?

শোন, বেশী কথা বলে নষ্ট করার মত সময় আমার যথেষ্ট নেই। ধৈর্যেও কুলোবে ।। আমার যা কিছু বলার সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। সমাজে তোমার স্থান হতে পারে না।

অপরাধ?

দেখ ব্রজ, সব কিছু বুঝেও না বুঝার ভান করা অমার্জনীয় অপরাধ। আমরা াগেই সংবাদ পেয়েছি, তোমার মেয়েটির বিয়ের কথা সব পাকা হ য়ছিল। এমনকি াশীর্বাদ আর গায়ে হলুদও সেবে ফেলেছিলে।

কথাটি খুবই সত্য জ্যাঠামশাই।

যদি সত্যই হয় তবে সে মেয়েকে নির্দিষ্ট দিনে পাত্রস্থ করলে না কেন?

বিশ্বাস করুন, আশীর্বাদ ও গায়ে হলুদ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর জানতে রলাম, পাত্র মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র। অগাধ পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও দ্যপ পাত্রের হাতে আমার একমাত্র মেয়ে রেণুকে তুলে দিতে মন সরল না। আপনিই নুন জ্যাঠামশাই, জেনে-শুনে এমন পাত্রের হাতে কোন বাপ হাসি মুখে তুলে দিতে ারে। আগে জানতে পারিনি বলেই না আমার কচি মেয়ে রেণুর জীবনে এমন চরমতম র্ঘটনা নেমে এল। বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে আমাদের পরিবারের প্রতিটি নুষকে। ভুক্তভোগী না হলে কেউ বুঝতে পারবে না। কী দুঃসহ যন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্ত দগ্ধে মরতে হচ্ছে আমাকে!

তবে তোমার যন্ত্রণার অংশ কি আমাদের ঘাড়েও চাপাতে চাইছ ব্রজ?

তা কেন চাইব জ্যাঠামশাই। আমার কৃতকর্মের ফল আমিই ভোগ করব।

হাঁ, এই ত বুদ্ধিমানের কথা। যাক, শোন ব্রজ, তোমার কৃতকর্মের জন্য তোমাকে াশুল দিতেই হবে। সমাজ তো আর ছেড়ে কথা বলবে না। সমাজ ধর্ম রক্ষা করার ায়িত্ব তো সবাই আমাকে দিয়েছে।

আপনি সমাজপতি, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

হাঁ, আমি সমাজপতি ঠিকই। আমারই নির্দেশে সমাজের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন হয়,

মিথ্যে নয়। তাই বলে একই অপরাধে ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি তো হতে পারে না

তবে আমাকে কি করতে আদেশ করছেন ?

দেখ ব্রজ, সত্য বলতে কি তোমার প্রতি আমার একটু মানসিক দৌর্বল্য রয়েছে স্বীকার করছি।

ব্রজবাবু করজোড়ে বাচস্পতি মহাশয়ের মুখ হইতে তাঁহার প্রতি কি বিধান নির্গত হয় সেই আশংঙ্কায় কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি মহাশয় এইবার ব্রজবাবুর প্রতিবিধান দান করিতে যাইয়া বলিলেন, আমি সমাজপতি বটে, কিন্তু আমি একাই সমাজের সব নই। আজ রাত্রি হয়ে গেছে, অন্য সবাইকে ডাকাডাকি করে বৈঠক সম্ভব নয়। কাল বৈঠকে সবাই যে বিধান দেবেন তা কার্যকরী হবে। আজ রাত্রিটুকুর দায়িত্ব আমি নিতে পারি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি তুমি আর তোমার মেয়ের অবনীর সঙ্গে থাকা হয়ে উঠছে না।

ব্রজবাবু চমকাইয়া উঠিলেন, জ্যাঠামশাই!

হাঁ, অবনীর পরিবারে তোমাদের থাকা হচ্ছে না। অবশ্য অবনীর যদি এক ঘরে হয়ে, সমাজ বহির্ভূত জীবন যাপনের ভয় না থাকে তবেই তোমার সঙ্গে এক সাথে থাকতে পারে, নতুবা তোমাকে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিচ্ছি। এইবার অবনীবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কি হে অবনী, কি চিন্তা করলে, ব্রজর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সমাজের দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে, নাকি নিয়েব্রজকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একঘরে হয়ে থাকতে চাইছ কি বল ?

অবনীবাবু মুখে কৃত্রিম বিষাদের ছাপ ফুটাইয়া বলিলেন, জ্যাঠামশাই, দয়া করে এত কঠোর হবেন না। আমাদের দিকে একটু সদয় হোন, মুখ তুলে তাকান।

এতে তুমি এমন ভেঙে পড়ছ কেন অবনী ? তোমার তো কোন অপরাধ নেই সমাজের আর যাঁরা রয়েছেন, আশা করি তোমার ওপর ওদের কোন ক্ষোভ নেই অবশ্য তুমি যদি নিজের বিশ্বদ মাথা পেতে নাও, স্বতন্ত্র কথা। ব্রজ তো এতদিন তোমার কাছ থেকে দূরে সরেছিল, সমাজ তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড়টি পর্যন্ত দেয় নি।

তবু মেজদা এতদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছেন। তাঁরই হাতে তৈরী বাড়ি-ঘর গাছ পালা তিনি ভোগ করবেন। আমি তাঁর ছোট-ভাই হয়ে কোন প্রাণে তাঁকে বলবো—

অবনীবাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বাচস্পতি মহাশয় সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন দেখ অবনী, অগ্রজের প্রতি তোমার দুর্বলতা একটু-আধটু থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আমিতো জানি, মেজদার প্রতি চিরদিনই তোমার আন্তরিকতা আর ভক্তি-শ্রদ্ধা একটু বেশীই। ব্রজ'র মন্দভাগ্যের জন্য বড়ই মর্মপীড়া বোধ করছো তুমি। তবে আমার দিকটাও তো তোমাদের সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। আমার হাত-পা বাঁধা আশা করি অজানা নয়।

সে তো অবশ্যই।

ব্রজ'র এই দুঃসময়ে তার হয়ে কিছু করার সাধ থাকলেও, সাধ্য আমার নেই আজকের রাত্রিটুকু ভাববার অবসর পাচ্ছ। ভেবে দেখে কি করবে। ব্রজকে আজ

থাকতে গেলে সমাজকে ছাড়তে হবে। আর সমাজে বাস করতে হলে তার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই।

অবনীবাবু নীরবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগ্রজের জন্য তাঁহার বাহ্যিক মর্মবেদনা ও অনুশোচনার গভীরতা প্রকাশ করিবার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অগ্রজ ব্রজবাবু কতখানি কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন।

বাচস্পতি মহাশয় এইবার বলিলেন, শোন ব্রজ, আমার যা বলার সবই বলেচি। কাল অবশ্য সমাজের অন্যান্য সবাই উপস্থিত হয়ে যে বিধান দেবেন আমাকে তা-ই কার্যকরী করতে হবে। আজ রাত্রে তোমার অবনীর পরিবারের সঙ্গে একত্রে থাকা হচ্ছে না।

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের দিকে সকাতর দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

বাচস্পতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন, তুমি বরং এক কাজ কর, আজকের রাত্রিটুকু কোঠা বাড়িতে না থেকে বাইরের দিককার ঐ টিনের একচালাটিতে মেয়েকে নিয়ে কাটিয়ে দাও। চাকর বাকররা না হয় এই বারান্দায় আজ রাত্রে থাকবে। আর অবনীর ছেলে-মেয়েরা সেখানেই তোমাদের খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবে। মুহূর্তকাল নীরবে কাটাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এইবার বলিলেন—বুঝছি, ব্যাপারটি বড়ই হৃদয় বিদারক। কিন্তু কর্তব্য যতই নিষ্ঠুর হোক নিজের বাড়িতেই তোমাকে অবাঞ্ছিতের মত বাস করতে হচ্ছে। সবই করুণাময়ের ইচ্ছা, আমরা তো নিমিত্তমাত্র হে। সবই তাঁর ইচ্ছা। শেষ কথা কয়টি বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সমাজপতি বাচস্পতি মহাশয় বেটলযুক্ত খড়মে গরুগম্ভীর আওয়াজ তুলিয়া সেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

অদৃষ্টবিড়ম্বিত ব্রজবাবু মেয়েকে লইয়া বাড়ির প্রায় বাহিরের টিনের এক চালাটিতে রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইলেন।

সকালে কাজকর্মের অবসরে অবনীবাবু চোখে মুখে কৃত্রিম বিষাদ ও হতাশার ছাপ আঁকিয়া ব্রজবাবুর সামনে দাড়াইলেন। ব্রজবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছোট-ভাইকে প্রবোধ দিতে যাইয়া বলিলেন, দুঃখ কোরো না অবনী। আমার যা ভবিতব্য তা-তো ভোগ করতেই হবে। পরম করুণাময়ের হয়তো এটাই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এক পাও নড়ার উপায় নেই। আমার কৃতকর্মের ফল আমাকেই ভোগ করতে দাও।

তবু এ-বাড়িতে আমার চেয়ে তোমার দাবীই অনেকাংশে বেশী মেজদা।

আমি কিন্তু সেই সুবাদে আমার প্রাপ্য অংশ বুঝে পেতে এখানে আসি নি অবনী। তুমি যদি সত্যই এইরকম কিছু ভেবে থাক তবে আমার প্রতি অবিচারই করা হবে। কলিকাতায় আর থাকা সম্ভব হ'ল না। ব্যবসাপত্র যেটুকু ছিল নষ্ট হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে বসতবাড়িটিও বিক্রি করে দিতে হ'ল। কিছুদিন বাড়িভাড়া করে কাটালাম। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন হল, দুটিমাত্র পেট তাও চালাতে অক্ষম হয়ে পড়লাম। তবে ঈশ্বরের কৃপায় দেনা যেটুকু ছিল, মিটিয়ে দিতে পেরেছিলাম, এটুকুই স্বস্তি। এইবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, অবনী, ছোট্ট এই জীবনে লাগামহীন অবস্থায় কেবল ছুটেই বেড়ালাম। ভুলেও পিছনের দিকে তাকাবার চেষ্টা করি নি

কোনদিন। ভেবেছিলুম, আর নয়, বাকী জীবনটুকু তোমার কাছাকাছি পাশাপাশিই কাটিয়ে দেবো। সামনের কেরোসিনের নিষ্প্রভ আলোক শিখাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন এর মতোই আমার জীবন প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে ভাই! পাওনা বুঝে নেবার সময় আর নেই, সেই মানসিকতা আমার মধ্যে অনুপস্থিত। তুমি ছাড়া সংসারে বোধ হয় এমন সুজন আমার নেই যে উপলব্ধি করতে পারে। আমি কত অসহায়, কত ক্লান্ত! ছুটির দরখাস্ত অনেক আগেই পেশ করে রেখেছি, মঞ্জুরি কবে আসবে ঈশ্বরই জানেন। কি পেলুম, কি দিলুম আর কি ই আমার পাওনা রইলো সেই হিসেব-নিকেশ আমার দ্বারা আর হবার নয়, আর সেই ইচ্ছাও নেই। জীবনভর যে হিসেব করেছি, সবই গোজামিলে ভরা। তাইতো জীবন সায়াহ্নে এসেও অন্ন বস্ত্র আর মাথা গোঁজার স্থানটুকুর কথা ভাবতে হচ্ছে। আজ আমি যথার্থই নিঃস্ব রিক্ত। যে কথা তোমাকে বলতে চাইছি ভাই, আমি তোমার ছেলে-মেয়ের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আসি নি। এসেছিলুম তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে।

ইতিমধ্যেই অবনীবাবুর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ ব্রজবাবুর পুটুলিটি বহির্বাটীর একচালাটিতে রাখিয়া আসিয়াছে।

পরদিন সকালে সমাজপতি বাচস্পতি মহাশয়ের বাড়িতে নবীনবাবুর ডাক পড়িল। নবীনবাবু হন্তদন্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় দাওয়ার একচিলতে রৌদ্রে পিঠ দিয়া তামাক টানিতেছেন। নবীনবাবু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাচস্পতি মহাশয় হুকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, শোন নবীন, আমি একা কিছু করতে পারি নে, আগেই বলেছি। সমাজ কারো একার নয়। দশজন যে বিধান দেবে, তাই বাস্তবায়িত হবে। তুমি বরং এক কাজ কর বাপু, আজ সন্ধ্যায় বারোয়ারী তলায় সকলকে ডাক। সবই রাধামাধবের ইচ্ছে।

নবীনবাবু বাচস্পতি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বে বারোয়ারী হরিতলায় ঝাঁট ও গোবরজল পড়িল। নবীনবাবু বাড়ি হইতে শীতলপাটী আনিয়া যত্ন করিয়া পাতিয়া দিলেন। দুইটি হ্যারিকেন ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে না আসিতে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এক এক করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নবীনবাবু ও ব্রজবাবু এ আসরের একান্তে বসিলেন। প্রবীন-নবীনের আগমনে বারোয়ারীতলা অনেকদিন পর আবার জমজমাট হইয়া উঠিল। বাচস্পতি মহাশয় উপস্থিত হইলে সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে অন্যান্য সকলে এক এক করিয়া বসিলেন। সমাজপতির নির্দেশে প্রবীণ ধনঞ্জয় উঠিয়া ব্রজবাবুকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ব্রজ, সমাজ বলে একটা কথা আছে। সমাজে বাস করতে গেলে এমন কোন কাজ আমাদের কখনই করা উচিত নয় যা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক বিধি-নিষেধের বাইরে যাবার সামান্যতম উপায়ও আমাদের নেই। আমরা জানি, তুমি ধর্ম অন্তঃপ্রাণ। কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অবশ্যই নও।

ব্রজবাবু অবনত মস্তকে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বক্তব্য শুনিতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত বলিয়া চলিলেন, যদিও বেশ কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা, তবুও তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কেলেঙ্কারীর কথা গ্রামের ছেলে-বুড়ো কারোরই অজানা নয়। সেই—

বৃদ্ধ বেনীমাধব তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, সেই লজ্জঘৃণা আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে তুমি গ্রামত্যাগী হয়ে কলিকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলে। সমাজের ধরা ছোঁয়ার বাইরে গিয়ে তুমি নির্বিবাদে জীবন যাপন করতে লাগলে। শুনেছি, কলিকাতা বিরাট শহর। সেইখানে ছত্রিশ জাতি আর বত্রিশ ভাষার সমাবেশ। সমাজ বলে কিছু নেই। সেখানে কেউ কারো খোঁজ রখে না, তোয়াক্কাও করে না। সে অবকাশও কম। তাই তো দেশ এমন রসাতলে যেতে বসেচে। তাই বলছি কি, তোমার মত লোকের কলিকাতাই উপযুক্ত স্থান।

বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, সেদিন তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করিয়া রমণীর হাত ধরিয়া গৃহত্যাগ করিলো। আর তুমিও সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলে গেলে কলিকাতায়। আমার মনে হয় তোমার উচিত ছিল তখনই সমাজ ও গ্রামবাসীর সঙ্গে আপোষ-রফা করে নেওয়া। তার ধার কাছ দিয়েও গেলে না তুমি। অবশ্য তুমি যা ভাল মনে করেচ তাই করেচ।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত বলিলেন, শুধু কি তা-ই? ব্রজর মেয়ের কেলেঙ্কারীর কথাই বা গাঁয়ের কার অজানা আছে। যে-মেয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেছে এমন কি গায়ে হলুদও সম্পন্ন হয়েচে, কিন্তু বিয়ে হলো না। আজও তাকে পাত্রস্থ করতে পারলে না। সমাজের বুকে এ যে ভাবা যায় না ব্রজ! বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আরে এমন কলঙ্কিনীকে কোন রাজপুত্র পংখীরাজে চেপে বিয়ে করে নিয়ে যেতে আসবে, শুনি দেশে কি মেয়ের আকাল পড়েছে নাকি হে ধনঞ্জয়!

ব্রজবাবুর এহেন দুরবস্থায় নবীনবাবু এই মুহূর্তে অন্তত আন্তরিক মর্মাহত হইলেন। হাজার হোক, ব্রজবাবু তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়। তারা খুড়তুতো—জ্যাঠতুতো ভাই। রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে, অস্বীকার করার নয়। আজ তাঁহারই সামনে তাঁহাকে এমন হেনস্তা হইতে দেখিয়া তাঁহার মন কেঁদে ওঠাই স্বাভাবিক। বাস্তবিকই বিষম সমস্যায় পড়লেন তিনি।

পতিতপাবন বাক্যবাগীশ এতক্ষণ চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া তামাক টানিতেছিলেন। হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—শোন ধনঞ্জয়, ব্রজ ঘোরতর অন্যায় করেচে।

ব্রজবাবু করজোড়ে নিবেদন করিলেন, দেখুন, আপনারা সবাই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ; আমার নমস্য। অপরাধ যে আমি করেচি, অস্বীকার করতে পারবো না। সেই ইচ্ছাও আমার নেই, শুধুমাত্র এইটুকুই আপনাদের কাছে আমার ঐকান্তিক অনুরোধ, আপনারা যেই শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।

একী কথা বলছ ব্রজ! শাস্তি? শাস্তি বলচো কেন? আমরা তোমার শাস্তি

নিরূপন করতে এসেছি মনে করলে আমাদের প্রতি কিন্তু অবিচারই করা হবে। ধনঞ্জয় পণ্ডিত বলিলেন।

বাচস্পতি মহাশয় এতক্ষণ মৌন ছিলেন। এইবার প্রথম মুখ খুলিলেন, ব্রজ তুমি গোড়াতেই ভুল করে বসলে। আমরা তোমার শাস্তি নিরূপন করতে বসি নি। সমাজ তোমার প্রতি কোনরূপ অন্যায়-অবিচার অবশ্যই করবে না, তুমি জেনে রেখো।

বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমরা এমন এক বিধানদানের চেষ্টা করবো যা তোমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য। ভুলে গেলে চলবে কেন, তুমিও সমাজের একজন। সমাজ তোমাকে বর্জন করতে নয়, বরং গ্রহণ করতেই আগ্রহী ব্রজ।

ব্রজবাবু করজোড়ে নিবেদন করিলেন, আপনারা দয়া করে বলুন, আমার প্রতি সমাজের কি বিধান ?

বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, বল হে ধনঞ্জয়, ব্রজর প্রতি কি বিধান দেয়া যায় ?

ধনঞ্জয় বলিলেন, আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ. তাছাড়া বাচস্পতি মশাই স্বয়ং উপস্থিত। আপনারাই চিন্তা ভাবনা করে যা হোক একটা বিধান দিন যাতেই ব্রজকে পুনরায় সমাজে ঠাঁই দেয়া যেতে পারে।

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, তুমিই বল বিদ্যাবিনোদ, পাপ স্খালনের জন্য ব্রজকে কি করতে হবে।

বৃদ্ধ বিদ্যাবিনোদ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কাঁধের চাদরটি গোছগাছ করিয়া বসিলেন। এইবার সভাস্থ সবলের দিকে একবার চোখের মণি-দুইটি বুলাইয়া লইয়া বলিয়া চলিলেন, কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রজকে বারোয়ারী তলার এই হরি মন্দিরের জন্য একটি হ্যাজাক লাইট কিনে দিতে হবে। ঝড়-বৃষ্টির দিনে হ্যারিকেন নিয়ে এখানে বসাই সম্ভব হয় না।

ব্রজবাবু বাজপড়া রোগীর মত অপলক চোখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পতিতপাবন বাক্যবাগিশ বলিলেন, আর একটা চাঁদোয়া। আমাদের চাঁদোয়াটার অবস্থা দেখেছ ধনঞ্জয়, কেমন ছিঁড়ে ফেঁটে একাকার হয়ে গেছে! উৎসব-অনুষ্ঠানে ওটাকে লোকজনের সামনে বের করা যায় না! ব্রজ, তুমি বাপু আমাদের এই বারোয়ারী হরিতলার জন্য হ্যাজাক লাইটের সঙ্গে একটি বেশ বড়সড় চাঁদোয়াও তৈরী করিয়ে দিয়ো। আরে বারোয়ারীতলা তো দশজনের ব্যাপার তোমার আমার সবারই কাজে লাগবে. কি বল ? তার ওপর তুমি আবার পরম বৈষ্ণব।

ব্রজবাবু চিত্রার্পিতের মত নিষ্পলক চোখে চাহিয়া রহিলেন। অবণীবাবু আঁড়চোখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কি বুঝিলেন, একমাত্র তিনিই জানেন।

সমাজপতি বাচস্পতি মহাশয় নিস্তেজ চোখের মণি দুইটি একটি বার ব্রজবাবুর উপর বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, কি হে ব্রজ, তুমি যে একেবারে বোবা হয়ে গেলে! আমি বলব, তোমার কৃত অপরাধের তুলনায় সমাজ তোমার প্রতি সহানুভূতিই প্রদর্শন করেছে। তবে কার্যতঃ দাঁড়াল বারোয়ারী হরিতলার জন্য একটি হ্যাজাক লাইট আর একটি চাঁদোয়া

তৈরী করিয়ে দিলেই তোমাকে আবার সমাজে তুলে নেয়া হবে। খুবই অন্যের ওপর সেরে ফেল্‌লে ব্রজ। বাচস্পতি মহাশয় দেখিলেন তাঁহার দিক হইতেও ইহাদের সহিত যাহা হউক কিছু না কিছু সংযোজন করা দরকার। তাহা না হইলে সমাজপতি হিসাবে তাঁহার মর্যাদা অক্ষুন্ন রহে না। এইবার উপস্থিত সবার দিকে একটিবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, নবীন আমাদের ডেকেছে ব্রজ যাতে আবার অন্যদশজনের মতই সমাজে বসবাস করতে পারে তার একটা বিধি ব্যবস্থা করে দিতে। চমৎকার প্রয়াস! বড়-ভাইয়ের প্রতি ছোট-ভাইয়ের উপযুক্ত আচরণই বটে। তার আচরণ সত্যই প্রশংসনীয়। আমি এই সুযোগে নবীনের ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

উপস্থিত সবাই সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, সাধু! সাধু!

অবণীবাবু নিজের জায়গাটিতেই সামান্য নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

সমাজপতি বাচস্পতি মহাশয় এইবার বলিলেন, বিদ্যাবিনোদবাবু বারোয়ারী হরিতলার জন্য একটি হ্যাজাক লাইট আর পতিত পাবন ব্যক্যবাগীশ বারোয়ারী উৎসব- অনুষ্ঠানের জন্য একটি চাঁদোয়ার কথা পেড়েছেন। চমৎকার প্রস্তাব! আপনারা জানেন, এই দুইটি জিনিসই আমাদের অত্যাবশ্যক। আর আশা করি এই কথাও অবশ্যই স্বীকার করবেন, দশজনের জন্য কিছু করতে পারা পুণ্যের কাজ। সবার অদৃষ্টে এমন সুযোগ জোটে না। আমি জানি, ব্রজ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিধানকে হাসিমুখেই মেনে নিয়ে নিজেকে আবার সমাজে বসবাসের যোগ্য করে তুলবে। ব্রজ, আর একটি কথা- কথাটি শেষ না করিয়া ব্রজবাবুর দিকে চাহিলেন।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের দিকে চাহিলেন।

বাচস্পতি মহাশয় আবার বলিলেন, ব্রজ, সমাজপতি হিসাবে আমারও কিছু বলার আছে। তুমি একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। শ্রীহরির চরণে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে তাঁহার সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে দিনের একটি বড় ভগ্নাংশ অতিবাহিত করছো। এ-ই হচ্ছে সত্যকারের পরকালের কাজ। তাই বলছি কি, তুমি যখন পরম বৈষ্ণব মানুষ তখন একটি পুণ্যের কাজ কর না কেন, গোবিন্দ জিউর মহোৎসব দিয়ে আমাদের সবাইকে একদিন ভাল করে প্রসাদ খাইয়ে দাও।

বিদ্যাবিনোদ বাক্যবাগীশ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, সাধু! সাধু প্রস্তাব! আগামীকালই পূর্ণিমা তিথি। চমৎকার সুযোগ ব্রজ! ধনঞ্জয় পণ্ডিত বলিলেন, আগামীকাল কি ব্রজর পক্ষে সম্ভব হবে, ভেবে দেখুন। সময় খুবই সংকীর্ণ। এক রাত্রের মধ্যে সব কিছু যোগার যন্ত্র করে ভোগের আয়োজন হয়তো করে উঠতে পারবে না।

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, ধনঞ্জয় যথার্থই বলেছে। আগামীকাল ব্রজর পক্ষে ভোগের আয়োজন করতে যাওয়া পীড়া দায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে বরং ব্রজকে সুযোগ দেয়া হোক, আগামী শনিবারের মধ্যে তার সুবিধে মত যেকোনদিন গোবিন্দ জীউর মহোৎসবের আয়োজন করলেই হবে, তোমরা কি বল?

উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, উত্তম। আপনার পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ হবে। ব্রজ'র সুবিধা-অসুবিধাও তো আমাদের দেখতে হবে।

এইবার বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, কি হে ব্রজ, তুমি যে সর্বক্ষণ অবনত মস্তকেই বসে রইলে। সবার মতামত তো শুনলে। তুমি বিধানগুলো মেনে নিচ্ছ তো? সমাজে থাকতে হলে এটুকু তো করতেই হবে বাপু।

ব্রজবাবু ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, অপরাধ আমার অমার্জনীয় মেনে নিচ্ছি। আর আপনাদের বিধানও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, এ-ও স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু আমার আর্থিক পরিস্থিতির কথা কাউকে বলে বুঝানো সম্ভব নয়। কলিকাতার ব্যবসাপত্র সবই আমার নষ্ট হয়ে গেছে। নগদ অর্থ যা কিছু ছিলো সবই দেনা মিটাতে গিয়ে ব্যয় হয়ে গেছে। আজ আমি সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য। যথার্থই নিঃস্ব-রিক্ত আমি। আপনাদের বিধান মাথা পেতে নিয়ে বাঞ্ছা পূরণ করতে এ-মুহূর্তে বাস্তবিকই আমি অক্ষম। আমার অক্ষমতার জন্য আমি সমাজের প্রতিটি সম্মানীয় ব্যক্তির কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আপনাদের এই অনুরোধ ও আমি অবশ্যই করবো না, সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করে আমাকে আপনারা সমাজে ঠাঁই দিন।

অবনীবাবু সামান্য আগাইয়া ব্রজবাবুর গা ঘেঁষিয়া বসিলেন। চোখে-মুখে কৃত্রিম বিষাদের ছাপ আঁকিয়া বলিলেন, মেজদা, একটু ভেবে দেখো না, যদি ওনাদের বিধান মেনে নিতে পার। এতদিন পর ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন বাড়ি ফিরে এলে, দু'ভাই যাতে জীবনের শেষ কয়টি দিন এক সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারি সেই চেষ্টা করে দেখো।

ব্রজবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, গোবিন্দর হয়তো ইচ্ছে নয়, আমি গ্রামের বাড়িতেই জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাই। আমার নিজের অদৃষ্টই নানাভাবে আমার প্রতিবন্ধকতা করছে ভাই। তুমি আর মিছে দুঃখ করে কি করবে। যা ভবিতব্য তাকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না নবীন। আমার মত একজন কপর্দকশূন্য অভাগার পক্ষে সমাজপতিদের বাঞ্ছা পূরণের মাধ্যমে প্রসন্ন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে এইসব অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়, বিশ্বাস কর ভাই!

বড় ভাইয়ের কথায় নবীনবাবু বাহ্যিক অনুশোচনা প্রকাশ করিলেও ভিতরে ভিতরে খুবই পুলকিত হইলেন। ব্রজবাবুর মত একজন সহজ-সরল মানুষের পক্ষে ছোট-ভাই নবীনবাবুর মনের গোপন কথা বুঝা সম্ভবই হলো না।

এই দিকে ব্রজবাবুর পক্ষে সমাজপতিদের বিধান কিছুতেই পালন করা সম্ভব নয়, কাহারও বুঝিতে বাকী রহিলো না। তাহারা এক এক করিয়া গাত্রোত্থান করিতে লাগিলেন। অবনীবাবু নিজে বাচস্পতি মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

অবনীবাবু বাড়ি ফিরিয়া সোজা বহির্বাটিস্থ টিনের একচালাটিতে উপস্থিত হইলেন। দরজায় দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া দেখিলেন, ব্রজবাবু তাহার পুটুলিটি গোছগাছ করিতেছেন। অবনীবাবু বিষণ্ণমুখে বলিলেন, মেজদা, এই রাত্রিতে কোথায় যাবেন। সকাল হোক, তখন না হয় যা হোক চিন্তা করবেন। কথা কয়টি কোন রকমে ছুঁড়িয়া দিয়া অবনীবাবু ধীরে ধীরে অন্দর মহলের দিকে পা বাড়াইলেন।

## সতের

এইদিকে সবিতা তারকের সহিত হরিণ-পুরে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত সারদারও আসিবার কথা ছিলো। তাহার আসিবার যাবতীয় ব্যবস্থাদি পাকা হইয়াও গিয়াছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বাঁকিয়া বসিলো। কিছুতেই তাহাকে সম্মত করা গেলো না। তারকও তাহাকে আসিবার জন্য কম অনুরোধ করে নাই। সম্ভবতঃ রাখালের দিক হইতে তেমন উৎসাহ পায় নাই বলিয়াই হয়তো সে কিছুতেই সবিতার সহিত হরিণপুরে আসিতে সম্মত হয় নাই। সারদা এক সন্ধ্যায় রাখালকে একা পাইয়া সোল্লাসে বলিয়াছিল, দেবতা, আমরা তারকবাবুর সঙ্গে হরিণপুরে বেড়াতে যাচ্ছি।

সারদার কথায় মুহূর্তের মধ্যে রাখালের মুখে বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছিলো। হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল প্রাণচঞ্চল রাখাল। তাহার আকস্মিক ভাবান্তরটুকু সারদার দৃষ্টি এড়াইল না।

সারদা কয়েক মুহূর্ত তাহার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিয়াছিল দেবতা, এই পুরুষ মানুষ আপনি!

রাখাল অতর্কিত চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত সচকিত হইয়া সারদার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

সারদা ঠোঁটের কোণে তেমনি দুষ্টুমিভরা হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিয়াছিল, হাঁ, ঠিকই বলছি দেবতা। বলিহারি আপনার পৌরুষত্ব!

রাখাল তেমনি বিস্ময়ভরা চোখে চাহিয়া রহিল। সারদা বলিয়া চলিল, আচ্ছা দেবতা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন? কেন বলছেন না, সারদা, হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মা'র ইচ্ছে হয় তিনি যান, তুমি যাবে না। আমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি শক্ত?

ইহার উত্তরে রাখাল কি বলিবে সহসা ভাবিয়া পায় নাই। নীরব দৃষ্টিতে তেমনি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। এক সময় বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিয়াছিল, তোমরা স্থির করেচো যাবে, খামকা আমি বারণ করতে যাব কিসের জন্যে?

সারদা ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয়, আমি যাই।

এটি কি নিছকই একটি খেয়ালের কথা হলো না?

সারদা রীতিমত দৃঢ়তার সাহিতই ব্যক্ত করিয়াছিল, হোক খেয়াল। এটিই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা, হরিণপুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, না অন্যায় অধিকার আমি কারো পরেই খাটাই না।

সারদা বলিয়াছিল, ছিল অধিকার। কিন্তু এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল পরের হুকুম মেনে মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস

গেছে, ভরসা গেছে নিজের পরে। যে লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মিটাতে গিয়ে তার জীবন কেটে যায়। শুভাকাঙ্খীর এই কথাটি মনে রাখবেন রাখালবাবু।

সারদা তাঁহার মনের কথা রাখালকে কতখানি বুঝাইতে পারিয়াছে বলা মুশকিল। সব কথা কাহারো নিকট সর্বদা মুখ ফুটিয়া খোলসা করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তবে আভাষে আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতে হয়। সারদার ক্ষেত্রেও সেই পথই বাছিয়া লইতে হইয়াছে। রাখাল কি তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন অভিলাষ কিছুই বুঝিল না, নাকি বুঝিয়াও না বুঝার ভান করিল? কিন্তু তাহার মত একজন সুচতুর যুবকের পক্ষে তো সারদার মনের কথা না বুঝার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। বরং বলা চলে সে বুঝিয়াও না বুঝার ভান করিয়া পাশ কাটাইয়া গেল। যাহাই হউক বর্দ্ধমানের হরিণপুরে আসিবার যাবতীয় প্রস্তুতি লওয়া স্বত্বেও সারদার পক্ষে রাখালের অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিয়া সবিতার সহিত আসা সম্ভব হইল না।

দীর্ঘদিন কলিকাতার কোলাহল ও হৈ-হট্টগোল ও ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে বহু দূরে হরিণপুরের গ্রাম্য পরিবেশ সবিতার মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের জোয়ার বহাইয়া দিলো। তারক ইস্কুলে যাইবে। ঘুম হইতে উঠিয়া খুটিনাটি কয়েকটি কাজ করিতে যাইয়া স্নানের সময় যে কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার খেয়ালই নেই।

সবিতার ডাকে তারকের চমক ভাঙিল। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সে কী তারক, তোমার ইস্কুলের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে যে! এখনো নাইতে গেলে না যে বড়!

তারক কাজের ফাঁকে ঘাড় ঘুরাইয়া নতুন মা'র দিকে তাকাইল।

সবিতা বলিয়া চলিলেন, দশটা যে বেজে গেল! কখন নাইতে যাবে? শেষ পর্যন্ত খাওয়াই হবে না দেখছি! নাকে-মুখে কোন রকমে দুটি গুঁজে ছুটতে হবে। শরীরের ওপর এমন অনাচার করলে শরীর যে দু'দিনেই ভেঙে যাবে বাবা!

নতুন-মা'র কথায় তারক যেন অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বারান্দা হইতে তেল-গামছা লইতে পা বাড়াইল। সবিতা মুচকি হাসিয়া বলিলেন—'এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চল্‌লে? তেলের বাটি, গামছা যে আমি হাতে নিয়ে তখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেখতে পাওনি বুঝি?

তারক সলজ্জ ভঙ্গিমায় পিছন ফিরিয়া সবিতার কাছে আসিয়া মুচকি হাসিল। বাটি হইতে হাতে তেল ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া বলিল, নতুন-মা, তুমি দেখছি এ কয়দিনে আমাকে একেবারে কুড়ের বাদশা বানিয়ে দিয়ে যাবে! এতটুকুও কোথাও ত্রুটি নেই। চাওয়ার আগেই সব কিছু একেবারে হাতের কাছে এনে রাখো! ভাবছি—

তারকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা মুখের হাসির রেখাটাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই বলিলেন, কি! কি ভাবছো বাবা?

ভাবছি, তুমি তো আমার অভ্যাসগুলি পাল্টে দিয়ে একদিন টুক্ করে কলকাতায় পাড়ি দেবে।

দেবোই তো।

তারপর?

তারপর আবার কি ?

আমার গতি কি হবে ? কে ঘুম ভাঙিয়ে চায়ের বাটি হাতে তুলে দেবে নতুন-মা ? কে তেল-গামছা হাতে দিয়ে জোর করে ঘাটে নাইতে পাঠাবে ? আর কে-ই বা রোজ রোজ পাঁচ-সাত পদ রান্না করে সামনে তুলে দেবে, খাবার সময় পাখা হাতে ঠায় বসে থেকে এটা ওটা খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে নতুন মা ?

স্মিত হাস্যে সবিতা বলিলেন, অভ্যাসের পরিবর্তন সত্যই যদি আমি ঘটিয়ে থাকি তবে ভবিষ্যতের চিন্তাও তো আমাকেই নিতে হবে, তাই না বাবা ?

অবশ্যই। আমাকে এমন অলস গোবর গণেশ বানিয়ে দিয়ে—

সবিতা তারকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, আমি যে তোমার ভবিষ্যৎ-চিন্তা করছি না, নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছি, এই কথাই বা তোমাকে কে বল্‌লে বাবা ? চোখে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ছাপ আঁকিয়া সবিতা ধমকের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, দশটা বেজে গেছে, আগে পুকুর থেকে নেয়ে আস। ইস্কুলের দেরী হয়ে যাবে। ভবিষ্যতের চিন্তা পরে করলেও চলবে।

সবিতা তারকের ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিতেছেন বলিতে কিসের ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা বোধ করি ব্যস্ততার জন্য তারক হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিল না।

তারক নাকে-মুখে দুটি গুঁজিয়া স্কুলে রওনা হইয়া গেলো।

রবিবার। তারকের স্কুল ছুটি। সকালে সবিতার কাজের ব্যস্ততা নাই। তারকের স্কুল থাকিলে দশটার মধ্যে রন্ধনাদি কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। সবিতা এখানে আসিবার পর তিনি নিজে হাতেই পাকশালের যাবতীয় কাজ করেন। তারক অনেক করিয়া নিষেধ করিয়াছে, কয়দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়া হেঁসেলে আটকা পড়িয়া থাকিলে এখানে আসাই অনর্থক হইয়া যাইবে। সবিতা তাহার কোন কথায়ই কান দেন নাই। যে কয়দিন আছেন নিজে-হাতে মনের মত রান্না করিয়া ছেলেকে খাওয়াইবার সুযোগ হাত ছাড়া করিতে কিছুতেই রাজী হন নাই। তাছাড়া বাইরের কাজ ও রান্নার যোগান দিবার জন্য অমলের মা রয়েছেই। তারকও পরে আর তাহাকে সেই পথ হইতে বিরত করিতে আর চেষ্টা করে না।

তারকের বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। পরিক্ষার খাতা দেখার কাজ চলিতেছে। সে নিজের ঘরে বসিয়া খাতা দেখায় ব্যস্ত। সবিতা রান্নার ফাঁকে তাহার জন্য জলখাবার লইয়া আসিয়াছেন। তারকের সেইদিকে খেয়ালমাত্র নাই। খাতার ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে নিজের কর্মদক্ষতা যাচাই করিতেছেন। শিক্ষাদানে তাহার সার্থকতা ও ব্যর্থতার পরিমাপ করিতে আত্মমগ্ন। দীর্ঘ বারো মাস ধরিয়া যে-ছাত্রকে পাঠদান করিল তাহা কোন ছাত্র কতখানি হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিয়াছে। অন্যভাবে বলিলে যে তাহার বক্তব্য ছাত্রের অন্তরের অন্তঃস্থলে আলোকপাত করিতে কতখানি সফল হইয়াছে বা ব্যর্থ হইয়াছে তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে পরীক্ষার খাতার মধ্য দিয়া।

সবিতা জলখাবারের বাটি চৌকিতে না রাখিয়া হাতে ধরিয়া রাখিয়াই বলিলেন, তারক, কত বেলা হইয়া গিয়েছে দুটো কিছু মুখে দিয়ে নাও বাবা।

সবিতার ডাকে তারক সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল।

সবিতা বলিলেন, সময় মত খাওয়া দাওয়া না করিলে শরীর টিকিবে কেন বাবা। এই নাও, দুটো মুখে দিয়ে নাও।

তারক সবিতার হাত হইতে জলখাবারের জাম বাটিটি হাতে লইয়া তাহার ভিতরের খাদ্যবস্তুর ওপর একবার চোখ বুলাইয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, নতুন-মা, এখানে আসার আগে থেকেই লক্ষ্য করছি, আমার জন্য তোমার ভাবনার অন্ত নেই।

সবিতা তারকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মুখে স্বভাব সুলভ হাসির ছোপটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া বলিলেন, বোকা ছেলে কোথাকার! ছেলের জন্য মায়ের ভাবনা-চিন্তা থাকবে, এটাই ত স্বাভাবিক বাবা। কিন্তু হঠাৎ এই কথা বল্‌লে যে?

তারক বলিল, হঠাৎ কথাটি মনে হ'ল, বলে ফেল্‌লুম।

না, এই কথা ত হঠাৎ মনে পড়ার নয় বাবা তারক।

এখানে আসার পর থেকে তোমার মধ্যে সর্বক্ষণ একটিমাত্র প্রয়াস লক্ষ্য করছি। আমি কি খেতে ভালবাসি, কি পরতে ভালবাসি এইসব ভাবনা নিয়েই যেন তোমার দিনের-বড় ভগ্নাংশ কেটে যায়।

তারক, সব মায়েরই সর্বক্ষণ একই চিন্তা—

তারক তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, আমার মা, আমার গর্ভ-ধারিণী বাঁচিয়া থাকিলে বুঝি আমার সুখ সুবিধার উৎপাদনের জন্য সর্বদা এমন আকুল হতেন, তাই না ছোট মা?

সবিতা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। তাহার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন মুহূর্তে গুছাইয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র নীরবে মুচকি হাসিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া তাহার কথায় সম্মতি জানাইলেন।

তারক বিষাদক্লিষ্ট মুখে বলিল, নতুন-মা, তুমি এখানে আসার পর থেকে, আমার আবাল্য পোষিত ক্ষতটা নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তুমিও হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, আমি প্রায়ই আনমনে তোমার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকি।

সবিতা তারকের পাশে বসিয়া তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন, কেন তারক?

ছেলেবেলার বহু টুকরো টুকরো স্মৃতি আমার মনের গভীরে একে একে উঁকি দিতে থাকে। আমি তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলি নতুন-মা!

সবিতা বুঝিয়াও না বুঝার ভান করিয়া বলিলেন, কার কথা? কিসের স্মৃতি বাবা?

তোমার মধ্যে আমি যেন আমার গর্ভধারিণীকে দেখতে পাই নতুন-মা।

তাই বুঝি?

বিশ্বাস কর। তোমারই মত সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন চওড়া সীমান্তরেখা, কপালে ঠিক এমনি বড় একটি সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, লালপেড়ে কাপড় পরে আমার মা যখন ঠাকুর-ঘরে যেতেন,—মনে হতো স্বয়ং ভগবতী বুঝি আমাদের সংসারে আবির্ভূতা হয়েছেন।

মুচকি হাসিয়া সবিতা বলিলেন, আর আমাকে? আমাকে কি মনে হয় বাবা?

আমি তো আগেই বলেচি, তোমার মধ্যে আমার গর্ভধারিণীকে খুঁজে পাই নতুন-মা।

তোমার মায়ের কথা সব মনে আছে তারক?

খুবই সামান্য। অস্পষ্ট ছায়ার মত স্মৃতির পটে মাঝে মধ্যে ভেসে ওঠে।

তোমার মায়ের কথা আমাকে বলবে তারক? আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।

তারক চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমার মা ছিলেন, রূপে-গুণে যথার্থই ভগবতী। আমার তখন মোটামুটি জ্ঞান হয়েছে। বয়সও একেবারে কম ছিলো না। বছর আটেক তো হবেই। মাত্র দুইদিনের রোগভোগের পর তিনি আমাদের মায়া কাটিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। এক বিধবা পিসি আমাদের সংসারের হাল ধরলেন। আমি পাঠশালা ছেড়ে হাই-স্কুলে ভর্তি হলাম। একদিন স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে ভর্তি হলাম কলেজে। আমার বাবার কাছ থেকেই বাপের স্নেহ, মায়ের আদর দুই-ই পেয়ে দীর্ঘ প্রায় দশ বছরের মধ্যে আমি যে মাতৃহীন একদিনের জন্যও তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিনি তবে মাঝে মধ্যে যে মায়ের কথা মনে পড়ত তা ও নয়।

তারপর? তারপর কি হ'ল?

তারপরই আমার জীবনে শুরু হ'ল চরমতম বিপর্যয়ের পালা। হঠাৎ শুনলাম, বাবা নাকি আবার বিয়ে করবেন।

বিয়ে? প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার দশ-বারো বছর পরে আবার বিয়ে?

হাঁ। বাবার বিয়ের প্রস্তুতি জোর কদমে চলতে লাগল। বাবাকে কিছু বলার মত সাহস আমার ছিল না। সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার মত সৎ-সাহস আমার কোথায়!

সবিতা বিষাদক্লিষ্ট মুখে নীরবে তারকের জীবন-কাহিনী শুনতে লাগিলেন।

তারক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাবার এত বড় একটি অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিবাদ করার মত, ওনার অসঙ্গত কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা ভেবেও নিজেকে সামলে নিতে হ'ল। মনের কথা মুখের ভাষায় ওনার কাছে প্রকাশ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ল না। কিন্তু এতবড় একটা অন্যায় কাজকেও তো সমর্থন করা যায় না। প্রায় আমার সমান বয়সীকে কি করে 'মা' বলে সম্বোধন করার ব্যাপারটি আমাব কাছে এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার ব্যাপার হয়ে দাড়াল। আমি কাউকে ব্যক্ত করতে পারলাম না, কোথায় আমার জ্বালা? কোথায় আমার ব্যথা ভুলেও আমার বিয়ে-পাগল বাবা মুহূর্তের জন্যও তলিয়ে দেখার দরকার মনে করলেন না। তিনি অদূর ভবিষ্যতে আত্মসুখের চিন্তায় মগ্ন। তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স্ক চোখের তারা দুটো রঙিন স্বপ্নের ছোঁয়া পেয়ে বিভোর। আমার লজ্জা অপমান আর অসহায়ত্বের কথা মুখফুটে বলার মত আপনজন

কেউই ছিল না। থাকলেও ব্যক্ত করতে পারতাম কিনা এমুহূর্তে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারছি না। মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, এমন যন্ত্রণার উদ্ভব হয় যা অব্যক্তই থেকে যায়। অন্তরের অন্তঃস্থলেই বার বার গুমড়ে ফেরে। আমার জীবনের সেই অভিশপ্ত মুহূর্তটিকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করার যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমার মন ছটফট করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক জামা-কাপড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। আমার অনুপস্থিতি ও অদর্শনে আমার বাবা কতখানি মানসিক অস্বস্তি ভোগ করেছিলেন, বলতে পারব না। তাঁর বহু আকাঙ্খিত শুভ কাজটি কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে ও নির্দিষ্ট লগ্নেই সম্পন্ন হয়েছিল, পরে জানতে পেরেছিলাম।

সবিতার ফুসফুস নিঙড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

আমি বাড়ি ছাড়া হলুম। ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে জীবন আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একদিন সৌভাগ্যবশতঃ এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি অকৃতদার ছিলেন। ছোট্ট একটি আপিসে কেরানির চাকরি করতেন। লোকমুখে আমার বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। আমার দুরবস্থার কথা শুনে ওনার দয়া হ'ল। একথা-সেকথার পর তিনি আচমকা আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, তারক, ভবঘুরের মত কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

আমি হতাশ দৃষ্টিতে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, দাদা, অদৃষ্টকে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ যতই হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করুক না কেন তিন-আঙুল কপালটুকুতে জন্ম লগ্নে যা লেখা হয়ে গেছে তা হাসিমুখে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যান্তরই বা কি ?

বাজে কথা। আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করি না। দুর্বলচেতারাই বর্তমানকে হেলায় ভবিতব্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ-উন্নতির দ্বার নিজে হাতে রুদ্ধ করে দেয়।

তাই যদি হয় তবে আমার জীবনে এমন অঘটন ঘটলো কেন, বলতে পারেন ?

হাঁ, ব্যাপারটিকে অঘটন বলতে আমিও কুণ্ঠিত নই তারক। তোমার বাবার শেষ জীবনে যে এমন পদস্খলন ঘটবে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

মা মারা যাবার পর আমি যে বাবার মুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রধানতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম তা ওনার প্রতিটা মুহূর্তের আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতো। আমার প্রতি কটু কথাও কম ব্যবহার করতেন না। অনন্যোপায় হয়ে সবই আমাকে মুখ বুজে হজম করতে হোতো।

সে-সব কথা থাক তারক। এখন কি চিন্তা করছো, খড়কুটোর মত ভেসে ভেসেই বেড়াবে ?

জোয়ারের জলে গা-ভাসিয়ে দিয়েছি। আমার অদৃষ্টে কোথায় নিয়ে দাঁড় করায় দেখা ছাড়া গত্যান্তরও তো দেখছিনে।

আমার সঙ্গে চল। যাবে তারক ?

কোথায় ?

আমার মেসে, যাবে ?

তারপর ?

আমার তিন কূলে কেউ নেই, জানই তো ? কারো প্রতি কর্তব্যও নেই। আবার দুর্দিনে হাত পাতার মত অবলম্বনও কিছু নেই। পরস্পর শুনেছি, পড়াশোনার প্রতি তোমার খুবই আগ্রহ। অনাদরে অবহেলায় তোমার প্রতিভা এমনি করে শুকিয়ে যাক, আমি চাই না। মৃত্যুর আগে এটুকু অন্ততঃ মনকে প্রবোধ দিতে পারব, একজনের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পেরেছি।

ওনার কথায় আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলাম। দ্বিরুক্তি মাত্র করলুম না। উনি আমার হাত ধরে ওনার মেসে নিয়ে গেলেন। কিছু-দিনের মধ্যে মেস ছেড়ে ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া করে আমরা মেস ছেড়ে দিলাম। সকালে উনি নিজেহাতে রান্না করতেন। আর আমি সন্ধ্যার আগে রান্না সেরে বই-খাতা নিয়ে বসতুম। এভাবে বি. এ. পরীক্ষা দিলুম। এম এ. পরীক্ষা শেষ হবার পর মাত্র কয়দিনের মধ্যেই সামান্য রোগভোগের পর আমার সেই পরম হিতাকাঙ্খী আত্মীয়-ভদ্রলোকও পর পাড়ে পাড়ি দিলেন। আমি আবার অবলম্বনহীন হয়ে পড়লুম। শুরু হোলো নতুন করে ছন্নছাড়া-জীবন।

সবিতা কয়েক মুহূর্ত নীরব চাহনি মেলিয়া তারকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারক ম্লান হাসিয়া হাতের খালি বাটিটি পাশের টেবিলে রাখিতে রাখিতে ম্লান হাসিয়া বলিল, নতুন-মা, আমার ছন্নছাড়া জীবনের কয়েক টুকরো তুলে ধরে তোমার এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা বিষিয়ে তুললুম।

সবিতা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রান্না ঘরের উদ্দেশে পা বাড়াইলেন। তারক আবার পরীক্ষার খাতায় মুখ গুঁজিল।

রাত্রে তারককে খাইতে দিয়া সবিতা অন্যদিনের মতই তাহার পাশে বসিয়া রহিলেন। এক সময় তিনি বলিলেন, তারক, কয়দিন ধরেই তোমাকে একটি কথা বলব ভাবছি, কিন্তু—

তারক ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টানিয়া সবিতার দিকে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

সবিতা বলিলেন, হ্যাঁ, বাবা তারক, কিন্তু কথাটা আর বলা হয়ে উঠচে না।

কি ? কি কথা নতুন-মা ?

যদি কিছু মনে না করো একটা কথা বলি।

মা ছেলের কাছে মনের কথা বলবেন তাতে এত দ্বিধা-সংকোচের কি থাকতে পারে, বুঝছি না তো।

সবিতা তবুও সসংকোচে কথাটি ছুঁড়িয়া দিলেন, বৃন্দাবন বাবু বলছিলেন—

তারক অতর্কিতে মুখের কাছ হইতে হাতটি নামাইয়া লইয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, কি ? কি বলছিলেন উনি ? তোমার বিয়ের কথা। বয়স হয়েচে, আর কতদিন এমনি ছন্নাছাড়ার মত জীবন কাটাবে ?

তাই বুঝি ? শুনে তুমি কি বল্‌লে ?

বিয়ে থা করে ঘর-সংসার পেতে থিতু হওয়া—

এ-তো বৃন্দাবনবাবুর স্ত্রীর কথা। তোমার কি মত নতুন-মা ? আমার মনে কথা কি মুখ ফুটে বলা দরকার বাবা ? সব মা-ই চায় তার ছেলে বিয়ে-থা করে সংসার পাতুক।

আমি বিয়ে করে সংসার পাতলে তুমি খুশী হবে নতুন মা ? সে-কথা কি মুখ ফুটে বলার অপেক্ষা রাখে তারক ? কিন্তু মেয়ে কোথায় ? কোন্ মেয়ে আমার মত ছন্নছাড়া এক স্কুল-শিক্ষকের ঘর করতে আসতে রাজী হবে, ভাববার বিষয় বটে।

সে ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও, দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তুমি শুধুমা নির্দ্বিধায় বল, বিয়েতে তোমার অমত নেই।

তবুও তো একটা প্রশ্ন থেকে যায় নতুন-মা যে-মেয়েকে বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে আসবে সে আবার আমার মত ছন্নছাড়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে, কিনা ?

সবিতা দেখিলেন, মনের কথা ব্যক্ত করিবার অপূর্ব সুযোগ হাতের মুঠোয়। কিন্তু কথাটিকে তারক কিভাবে লইবে ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সবিতার আকস্মিক নীরবতা লক্ষ্য করিয়া তারক মুচকি হাসিয়া বলিল, নতুন-মা তোমাকে আমি নিজের মা বলেই জানি। আর আমি মনে করি, মা ছেলের মধ্যে কোন লুকোচুরি বাঞ্ছনীয় নয়। যদি অভয় দাও আমার মনের কথা তোমার কাছে খোলাখুলি ব্যক্ত করি। রেণুর মত সহজ-সরল নিরীহ-নম্র স্বভাবা কোন মেয়ে ছাড়া অন্য কোন মেয়ে—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা অত্যুৎসাহী হইয়া বলিলেন, আমার রেণুকে তোমার পছন্দ বাবা ?

অপছন্দের কিছুই তো দেখি নে নতুন-মা। লজ্জা ত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্কোচে তার মনের ভাব ব্যক্ত করিল, অবশ্য তোমার যদি অমত না থাকে।

তোমার মত পাত্রের হাতে রেণুকে তুলে দিতে পারলে কোন্ মা খুশী না হ তারক ?

তারপরও কথা থেকে যায়। রেণুর মতামতেরও মূল্য রয়েছে। কাকাবাবু রাজ হবেন কিনা—

তারকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা বলিলেন, এসব ব্যাপার তুমি আমা ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার বাবা।

সবিতা যে-কথা বলিতে কলিকাতা হইতে সুদূর হারণপুর গ্রামে ছুটিয়া আসিয়াছে তাহাই তারকের মুখে শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইলেন। কয়েকদি ধরিয়া নিদারুণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাইতে ছিলেন তিনি। প্রসঙ্গটি কিভাবে উত্থাপ করিবেন, তারকের নিকট আদৌ বলিতে পারিবেন কিনা, ইহাতেও কম দ্বিধা ছিল না শেষ পর্যন্ত বলিয়া ফেলিলেও তারক ব্যাপারটিকে কিভাবে গ্রহণ করিবে ইহা লইয়া কম ভাবিত ছিলেন না তিনি। তারকই তাঁহাকে সংকটমুক্ত করিয়াছে। রেণুর প্র

তাহার দুর্বলতার কথা উত্থাপন করিয়া সবিতাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছে।

বৈকালে সবিতা মহাভারত লইয়া বসিলেন। শ্রোতা অমলের মা।

এমন সময় বৃন্দাবনবাবুর স্ত্রী আসিলেন। সবিতা স্বভাব-সুলভ মিষ্টি হাসিয়া তাহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। উঠিয়া ঘর হইতে পানের বাটা আনিয়া পান বানাইলেন। বৃন্দাবনবাবুর স্ত্রীকে একটি দিলেন, নিজেও একটি মুখে দিলেন।

তারকের স্কুল হইতে ফিরিতে আজ একটু দেরী হইবে। স্কুল ছুটির পর হাটে যাইবে। সপ্তাহে একদিন মাত্র হাট বসে। সেইদিনই সারা সপ্তাহের আনাজপাতি ও প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সবই এক সপ্তাহের জন্য কিনিয়া রাখিতে হয়।

সবিতা মহাভারত পাঠে মন দিলেন। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত জরৎকারু মুনির পত্নীত্যাগের কাহিনী খুলিলেন। সবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন—

"বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যাজিলাম তোমারে যে জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি আশ্বাসিয়া নিজ বনিতায়।
গৃহত্যাজি পুনঃ মুনি যান তপস্যায়॥
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ-বাক্য অন্তরেতে গণি।
মুনিবরে কিছু আর না কহে নাগিনী॥"

পাঠ শেষ করিয়া সবিতা পঠিত অধ্যায়টি সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করতে লাগলেন—

প্রবল প্রতাপশালী জরৎকারু মুনি। একাধারে যেমন অনন্য সাধারণ জ্ঞানের আধার আবার ক্ষুব্ধ হলে মুনিবরের চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকড়ে বেরতো। কার সাধ্য ক্রোধোন্মও মুনিকে শান্ত করে। এহেন জরৎকারু মুনির সঙ্গে সর্পরাজ বাসুকি নিজ ভগ্নীকে সম্প্রদান করলেন। যুবতী জরৎকারী ছিলেন যথার্থই রূপে-গুণে অনন্যা। উদ্ভিন্ন যৌবনা জরৎকারী তাঁর রূপ-গুণের মাধ্যমে মুনিবর জরৎকারুর মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে, তাঁর প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন বলে মনে হ'ল না। কারণ, মুনিবর আগের মতই বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘর-সংসার ও পত্নীর প্রতি তাঁর সামান্যতম আকর্ষণ আছে বলেও মনে হ'ল না। জরৎকারী বিষন্ন মনে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। বিয়ের পর বারমুখী পুরুষরাও ঘরমুখী হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অন্তরের অন্তঃস্থল বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠারই কথা।

এক সকালে বাসুকি তাঁর ভগ্নী জরৎকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বল ত মুনি তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করেন? তোমার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করছেন কি? সত্য করে বল ত তোমার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা আছে ত?

বড় ভাইয়ের কথায় জরৎকারী মৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাসুকির মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগল, তিনি এবার বললেন, চুপ করে রইলে কেন বোন!

বল, মুনিবর তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করেন? তিনি কি তোমার প্রতি পতির কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করছেন না?

জরৎকারীর পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হ'ল না। বড়-ভাইয়ের দ্বারা বার বার জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি নীরবতা ভঙ্গ করলেন, তুমি কার কাছে আমাকে সম্প্রদান করেছ? আমার স্বামী-দেবতার দর্শনলাভই দেখছি দেবের ব্যাপার। তিনি যে সারাদিন কোথায় থাকেন, কি করেন তা আমি কেন, ওনারও হয়ত জানা নেই।

অত্যুগ্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বাসুকি বললেন সে কী কথা বোন! মুনিরাজ স্বামীর কর্তব্য পালন করছেন না!

ম্লান হেসে জরৎকারী বললেন, সত্য বলছি। মুনিবরের দর্শন পাওয়াই ভার। তিনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন, কি-ই বা করেন তা আমার ধ্যান-ধারণার বাইরে। আমাকে বিষণ্ণ মনে একাই কুটীরের কোণে কাটাতে হয়। ওনার কাছে যে দুটো মনের কথা বলব সে-সৌভাগ্য থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাসুকি বললেন, একী কথা বলছো, আমি যে বিশ্বাস করতেও উৎসাহ পাচ্ছিনে!

হতাশাজর্জরিতা জরৎকারী বললেন যা সত্য ব্যক্ত করলুম। এখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার তোমার ওপর নির্ভর করছে।

জরৎকারীর কথায় বাসুকির মনে ক্ষোভের সঞ্চার হ'ল। তিনি মুনিবর জরৎকারুর খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গভীর বনে ওঁর দর্শন পেলেন। ক্রোধোন্মত্ত বাসুকি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বললেন, মুনিবর শুনুন, অনেক সাধ করে আমার বোনকে আপনার হাতে সম্প্রদান করলুম। অনেক যত্নে যথা সময়ে ওকে আপনার হাতে তুলে দেব বলে বহু যত্নে লালন পালন করেছিলাম। তারপর প্রভূত জাঁকজমকের সঙ্গে ওঁকে শুভক্ষণে আপনার হাতে সম্প্রদান করলুম। আপনার জন্য রক্ষিত সম্পদ আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু আপনার একী অদ্ভুত আচরণ! আপনি ত স্বামীর কর্তব্য পালন না করে ওর প্রতি অবিচারই করছেন। আপনার নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ আমার বোনের মনে হতাশায় সঞ্চার করেছে।

তপস্যারত মুনি চোখ মেলে তাকালেন। বাসুকির প্রশ্নের উত্তরে ম্লান হেসে বললেন, কেন মিছে ক্রোধ প্রকাশ করছ!

বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমার আদৌ বিয়েতে ইচ্ছে ছিলো না। পিতৃ-পুরুষদের দুঃখে বাধ্য হয়ে বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলুম। চার-দেয়ালে ঘেরা ঘরে বন্দী থাকতে এতটুকুও ইচ্ছে করে না।

ক্রোধোন্মত্ত বাসুকি বিস্ময়ভরা চোখে মুনির দিকে তাকালেন।

মুনি বলে চললেন, কারো কথা আমার সহ্য হয় না। তাই ও লোকালয় থেকে দূরে গভীর বনের প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশী। আমাকে যদি ঘরে বন্দী করতে চাও, তোমার বোনের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আমার কাছে কোনদিন কোন কথা বলতে পারবে না।

যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তবে আমি আবার বনে বনে ঘুরে বেড়াব। চার দেয়ালে ঘেরা ঘরে আর কোনদিনই ফিরবো না।

মুনির কথায় বাসুকি বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে ঘরে ফিরে চলুন। আমার বোন আপনার অদর্শনে বড়ই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করছেন। আমি কথা দিচ্ছি, ও কোনদিন কোন প্রসঙ্গই আপনার কাছে উত্থাপন করবে না। আপনার কাছে অপ্রীতিকর এমন আচরণ ভুলেও সে করবে না। আর যদি কোনদিন কোনক্রমে আপনার সঙ্গে অপ্রিয় আচরণ করে তবে সেদিন না হয় গৃহত্যাগ করবেন। আমিও কোনদিন আপনাকে আমার বোনের কাছে যাবার জন্য অনুরোধ করবো না, কথা দিলুম।

বাসুকির কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুনিবর জরৎকারু ঘরে ফিরতে সম্মত হলেন। ভগ্নীপতির সম্মতি পেয়ে বাসুকি তাড়াতাড়ি লোকজন লাগিয়ে সুন্দর একটি কুটীর নির্মাণ করলেন। সৌখীন ও মূল্যবান আসবাবপত্রে ঘর সাজিয়ে দিলেন। জরৎকারু মুণি পত্নীকে নিয়ে মনের সুখে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। মুণির ঔরসে ওঁর ধর্মপত্নী জরৎকারী গর্ভবতী হলেন। নাগিনীর গর্ভের সন্তান চন্দ্রকলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মুনির প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রেখে মুণিপত্নী জরৎকারী সর্বদা কাছে কাছে অবস্থান করে তাঁর সেবায় নিযুক্ত রইলেন। জরৎকারু মুনি যখন যে আজ্ঞা করেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। একদা দিনের শেষে দেখা গেল মুনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য প্রায়। নাগিনী জরৎকারী ভাবলেন, একী প্রমাদ ঘটতে চলেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তবু স্বামী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এদিকে সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কি যে করি! যদি এখন ওঁকে ডেকে না দেই তবে জেগে উঠে আমার প্রতি রোষ প্রকাশ করবেন। আবার ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেও নিদারুণ ক্রোধে ফেটে পড়ার সম্ভাবনা। এযে উভয় সংকটে পড়া গেল! এখন উপায় কি? শেষ পর্যন্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিনি মনস্থির করেই ফেললেন, অদৃষ্টে যা আছে পরে চিন্তা করা যাবে। আমার স্বামী-দেবতা সন্ধ্যা ধর্ম থেকে চ্যুত হলে ওঁর পক্ষে সেটি হবে অধার্মিকের কাজ। যে-ব্রাহ্মণ অবজ্ঞাভরে নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না তাঁর দেহে পঞ্চ মহাপাপ ভর করে। এরকম চিন্তা করে অমঙ্গল আশংকায় জরৎকারী ঘুমন্ত স্বামীকে অলতোভাবে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করতে গিয়ে বললেন, সন্ধ্যা বয়ে যাচ্ছে, রাত্রির অন্ধকার নেমে এল যে! ওঠো সন্ধ্যাআহ্নিক করতে হবে না! নিদ্রাভঙ্গ জনিত কারণে মুনির মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলো। চাপা ক্রোধে ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপতে লাগলো। ক্রোধোন্মত্ত মুণি আক্রোশে গর্জে উঠলেন, অহংকার বসে তুমি আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে! এত স্পর্ধা তোমার! অহংকারে তুমি ধরাকে সরাজ্ঞান করছো! আমাকে তমান্য করার অপরাধে তোমায় পরিত্যাগ করলুম। কোনদিন তোমার মুখ দর্শন করবো না।

ভীত-সন্ত্রস্তা জরৎকারী করজোড়ে নিবেদন করলেন, অপরাধ নিয়ো না প্রভু! তুমি অহেতুক আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করছো। অনুগ্রহ করে ক্রোধ সংবরণ করো। ধৈর্য ধরো। ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথা শোন। তার পরও যদি আমাকে অপরাধী জ্ঞান

করো তখন যে শাস্তি আরোপ করবে, মাথা পেতে নেব। সন্ধ্যা বয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আতংকিত হয়ে পড়েছিলুম। যথা সময়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক সম্পন্ন না করলে তোমার পঞ্চ মহাপাপের সঞ্চার হবে আশংকা করেই আমাকে অনিচ্ছা সত্বেও তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করতে হয়েছে। সূর্য অস্তাবলে গমন করলে সন্ধ্যাহীনে যে পাপের সঞ্চার হয় তা-ত তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। তোমাকে মহাপাপের হাত থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য যদি আমি সত্যই অপারাধী হয়ে থাকি তবে তুমি যে-শাস্তি আমাকে দেবে, মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠিত হব না প্রভু।

জারৎকারী কথা শুনে মণিবর অধিকতর ক্রোধ প্রকাশ করে বল্‌লেন, এতদিনে আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা হলো? আমার তপস্যাবল, আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে তুমি এমন ধারণা পাষণ করছো, জানা ছিলো না। আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক না করার আগেই সন্ধ্যা বয়ে যাবে, সাধ্য কি? কথা বলতে বলতে ক্রোধ ও অপমানে জারৎকারু মুণির চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি ঔত্তেজনায় ফেঁটে পড়লেন, ওরে সন্ধ্যা, তোর এত স্পর্ধা! তোর অহংকার দেখে আমি অবাক মানছি! এ তোর কেমন বিচার! আমাকে না বলে তুই বয়ে যাচ্ছিস যে বড়!

সন্ধ্যা ভয়ে মুষড়ে পড়ে বল্‌লে, মুনিরাজ, মিছে কেন আমার প্রতি রুষ্ট হচ্ছেন! আপনাকে অগ্রাহ্য করে আমি বয়ে যাচ্ছি, এমন অসত্য বচন কে বলেছে। এই ত আমি আপনার দুয়ারে অবস্থান করছি। এই দেখুন আপনার অনুমতি পেলে তবেই আমি যাত্রা করবো।

মুণিরাজ জারৎকারু এবার নিজ পত্নীর দিকে ফিরে বল্‌লেন নাগিনী, কি শুনলে? সন্ধ্যা মোটেই আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নি। দেখছই ত। সন্ধ্যা আমার আদেশের অপেক্ষায় কেমন দুয়ারে অপেক্ষা করছে? আমাকে সামান্যজ্ঞানে তুমি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে! তোমার কৃত কর্মের জন্য শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। আমি তোমাকে ত্যাগ করে বনে চল্‌লুম। আর কোনদিন তোমার মুখ দর্শন করবো না।

স্বামীর কঠিন-কঠোর মনোভাব দেখে অভাগিনী জারৎকারী তার চরণ জড়িয়ে ধরে কেঁদে-কেঁদে আকুল হলেন। কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন, প্রভু, না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছি। আমার প্রতি এমন কঠোর হোয়ো না। সদয় হও। দয়া করে এবারের মত ক্ষমা করে দাও। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন এ-ধরণের অপরাধ করবো না। আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে আমার দাদা হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়বেন। বড় আশা করে তোমার হাতে আমায় সম্প্রদান করেছেন। মাতৃশাপে ওঁর মনে বড় ভয় ছিলো। তোমার হাতে আমায় অর্পণ করে সে-সংশয় থেকে মুক্ত হয়েছেন। তোমার ঔরসে, আমার গর্ভে যে-সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, তার দ্বারাই আমার ভাইরা রক্ষা পাবে। কিন্তু প্রভু, বংশধর জন্মগ্রহণ করার আগেই যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছ! তবে ওদের কি গতি হবে? কি বা আমি ওদের প্রবোধ দেব? তুমি যদি আমায় পরিত্যাগ করে বনে গমন কর তবে জেনো, আত্মহননের মাধ্যমে আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবো। তোমার অদর্শনে

আমার পক্ষে জীবন ধারণ কখনই সম্ভব নয় প্রভু। পত্নীর কথায় মুনিরাজ জারৎকারু'র ক্রোধ প্রশমিত হলো। তিনি আশ্বাস দিয়ে ওঁর উদরে হাত রাখলেন। 'অস্তি অস্তি' বলে উদরে হাত বুলাতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, তোমার গর্ভে নাগ-কুলরাজ জন্মগ্রহণ করবে। সেই পুরুষ-রতন এই গর্ভে অবস্থান করচে। সে-ই তোমার ও আমার বংশ রক্ষা করবে। প্রিয়তমে, মিছে দুঃখ কোরো না। ভাইদের কাছে ফিরে যাও। তাদের প্রবোধ দাও। তারা যেন হতাশায় ভেঙে না পড়ে। আমার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাদের বলবে। আমার কথা কিছুতেই মিথ্যে হবে না জেনো। আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে অবশ্যই তোমায় ত্যাগ করে বনে যেতে হবে, দুঃখ কোরো না। এই আশ্বাস দিয়া মুনিরাজ জারৎকারু ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে বনে গমন করলেন। ব্রাহ্মণ বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হবার নয় জেনে জারৎকারী আর মিছে স্বামীর পথরোধ করার চেষ্টা করলেন না। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসকে স্বাভাবিক বলেই মাথা পেতে নিলেন। সবিতা পাঠ শেষ করিয়া মহাভারতটি কপালে ঠেকাইয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিলেন।

পরদিন বৈকালে সবিতা তারকের প্রত্যাগমনের জন্য পথ চাহিয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিলেন। অমলের মা ঘাটে গিয়াছে। বাসনকোসন মাজিতে গিয়াছে। সেই কখন গিয়া বসিয়াছে, ফিরিবার নামটি নাই। তাহার এই স্বভাব সবিতা আসিয়া অবধি দেখিতেছেন। ঘাটে গিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিবে। একে ওকে ডাকিয়া কথা বলিবে, অপ্রয়োজনীয় গল্প ফাঁদিবে। পরনিন্দা পরচর্চা তাহার মজ্জাগত স্বভাব। সবিতা একাধিক দিন তাহার এই বিশেষ কু-অভ্যাসটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। পরনিন্দা পরচর্চা যাহার অস্থি মাংস মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, অত সহজে দূর করে সাধ্য কাহার!

তারক স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল সবিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া গামছা আনিয়া দিলেন। সবিতার মুখে একটু আগেও সে উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটিয়া ছিল এখন সেই স্থলে অনাবিল আনন্দের ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। তারক আর জামা-কাপড় পরিবর্তন করিল না। পূর্বেই কথা ছিলো স্কুল হইতে ফিরিয়াই নতুন-মা'কে লইয়া তার সহকর্মী সত্যব্রতবাবুর বাড়ি যাইবে। সামান্য কিছু জলযোগ সারিতে যেটুকু সময় লাগে। বাড়ি ফিরিয়া সবিতা আবার রাত্রের রান্না করিবেন। তারক অবশ্য প্রস্তাব দিয়া ছিলো অমলের মা রাত্রের মত সামান্য কিছু রান্না করিয়া রাখিবে। সবিতা ইহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েদের অমন একটু আধটু ধকল সইতেই হয়। তারক আর, কথা বাড়ায় নাই।

সবিতা একটি কাঁসার জামবাটিতে কিছু দুধ চিঁড়া ও মর্তমান কলা লইয়া আসিলেন। তারক জলযোগ সারিতে সারিতে সবিতা ইতাবসরে সত্যব্রতবাবুর বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন।

গৃহকর্তা সত্যব্রতবাবু তাহাদের পথ চাহিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিলেন। তাঁহারা

উঠানে পা দিতেই তিনি ব্যস্ত-পায়ে নামিয়া সবিতাকে প্রণাম প্রার্থনাসহ বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলেন। সত্যব্রতবাবুর স্ত্রী হাতের কাজ ফেলিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিয়া সবিতাকে সভক্তি প্রণাম করিয়া আসন পাতিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। সবিতা ডান হাতটি সত্যব্রতবাবুর স্ত্রীর মস্তকে স্থাপন করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন, পাকা চুলে সিঁদুর পোড়ো মা! চিরসুখী হও।

সত্যব্রতবাবু কথা প্রসঙ্গে সবিতাকে বলিলেন, মাসীমা, তারকবাবুর বিয়ের কথা কিছু ভাবলেন। আর কতদিন হাতপুড়িয়ে স্বপাক আহার করবেন? যা হোক ব্যবস্থা কিছু করুন।

সবিতা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, যদিও মা বাবার কর্তব্য ছেলের বিয়ে দিয়ে ফুটফুটে একটি লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে নিয়ে আসা কিন্তু এতে বন্ধু ও হিতাকাঙ্খীদের দায়িত্বও কিন্তু কম নয় বাবা। তোমরা তারকের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী। তোমরা দেখে-শুনে পাত্রী পছন্দ করলে আসরে আর অমতের কি থাকতে পারে।

কিন্তু তারক যে অন্য কথা বলে!

কি? কি বলেচে তারক?

বলে, নতুন-মা যা করবেন, যে মেয়েকে হাতে তুলে দেবেন তাকে নিয়েই ঘর বাঁধতে হবে।

তাই বুঝি? তবে তো আমাকেই এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে সবিতা সত্যব্রতবাবুর কাছে রেণুর কথা উত্থাপন করিলেন। সত্যব্রতবাবু সোল্লাসে তাঁহার প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানাইলেন।

সত্যব্রতবাবুর স্ত্রী জলখাবার তৈয়ারী করিয়া আনিলেন। তাহাদের বাড়িতে পানের আয়োজন নাই। অতিথি আপ্যায়নের জন্য পাশের বাড়ি হইতে একখিলি পান সাজিয়া আনিয়া সবিতাকে দিলেন। তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া সবিতার জন্য সত্যব্রতবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া তিনি বড়ই সংকোচ বোধ করিতে লাগিলেন।

কথাবার্তা গল্পগুজবে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তারক বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিল। সবিতাও কালবিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যব্রতবাবু সদর রাস্তা পর্যন্ত তাঁহাদের আগাইয়া দিয়া গেলেন।

পথ চলিতে চলিতে সবিতা অকস্মাৎ কেমন গম্ভীর হইয়া গেলেন। সত্যব্রতবাবুর বাড়িতে যতক্ষণ ছিলেন, তাঁহার মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্যের অভাবই লক্ষিত হইয়াছে। যাহা কিছু করিয়াছেন, যেইসব কথাবার্তা বলিয়াছেন, সবই যেন যন্ত্রচালিতের মতই মনে হইয়াছে। গৃহকর্তা সত্যব্রতবাবু ও তাঁর স্ত্রী কতটুকু কি বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। কিন্তু তাহার মনের গোপন কন্দরে যে, অস্বস্তির ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, তারকের চোখকে অন্ততঃ ফাঁকি দিতে পারেন নাই।

সকাল হইতেই তাঁহাকে কেমন অন্যমনস্ক কেমন যেমন ম্রিয়মাণ বলিয়া মনে হইয়াছে। দীর্ঘদিন হইল তিনি হরিণপুরে আসিয়াছেন, কিন্তু ব্রজবাবু বা রেণুর কাছ থেকে একটিও চিঠি আসে নাই। ব্রজবাবুর কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। কিন্তু রেণু তো

তাঁহাকে কথা দিয়াছিল, চিঠি দিবে।

ব্রজবাবু রেণুকে লইয়া গ্রামের বাড়িতে গিয়াছেন, সবিতা দেখিয়া আসিয়াছেন. গ্রামের বাড়ির ঠিকানা যে তাঁহার জানা নেই তাহাও নহে। তাঁহার পক্ষে সেই ঠিকানা অনুযায়ী চিঠি দিবার সমস্যা যথেষ্টই রহিয়াছে। গ্রামে যাইয়া ব্রজবাবুর ও রেণু অবণীবাবুর নিকট কি রকম সমাদর পাইয়াছেন, কম ভাবনার নয়। সমাজপতিদের ব্যাপার তো রহিয়াই গেল। সব কিছু না জানিয়া গ্রামের বাড়িতে চিঠি দেয়া সমীচিন নয় বোধ করিয়াই সেই কাজে বিরত ছিলেন।

অধিকতর আশ্চর্যের ব্যাপার যে রাখালকে সবিতা প্রাণাধিক স্নেহ করেন, তাহার নিকট হইতেও দীর্ঘ পনের দিনে কোন চিঠি আসিল না। তাহার চরমতম দুঃসময়ে তাহাকে আস্তাকুড় হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজের সন্তানের চেয়েও অধিক স্নেহ—ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছেন। যাহাকে লালন পালন করিয়া এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে সামান্যতম অবজ্ঞাও আজ তাঁহার কাছে অসহনীয়। কথায় আছে, গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা অপরের সন্তানের জন্য জবালা যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ অধিকই হইয়া থাকে। সবিতার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব মুহূর্তে সারদা ও রাখালের কথোপকথনের কয়েকটি ছত্র আজ বেশী করিয়া তাঁহার মনের গভীরে পাক খাইতেছে।

সবিতা ভাবিলেন, রাজু হয়তো তারকের প্রতি ঈর্ষাবশতঃই এমন একটি অভাবনীয় কান্ড করিয়া বসিয়াছে। তাহার মনে এই আশঙ্কাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার নতুন-মা বুঝি বা ইদানিং রাজুর অপেক্ষা তারককেই অধিক স্নেহ-ভালবাসা প্রদান করিতেছেন। ভালবাসার ধর্মই এই, ভালবাসার পাত্র যদি অন্য কাহারো প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তবে তাহার নিকট মন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। নিজেকে বড় বঞ্চিত, বড় হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। সেই মুহূর্তে পাইবার আগ্রহ অপেক্ষা হারাইবার আশঙ্কাই তাহার নিকট বড় হইয়া দেখা দেয়। ইদানিং তারকের আচরণকে রাখাল মোটেই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছে না। তারক তাহার সংস্রব এড়াইয়া চলিতেই আগ্রহী, রাখাল ইহার একাধিকবার প্রমাণ পাইয়াছে। সবিতাকে হরিণপুরে লইয়া আসিবার ব্যাপারে তারক পর পর কয়েকবারই হরিণপুরে গিয়াছে। কিন্তু কই, সে-তো ভুলেও রাখালের সহিত দেখা করে নাই এই ব্যাপারে তাহার পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন না-ও থাকিতে পারে সত্য। কিন্তু তাহাকে জানাইতে বাধা কোথায় ছিল। রাখাল কি ইহাতে আপত্তি করিত? তারক যদি এই রকম আশঙ্কাই করিয়া থাকে তবে খুবই ভুল করিয়াছে। শুধুমাত্র ভুলই নয়, অবিচারই করিয়াছে।

সবিতাকে নীরব দেখিয়া তারক কৌতুহলপন্ন হইয়া বলিল, কি হ'ল নতুন-মা একেবারে চুপ করে গেলেন যে?

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কই, না-তো?

সত্যব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরোবার টু-শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। এতক্ষণ আপনাকে মুখবুজে থাকতে সচরাচর দেখা যায় না তো, তাই বললাম। কলকাতায়

কথা মনে পড়ছে বুঝি ?

সবিতা অকস্মাৎ যেন কেমন অধিকতর অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। পরমুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, তারক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবে না তো বাবা ?

মা ছেলের কাছে সব কথাই বলতে পারেন। এতে সামান্যতম দ্বিধা দ্বন্দ্বের স্থান তো থাকার কথা নয়।

আচ্ছা, রাজুর সঙ্গে তোমার কিছু হয়েছে বাবা ?

তারক যেন আচমকা এক হোঁচট খাইল। মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া বলিল, হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেন নতুন-মা ? রাজু কি কিছু বলেছে ?

না। তবু যেন হঠাৎ কথাটা মনে হ'ল।

এ-তো হঠাৎ মনে পড়ার কথা নয় নতুন-মা। আপনার দীর্ঘ ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এ-কথার মধ্য দিয়ে. আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার কাছে খুলে বলুন নতুন-মা। আমাদের মধ্যে এমন কি আভাষ পেয়েছেন যার ফলে এমন কথা বলতে পারছেন ?

না, তেমন কিছু নয়।

তবু ?

আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, কলকাতায় গেলে ইদানিং তুমি রাজুর সঙ্গে দেখা না করেই হরিণপুরে ফিরে আসো। রাজুও ব্যাপারটিকে স্বাভাবিকভাবে বলতে পারে নি। তার কথায় বুঝেছি, এতে সে খুবই আঘাত পেয়েছে।

আপনি বিশ্বাস করুন নতুন-মা—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা বলিলেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি যায়-আসে বাবা। আমি শুধুমাত্র এটুকুই আশা করি, তোমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন, তোমাদের হৃদ্যতা আগের মতই অক্ষুণ্ণ থাক। তোমার প্রতি তার ভ্রান্ত ধারণাটুকুর জন্যই রাজু আমার এই হরিণপুরে আসার ব্যাপারটাকেও সহজভাবে নিতে পারে নি।

রাখাল কি এই ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছে নতুন-মা ?

আমার রাজু সেই ধাতের ছেলেই নয় তারক। ভেতরে ভেতরে গুমড়ে মরবে তবু মুখ ফুটে কিছু বলবে না। এক ধরনের মানুষ রয়েছে যারা মনের ব্যথা-বেদনা গোপন রেখে নিজে কষ্ট পাবে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে অন্যের অশান্তি বাড়াতে চায় না।

রাখালের ওপর কোন অভিমান আমি অন্তরে পোষণ করছি, বা তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি, এইরকম কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সে যদি অভিমান করে বসে থাকে তবে কিন্তু আমার ওপর অবিচারই করা হবে নতুন-মা। আপনি এতদিন এখানে কাটিয়ে গেলেন। এইটুকু অন্ততঃ বুঝে গেলেন প্রধান শিক্ষকের কাজটি হাতে নেয়ার পর থেকে আমাকে কতখানি ব্যস্ততার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

বললামই তো তারক, আমার মনে তোমার প্রতি যে-ভ্রান্ত ধারণা এতদিন ছিল, এইখানে আসার পর সেইটুকু অন্ততঃ ঘুচে গেছে।

তবে ? তবে কি করে আমাকে দোষারোপ করবেন, বলুন, নতুন-মা।

বল্‌লামই তো আজ বুঝতে পারছি কিছুদিন যাবৎ তুমি কেন আমার ওখানে দুই দণ্ড কাটাতে পারনি, কেনই বা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রাখালের সঙ্গে দেখা না করেই চলে আসতে। তবু আমি বলবো, তুমি আগ্রহান্বিত হয়ে রাখালের সঙ্গে দেখা করে তার ভুল ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো।

রাখাল ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইল।

সবিতা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, রেণুর সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে তুমি কি রাজুর সম্বন্ধে অন্য কোনরকম আশংকা করচো তারক।

তারক নীরবে অবনত মস্তকে পথ চলিতে লাগিল।

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তুমি রাজুকে ভুল বুঝেচো বাবা। হা, অবশাই ভুল বুঝেচো। ওকে আজও তুমি চিনতে পার নি। রাজু ওকে নিজের বোনের মত ভালবাসে। তুমি আমার কথা মিলিয়ে নিয়ো, তুমি স্বেচ্ছায় রেণুকে বিয়ে করতে চেয়েচো জানতে পারলে রাজু কিন্তু খুবই আহ্লাদিত হবে। ছুটে এসে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে। আমার আন্তরিক বিশ্বাস রেণুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার সংবাদ পেয়ে ও খুশী না হয়ে পারবে না।

তারক তেমনি নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

সবিতা বলিয়া চলিলেন, এবার বুঝলুম বাবা, তুমি রাজুকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে মিছেই কষ্ট পাচ্ছ।

তারক বলিল, কথা দিলুম নতুন মা, এবার কলকাতায় গিয়ে রাখালের সঙ্গে দেখা করে ওর অভিমান—

সবিতা তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, হাঁ, তা-ই কোরো বাবা। তোমরা দুইজন মুখ গোমড়া করে দুই জায়গায় পড়ে থাকবে মা হয়ে আমি কি তা সইতে পারি বাবা!

আমি আবারও বলচি নতুন-মা, কলকাতায় গিয়ে আমি অবশ্যই রাখালের বাসায় গিয়ে আমাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আসবো।

হাঁ, তা-ই যেয়ো বাবা।

## আঠার

সবিতা হরিণপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তারক তাহাকে সাথে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহার দীর্ঘ দিন থাকিবার উপায় নাই। ইচ্ছা ছিল, সবিতাকে তাঁহার বাড়িতে রাখিয়াই বৈকালের গাড়িতেই আবার হরিণপুর ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সবিতার নির্দেশে তাহা আর হইয়া উঠিল না। এখানে পৌঁছাইবার পূর্বে তবু ক্ষীণ আশা ছিল। যদি ঘটনাচক্রে সবিতার বাড়িতে রাখালকে পাইয়া যায় তবে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, যদি গাড়ীটি পাইয়া যায়। যেকোন ভাবেই হোক দুই মিনিটের জন্য হইলেও রাখালের সহিত দেখা করিতেই হইবে তাহাকে। বন্ধুবর রাখাল অভিমান করিয়া

বসিয়া আছে।

তাহার এই অভিমানটুকু মোটেই অমূলক নয়। তারকই ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আর তারক তাহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছে তাহাকে অন্য দশজনকে না হয় বুঝাইতে পারিবে। ব্যস্ততার জন্য, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্যই ইদানিং তাহার কলিকাতায় আসিয়া অধিকক্ষণ থাকা, রাখালকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সহিত দেখা করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সে নিজে তো অন্ততঃ জানে, তাহার দুর্বলচেতা মনের জন্যই সে কিছুদিন রাখালের চোখের আড়ালে আড়ালে থাকিতেই বিশেষ আগ্রহী ছিল। তাহার অন্তরের অন্তস্থলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রেণুর প্রতি রাখালের মনে দুর্বলতা রহিয়াছে। ফলে তাহার প্রতি তারকের আগ্রহকে রাখাল কিছুতেই হাসিমুখে মানিয়া লইতে পারিবে না। আর তাহার মনের এই ভ্রান্তিটুকুর জন্যই এই পরমাদ ঘটিয়াছে।

সবিতা বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, সারদা অসুস্থ। শয্যাশায়ী। কয়দিন ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। অন্য এক বৃদ্ধা ভাড়াটিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেছে। আর রাখাল সকাল-সন্ধ্যা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায়। ডাক্তারও সে-ই ডাকিয়া আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। আজও সকালে ডাক্তার আসিয়াছিলেন। বিমলবাবুও মাঝে মধ্যে আসেন। সবিতা সারদার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সারদা বালিশে হেলান দিয়া আধ শোয়া অবস্থায় দরজার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিয়াছে। সবিতাকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া বসিল। সবিতা বিষন্ন মুখে তাহার শয্যার দিকে আগাইয়া গেলেন। কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বর তেমন নাই। সবিতা বলিলেন, জ্বর কতদিন হলো?

সারদা ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, সাত-আটদিন।

সাত-আটদিন ধরে জ্বরে ভুগছো, অথচ আমাকে একটি চিঠি দেয়ার দরকার পর্যন্ত মনে করলে না সারদা। রাজু? রাজু কি করছিল?

রাখালবাবুকে বলেছিলাম, তিনি গা করলেন না। তাছাড়া ডাক্তারবাবু ত বলেইছেন, সামান্য সর্দি জ্বর। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে এমনটা হয়েছে।

কাল? কার কি জ্বর ছিলো?

না নতুন-মা। কাল সকাল থেকেই গা ঠাণ্ডা ছিলো। দুপুরের পর সামান্য গা গরম হয়েছিলো। তবে খুবই সামান্য। এইবার ম্লান হাসিয়া বলিলেন এবারও বেঁচে গেলুম নতুন-মা! বুঝতে পারছি, কর্মফল এখনও—

তাহাকে নামাইয়া দিয়া সবিতা বলিয়া উঠিলেন, চুপ কর। তোমাকে না কতদিন বলেছি, ওসব কথা আমার সামনে বলবে না।

এমন সময় দরজায় বিমলবাবুকে দেখিয়া সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিমলবাবু দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিলেন, কি গো সরদা মা, আজ কেমন আছ?

সারদা মুচকি হাসিয়া বলিল, ভালো। একটা শুভ-সংবাদ দিচ্ছি, আজও গায়ে জ্বর নেই।

তবে ত সত্যই ভালো আছো। যাক, তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।

বিমল বাবু এইবার সবিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেশ-ভ্রমণ সেরে তবে সত্যই ফিরে এলে?

কি ভেবেছিলে দয়াল, হরিণপুরেই আজীবন থেকে যাবো? থাকলেই বা ক্ষতি কি, কি বল? ছেলের কাছে মা থাকবে এটাই ত স্বাভাবিক। যাক, ভেতরে এসে বসবে, নাকি দরজায়ই দাঁড়িয়ে থাকবে?

না, এখন আর বসার অবকাশ নেই নতুন-বৌ। একটা জরুরী কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে তোমার মুখে হরিণপুরের গল্প শুনবো। এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম, সারদা-মা'কে একবারটি দেখে যাই।

ভালই করেছো। মেয়েটা ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে. একটা চিঠি তোমরা কেউ আমায় দিলে না। আর রাজু—

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বিমলবাবু বলিলেন, রাখালবাবু কি আজ এখানে এসেছিলেন?

সারদা বিষন্ন মুখে বলিল, না। অন্য দিন ত অনেক আগেই এসে যান। ক'দিন আমার অসুখের জন্য নিয়মিত হেসে-পড়তে যেতে পারছেন না। তাই আজ সকাল হতেই হয়ত বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিমলবাবু বলিলেন, আমি আসার পথে রাখালবাবুর বাসা হয়ে এসেচি। ঘরে তালা ঝুলছে দেখলুম। পাশের ঘরের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, খুব ভোরে তালা দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

সবিতা বিষন্ন মুখে বিমলবাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে। সারদার মুখেও অকস্মাৎ বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিলো।

বিমলবাবু এইবার সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ব্রজবাবুর খবর কিছু জানো নতুন-বৌ?

না। আমি হরিণপুরে যাবার আগের দিন রেণুকে নিয়ে তিনি দেশের বাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, এটুকুই জানি।

ইতিমধ্যে ওনার বা রেণুর কোন চিঠিও পাওনি?

উনি যে চিঠি দেবেন না এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলুম। কিন্তু রেণু কথা দিয়েছিল, হরিণপুরের ঠিকানায় চিঠি দেবে।

দিয়েছিল?

সবিতা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, উনি বড্ড জেদী, মরে গেলেও কারো কাছে মাথা নত করার লোক নন। কিন্তু রেণুর ওপর অন্য ধারণা ছিলো। ভেবেছিলুম, আমার গর্ভের সন্তান, বাপের চরিত্র পাবে না। এখন দেখছি, রেণু কেবলমাত্র রূপটুকুই আমার পেয়েছে, চরিত্রের দোষগুণ যা কিছু সবই তার বাবার।

শোন নতুন বৌ, কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত রাখালবাবু আমার সঙ্গে ছিলেন।

সবিতা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেন? কোন দুঃসংবাদ? রাজু কি

ওনাদের কোন সংবাদ পেয়েছে দয়াল।

সংবাদ নয় নতুন-বৌ, দুঃসংবাদই বটে।

কি? কি হয়েচে দয়াল? কারো অসুখবিসুখ হয়েছে কি?

না। দৈহিক সুস্থই বটে।

তবে?

ব্রজবাবু রেণুকে লইয়া গ্রামের বাড়ি গিয়ে বড়ই বিপাকে পড়েছেন, শুনলুম!

তুমি কি করে সে-সংবাদ পেলে দয়াল? কে বলেছে? কার মুখে শুনেছ?

বিমলবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমি শুনিনি নতুন-বৌ। আমি কি করে শুনবো? আমি কি সেই গ্রামের কাউকে চিনি যে, আমাকে বলবে!

তবে কি করে জানলে, গ্রামের বাড়িতে ওরা বিপাকে পড়েছেন?

কাল রাতে রাখালবাবুর মুখে শুনছিলুম। ছেলে-পড়িয়ে ফেরার সময় সে-গ্রামেরই কার সঙ্গে নাকি হাঠৎ দেখা হযে যায়। ওনারা গ্রামের বাড়িতে পেঁছিবার পরও ভদ্রলোক নাকি দু'দিন সেখানে ছিলেন, সব কিছু নিজের চোখেই দেখে এসেছেন। সমাজপতিরা নাকি ব্রজবাবুকে খুবই হেনস্তা করেছেন।

কিন্তু কেন? শুনেছেন কিছু? উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল। রেণুকে নিয়ে নাকি সমাজপতিরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সবিতা বলিলেন, রাজু আর কিছু বলেছিল? সে কি তবে সেখানেই ছুটলো?

বিমলবাবু বলিলেন, কিছুই বুঝছি না। কথা বলিতে বলিতে তিনি তখনকার মত বিদায় লইবার উদ্যোগ করিলেন। দুই পা আগাইয়া সিঁড়ির কাছে গিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া বলিলেন. আমি পরে আবার আসছি, তখন বাকী কথা হবে।

সবিতা মুচকি হাসিলেন।

বিমলবাবু বিদায় নিলে সবিতা আবার সারদার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। জলচৌকিটি টানিয়া বসিতে বসিতে বলিলেন রাজু তোমাকে কিছু বলে নি?

সারদা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কাল সন্ধ্যের পর এসে ঘন্টা খানেক ছিলেন। আমার অসুখের কথা, কাকাবাবু রেণুর চিঠি আর আপনাদের সম্বন্ধে টুকরো টুকরো অনেক কথাই রাখালবাবু বলেছিলেন। কিন্তু কই, কাকাবাবু দেশের বাড়ি গিয়ে সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েছেন, এ ধরনের কোন প্রসঙ্গই ত উত্থাপন করেন নি।

সবিতা কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ আঁকিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, তবে হয়তো এখান থেকে যাবার পরই খবরটা পেয়েছে।

বিমলবাবু বললেনও অনেক রাত্রে ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনার অনুমানই হয়তো ঠিক। এখান থেকে বেরিয়ে গ্রামের পরিচিত সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।

সবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইলেন।

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় স্বগতোক্তি করিলেন, কি ব্যাপার একমাত্র গোবিন্দজীই জানেন।

দুপুরের কিছু পরে তারক সবিতার কাছে ফিরিয়া আসিলো সকালে সবিতাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহির হইয়াছিলো। তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিলো রাখালের বাসায় গিয়া তাহার অভিমানের ব্যাপারটি মিটমাট করিয়া আসিবে। ইহা ছাড়াও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাজ সারিবার ছিলো। কিন্তু রাখালের বাসায় যাইয়া দেখিয়াছে বিরাট একটি তালা ঝুলিতেছে। ফিরিবার সময়ও আবার উঁকি দিয়াছিলো। সে তখনও ফিরে নাই।

সবিতার ঘরে যাইয়া তারক যেন আচমকা একটি হোঁচট খাইলো। তাঁহার চোখের তারায় হতাশার ছাপ, মুখ ফ্যাকাশে। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি সবিতার দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরব চাহনি মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

সবিতা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, রাজুর বাসায় গিয়েছিলে তারক?

গিয়েছিলুম। দু'বারই দেখলুম তালা ঝুলছে।

বিমলবাবুও সকালে রাজুর বাসায় গিয়ে দেখা পান নি। পাশের ঘরের কে একজন নাকি বলেছেন, সকালে অন্ধকার থাকতে তালা দিয়ে কোথায় যে গেছে, কেউ জানে না।

কিন্তু আমি যতদিন ওকে কাছে থেকে দেখেচি, যেখানেই থাক দুপুরের আগে ফিরে এসে স্টোভ জেবলে রান্না বসাতো।

হাঁ, ঠিকই বলেচো বাবা. রাজু আমার হোটেলের রান্না একদম পছন্দ করে না।

শোনলুম, দুপুরেও নাকি রাখাল ফিরে নি।

ব্যাপারটা ত সত্যই ভাবিয়ে তুলেচে তারক। খেয়ালি মানুষ—হয়তো কাউকে নিয়ে শ্মশানে দাহ করতে গেচে, নইলে হাসপাতালে কারে শিয়রে বসে অভুক্ত অবস্থাতে সারাটা দিন কাটিয়ে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে ঢক্‌ঢক করে এক ঘটি জল খেয়েই শুয়ে পড়বে। আমি ওর নাড়ি-নক্ষত্র জানি নতুন-মা. অন্যের বোঝা বয়ে বয়েই রাখাল এপর্যন্ত কাটিয়েচে। বাকী জীবনটুকুও ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের মতই কাটিয়ে দেবে। আত্ম-পীড়নেই ওর বেশী আনন্দ।

এমন কিছু লোক আছে তারক যারা সারাটা জীবন অন্যের বোঝা হইতে গিয়ে নিজেকে সবদিক থেকে করে বঞ্চিত। এতে কোন আক্ষেপ নেই, নেইকো লাভ-লোকসানের হিসেব নিকেষ। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সবিতা কথাগুলি বলিলেন।

ইতিমধ্যে সারদা কখন যে বিছানা ছেড়ে উঠে তারকের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তারক বা সবিতা কেহই টের পায় নাই। সারদার কথায় উভয়ের চমক ভাঙলো,—অন্যের জন্য কিছু করতে গেলে নিজেকে ত কোন না কোনদিক থেকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবেই। রাখালবাবুও ওর পরোপকার মনোবৃত্তিই ওকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় নতুন মা।

রাখাল ওদেরই একজন যারা অন্যের সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পায় না। যারা সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য ঝোলা উপুড় করে দেয় নিজের জন্য ছিঁটেফোঁটাও রাখার কথা ভাবে না।

যারা অপরকে শুধুমাত্র দিয়েই গেল বিনিময়ে কারো কাছ থেকে তিলমাত্র প্রত্যাশাও

করে না তারা কি চিরদিন বঞ্চিতই থেকে যাবে নতুন-মা ?

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কর্তব্যের মধ্যে প্রত্যাশা থাকা উচিত নয় তারক।

তবু ত মানুষের আশা—

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা বলিলেন, তারক, একটা কথা মনে রাখবে, নিঃস্বার্থ সেবার মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই। আর যারা প্রত্যাশাকেই বড় করে দেখে তাদের বড় পরিচয় স্বার্থগৃধ্নু। তুমি কি তোমার বন্ধুকে সেই পর্যায়ভুক্ত করতে চাইছো।

তারক অকস্মাৎ যেন অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল। এমন কোন উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পরিস্থিতিটাকে অন্যদিকে মোড় ঘুরাইতে চেষ্টা করিল, কিছু মনে করবেন না নতুন-মা। আমি কিন্তু এতটা গুরুত্ব দিয়ে কথাটা বলিনি। রাখালকে আমি একজন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বলেই মনে করি। তাই ওর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের প্রতিটা কাজের মধ্যে কোন কোনটাকে কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

সবিতা বলিলেন ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই আমি ওর মনের এই বিশেষ দিকটা নিয়ে মাঝে মধ্যে ভাবতে বসি। ভাবনার ফলশ্রুতি —।

তারক সবিতাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, ঐযে বললুম, অন্যের জন্য কিছু করতে আমি বারণ করছিলুম। আপনি এতদিনে আমাকে এই চিনলেন নতুন-মা। আমাকে এত বড় স্বার্থপর ভাবলে আমার প্রতি কিন্তু অবিচারই করা হবে।

সবিতা কি যেন বলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সিঁড়িতে কাহার যেন পায়ের শব্দ পাইয়া সচকিত হইলেন। উৎকর্ণ হইয়া ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, হয়তো রাখাল ফিরিয়াছে। পর মুহূর্তেই তাঁহার ভুল ভাঙিয়া গেল। না, এ-ত রাখালের পায়ের শব্দ নয়। রাখাল কোনদিনই এমন ধীর মন্থর তালে সিঁড়ি দিয়া ওঠে না। গজেন্দ্র গমনে চলার অভ্যাস তাহার ধাতে সহে না। রাখাল হইলে চপ্পলের শব্দ ঘন ঘন হইত। অনেক সময় ত ও পর পর দুইটা করিয়া সিঁড়ি এক সঙ্গে অতিক্রম করিয়া থাকে। সেই শব্দের সহিত সবিতা অন্ততঃ সুপরিচিত।

পরমুহূর্তেই সবিতার অনুমানের সত্যতা প্রমাণীত হইয়া গেল। সিঁড়ির শেষ ধাপটি অতিক্রম করিয়া যিনি বারান্দায় পা দিলেন তিনি রাখাল নহে, বিমলবাবু।

বিমলবাবুকে দেখিয়াই সবিতা প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, দয়াল এখন কি করি বল ত ?

বিমলবাবু সবিতার আকস্মিক চিত্ত চাঞ্চল্য দেখিয়া আচমকা যেন একটি হোঁচট খাইলেন। কড়িতে পা দিয়াই এমন একটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। পরমুহূর্তেই পরিস্থিতিটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কেন ? কি হয়েছে নতুন-বৌ ?

রাখাল যে ভোররাতে কোথায় গেছে, এখনও ফেরেনি। কতবার ওর বাসায় লোক গেল—

আমিও ত দু'-দু'বার গিয়েছি। এখনও ত ফেরার সময় ও'র বাসা হয়েই এলুম। সকালের মতই তালা ঝুলছে দেখলুম। ভদ্রলোক হঠাৎ উধাও—

আমাদের গ্রামের বাড়িতে আবার ধাওয়া করে নি ত?

কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়।

ওখানকার কি খবর ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিনে। মেজকর্তা রেণুকে নিয়ে কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তা-ই বা কে জানে? সবিতার চোখ দুইটি ছল ছল করিতে লাগিলো।

বিমলবাবু তাঁহাকে প্রবোধ দিতে যাইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, নতুন-বৌ, দূর থেকে ওদের জন্য উদ্বেগ ভোগ করা ছাড়া উপায়ও ত কিছু দেখছিনে! দেখ, সত্য বলতে কি, আমার পক্ষে তোমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ব্রজবাবুর খোঁজ নিয়ে আসা সম্ভব নয়। আর উচিতও হবে না বোধ হয়। ব্যাপারটাকে অন্যদশজনে অবশ্যই সুনজরে দেখবে না।

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, আমিও এরকম কোন অনুরোধ করতে উৎসাহী নই দয়াল। একটা কথা মনে রেখো, এ-মুহূর্তে আমি নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখলেও মনে রেখো অন্ততঃ নির্বোধ নই। তোমায় দশজনের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। মুহূর্তকাল নীরবে ভাবিয়া সবিতা এইবার তারকের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন।

তারক সুচতুর। সবিতার চোখের তারায় তাঁহার মনের কথার আভাষ পাইয়া সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, নতুন মা, আপনি ত নিজের চোখেই আমার অসুবিধা দেখে এসেছেন। স্কুলের হেড মাষ্টারের চাকুরি নেবার পর থেকে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ টুকু পর্যন্ত পাইনে।

সে-ও আমার অজানা নয় তারক।

আপনি ত ভালই জানেন, পর পর ক'দিন কলিকাতায় এসেছি, রাখালের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে যেতে হয়েছিলো। আর এরই ফলে রাখালও আমায় কম ভুল বোঝে নি। অভিমান করে বসে রয়েচে।

সবিতা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

তারক বলিয়া চলিল, রাখাল আমার ওপর অভিমান করেচে। আপনিই ত বলেছিলেন নতুন-মা, আমি মিটিয়ে না নিলে যে রাখালের মন থেকে জমাট বাঁধা সে-অভিমান কিছুতেই মুছবার নয়।

হাঁ, ঠিকই বলেছি।

তাই ত শত অসুবিধে সত্ত্বেও আমি আজ সারাদিন কলিকাতায় রয়ে গেলুম। সারাটা দিন পথে পথে ঘুরে রাখালের খোঁজ করেচি। বৃথা চেষ্টা।

সবিতা অকস্মাৎ তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন। সচকিত তাঁহার চাহনি। তিনি কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতাটুকু অব্যাহত রাখিয়া বলিলেন, আমি কি জানি বাবা তারক, রাখালকে তুমি কী গভীরভাবে ভালবাসো! রাখালও কিন্তু ঠিক তেমনই অভিন্ন হৃদয়

বন্ধু বলেই তোমাকে মনে করে। তাই ত ভুল বোঝাবুঝির জন্য ইদানিং তোমাদে বন্ধুত্বে যে চিড় ধরেছে তা যে ক্ষণস্থায়ী, এ-ও আমার অজানা নয়। রাখালকে ছেড়ে তোমার পক্ষে—

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তারক বলিল, রাখাল আমাকে ভুল বুঝে এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে, এ যেন ভাবতেও আমি উৎসাহ পাচ্ছিনে নতুন মা! অনেক চেষ্টা করলুম এ-যাত্রায় ও হয়ত আর রাখালের সঙ্গে দেখা হ'ল না।

তুমি কি কাল ভোরের গাড়ীতেই—

হাঁ, নতুন মা, ভোরের গাড়ী ধরতেই হবে।

কিন্তু তোমার কাকাবাবু আর রেণুর খবর—

দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েই আমাকে হরিণপুরে ফিরে যেতে হচ্ছে নতুন-মা। আমি কে অসহায় আপনার অন্ততঃ অজানা নয়।

এমন সময় রাখাল উপস্থিত হইল। তাহার মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ। চোখের তারা দুশ্চিন্তার ছাপ।

সবিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া রাখালের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাহাকে খুবই ক্লান্ত দেখাইতেছে। মাথার চুল রুক্ষ রুক্ষ। সারাদিনে স্নানাহার জুটিয়াছে বলিয়া মনে হইলো না।

বিমলবাবুই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, রাখালবাবু সারাদিন কোথা ছিলেন

কেন? আমার খোঁজ করেছিলেন নাকি?

খোঁজ মা ন। ধরতে গেলে আমি তারকবাবু পালা করে সারাদিন আপনার বাসায় পড়েছিলুম।

ম্লান হাসিয়া রাখাল বলিল তাই বুঝি? এইবার তারকের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয় বলিল, কি ভাই তারক কখন এলে?

সকালের গাড়ীতে।

ম্লান হাসিয়া রাখাল তারককে ছোট্ট একটি খোঁচা মারিল, সেই সকালে এসে সারাটা দিন কলিকাতাতেই কাটিয়ে দিলে!

কেন? অবাক হচ্ছ নাকি?

ব্যাপারটা কি সত্যই অবাক হবার মত নয় ভাই?

সবিতা দেখিলেন, দুই বন্ধুর মান-অভিমানের পালা শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা পাকিয়া উঠিলে ব্রজবাবু ও রেণুর প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিবার অবকাশ পাইবেন না।

রাখাল এইবার বলিল, ইদানিং তোমার আচরণ আমায় এই কথাই বলতে বাধ্য—

সবিতা তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, রাজু, তোমার কাকাবাবু আর রেণু খবর—

বিমলবাবু বলিলেন, রাখালবাবু, কাল রাত্রে বলছিলেন—

কাকাবাবু ও রেণু গ্রামের বাড়ি গিয়ে, খুবই সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েছে

গেছিলুম বটে।

তারপর? তারপর আর কিছু খবর পেলেন?

ম্লান মুখে রাখাল উচ্চারণ করিলেন, আমি এখন সোজা ওখান থেকেই আসছি বিমলবাবু।

সবিতা চোখের তারায় অত্যুগ্র আগ্রহের ছাপ আঁকিয়া বলিলেন ওনারা ভাল আছেন রাজু?

কিছুই বলতে পারছিনে নতুন-মা।

সে কী কথা! তুমি যে এইমাত্র বল্‌লে, আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলে!

গিয়েছিলুম ই ত।

তবে আবার এ-কি রকম কথা বলচো? গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলে, অথচ তোমার কাকাবাবু রেণু কেমন আছে জান না, কথাটা কেমন খামখেয়ালি গোছের হ'ল না রাজু?

হ, ঠিকই বলচি নতুন-মা। কাকাবাবু এখন রেণুকে নিয়ে কোথায় কেমন আছেন, কিছুই আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি।

বিমলবাবু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, রাখালবাবু, ব্রজবাবুর ব্যাপারে আমরা দারাদিন খুবই উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে কিছুমাত্র গোপন না করে খোলাখুলি বলুন, ওনারা কেমন আছেন।

আপনারা বড়ই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছেন, আপনাদের সবার চোখ-মুখ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওনাদের দেখা পাওয়া ত দূরের কথা, শত চেষ্টা করেও সামান্যতম খবর সংগ্রহ করাই সম্ভব হ'ল না। বলতে পারেন, একেবারে খালিহাতেই ফিরে আসতে হলো।

ব্রজবাবু ত যাবার সময় বলে গেলেন, গ্রামের বাড়িতেই যাচ্ছেন। রেণুকে নিয়ে ওখানেই পাকাপাকিভাবে বসবাস করবেন, তাই না? সবিতার দিকে তাকাইয়া বিমলবাবু প্রশ্নটি ছুঁড়িয়া দিলেন।

সবিতার মুখ ক্রমেই খড়ি মাটির মত ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইতে লাগিলো। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত দুই পা আগাইয়া রাখালের হাত ধরিয়া বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, রাজু, তোমার কাকাবাবু কি তবে সত্যই গ্রামের বাড়ি যান নি? আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না রাজু। কি ব্যাপার খুলে বল, কোথায় তিনি, কেমন আছেন?

রাখাল বলিল, নতুন-মা, বলছি শুনুন, কাকাবাবু রেণুকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন ঠিকই। দুই রাত্রি ছিলেনও ওখানে।

তারপর?

তারপর কোথায় গেছেন, কেমন আছেন কেউই বলতে পারলেন না।

সে কী কথা রাজু!

হাঁ, নতুন-মা।

তোমার অবনীকাকা? উনি কি বল্‌লেন?

খুব দুঃখ করলেন। কেঁদেছেনও খুবই।

সবিতা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে রাখালের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিয়া চলিল, কাকাবাবু গ্রামে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। বারোয়ারী হরিতলায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে বৈঠক করেন। সমাজপতি বিধান দিলেন, যেহেতু রেণুর বিয়ের পাকা-কথা হয়ে গিয়েছিল, এমন কি আশীর্বাদ গায়ে-হলুদ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল, অথচ বিয়ে হ'ল না। এরকম মেয়েকে সমাজে ঠাঁই দেয়া সম্ভব নয়।

তারপর ? তারপর কি হ'ল রাজু ?

সমাজপতি অবশ্য দয়া করে একটা রফা করে নিয়েছিলেন। কিছু খরচাপাতি করলে সমাজে ওকে আবার গ্রহণ করা সম্ভব।

বিমলবাবু অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হইয়া বলিলেন, তার মানে ? সমাজপতিকে নগদ কিছু হাতে ধরিয়ে দিলেই রেণু আবার সমাজে ঠাঁই পাবে, এই ত ?

হাঁ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এরকম আভাষই দিলেন। তবে সমাজপতি মশাই নিজের জন্য কিছুই চান নি। সমাজের দশজনের উপকারার্থে একটা হ্যাজাক-লাইট, হরিতলার জন্য একটা বড়সড় চাঁদোয়া—

বিমলবাবু ম্লান হাসিলেন।

রাখাল বলিয়া চলিল, আরও আছে। হরিতলায় একদিন রাধাগোবিন্দের ভোগ দিয়ে গ্রামের সবাইকে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বিমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তবেই রেণু আর সমাজের নিকট অপাঙক্তেও থাকবে না, পাপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, এই ত ?

এরকমই ত শুনে এলুম বিমলবাবু।

সত্যই আশ্চর্য বিধান ! আশ্চর্য আমাদের সমাজ !

হাঁ, আশ্চর্যই বটে। তারপর কি হ'ল, রাখাল ? কাকাবাবুর খুড়তুতো ছোট ভাই অবনী কাকা সমাজপতি বাচস্পতি মশাইয়ের হাতে-পায়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। কাকাবাবুর আর্থিক অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে উনি জরিমানা মাফ করে দেয়ার জন্য বহুভাবে অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

কিছুতেই পাষাণ গলানো সম্ভব হ'ল না। সমাজপতিদের এক গোঁ, সমাজের বিধান মেনে নিয়ে চাহিদা পূরণ করতে পারলে তবেই আবার ওঁদের গ্রহণ করবে। অন্যথায় সমাজে এক ঘরে হয়েই থাকতে হবে। কাকাবাবু অক্ষমতা জানাতে গিয়ে বললেন, তিনি দারিদ্রের চরম সীমায় পৌঁছেই গ্রামে ফিরেছেন, এমন কোন সঙ্গতি নেই যা দিয়ে সমাজপতিদের বাঞ্ছা পূরণ করে সন্তোষ উৎপাদন করতে পারেন। সমাজের সুধীজনদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের এতটুকুও ইচ্ছা ওনার নেই। বরং ওঁদের বিধানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে নিয়েই উনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন।

সবিতা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, তারপর ? তারপর রাজু ?

রাখাল চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, তার আর পর ত থাকতে পারে না নতুন-মা।

সমাজপতিরা ওঁদের মতামত ত ব্যক্তই করেছেন। কাকাবাবুও নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই ত বিচার শেষ। অবনীকাকা অবশ্য কাকাবাবু ও রেণুর হয়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিলেন। কিন্তু সমাজের কর্তাব্যক্তিদের কিছুতেই জরিমানা মকুব করতে পারলেন না।

বিমলবাবু কপালে দুশ্চিন্তার রেখা আঁকিয়া বলিলেন, এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমার কথা বলা সঙ্গত কিনা, জানি না। তবু মুখ বুজে থাকতেও নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে রাখালবাবু। ব্রজবাবুর খুড়তুতো ছোট-ভাই অবনীবাবু জন্মাবধি গ্রামেই বাস করছেন। সমাজে ওনারও নিশ্চয়ই প্রভাব প্রতিপত্তি কম-বেশী রয়েছে। উনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে অবশ্যই ব্রজবাবুর মুশকিল আসান করতে পারতেন, অবশ্য আমার এটা ধারণা।

রাখাল কহিল, গ্রামের দু'-চারজনের সঙ্গে কথা বলে যে টুকু বুঝেছি, হুবহু আপনাদের কাছে তুলে ধরলুম।

বিমলবাবু বলিলেন, তবু আমি বলব কোথায় যেন ফাঁক-ফোঁকড় রয়ে গেছে রাখাল-বাবু। অবনীবাবু যেটুকু করেছেন, হয়ত সবটুকুই লোক দেখানো প্রয়াস। তাতে আন্তরিকতার ছোঁয়া খুব কমই ছিলো। বলা যায় না, আমার ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল না-ও হতে পারে।

রাখালের চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটিয়া উঠিল। সে ম্লান হাসিয়া বলিল, আপনার ধারণাকে অসত্য বা অবান্তর বলে উড়িয়ে দিতে চাইচি নে। তবু আপনার মন্তব্যের সমর্থনে কিছু না কিছু যুক্তি ত অবশ্যই রয়েছে?

হাঁ, যুক্তি ত রয়েছেই। কারো সম্বন্ধে যুক্তিহীন মন্তব্য করা অবশ্যই সুস্থ্য মস্তিষ্কের কাজ নয়। তবে সেই যুক্তি সর্বজন গ্রাহ্য না-ও হতে পারে। এক পলক সবিতা ও রাখালের উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া এইবার বলিলেন, দেখুন রাখালবাবু, অবনীবাবু গ্রামে থেকে যে-বাড়ি-ঘর বিষয় আশয় ভোগ দখল করিতেছেন তা যৌথ মালিকানাধীন। এটা আমি নতুন-বৌয়ের মুখেই একদিন শুনেছিলুম। সেই কথাকে যদি আমরা সত্য বলে ধরে নেই তবে দেখা যাচ্ছে, ব্রজবাবুও সেসব জমি জায়গা ও বাড়ি ঘরের অর্দ্ধাংশের মালিক। ব্রজবাবু যদি গ্রামের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তবে তাঁর মুখের গ্রাসে ভাগ বসাবেন। এতে অবনীবাবুর স্বার্থে ঘা লাগবে, সমূহ ক্ষতি। সবকিছু জেনেশুনে যে অবনীবাবু এতবড় একটা বোকামি ক'রে বসবেন, বিশ্বাস করতে মোটেই উৎসাহ পাচ্ছি নে।

রাখাল কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটি দুশ্চিন্তার রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিলেন, আপনার যুক্তি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

মুচকি হাসিয়া বিমলবাবু এইবার বলিলেন, তারপর বলছি শুনুন—অবনীবাবু রেণুকে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে পেয়েছেন। ওর বিয়েকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটেছিল তা শুধুমাত্র অবনীবাবুই নন, গ্রামের প্রতিটি মানুষই ব্রজবাবুর দুর্বলতা কোথায়, ভালই জানেন। তাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অবনীবাবু

নিজের আখের গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। সফলও হয়েছেন পুরোপুরি। এরকম অনুমানকে অপনারা কি হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, রাখালবাবু?

হেসে উড়িয়ে দেয়া অবশ্যই সম্ভব নয়, হয়ত সঙ্গতও হবে না বিমলবাবু। আর এটাই স্বাভাবিক, কাকাবাবুকে দেশ ছাড়া করার পিছনে ওনারই প্রচ্ছন্ন হাত কাজ করেছে। তবে আমি যা বললুম, সবই—

রাখালকে মাঝপথে থামাইয়া দিয়া সবিতা বলিলেন, দয়াল, দোষ-ত্রুটি হিসেব করার সময় এটা নয়। ওনাকে দেশ ছাড়া হতে হয়েচে, এই মুহূর্তে এটাই বোধ হয় আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েচে।

বিমলবাবু অকস্মাৎ অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলেন। তিনি সলজ্জ মুখে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, নতুন মা, আমার মনে হয় এই সংকটজনক মুহূর্তে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য কাকাবাবু ও রেণুর খোঁজ করা।

সবিতা বলিলেন, তুমি ঠিকই বলেচ রাজু। ওদের খুঁজে বের করতেই হবে। দয়াল, তারক তোমরাও বল, কোথায়, কিভাবে খোঁজ-খবর নেয়া যেতে পারে।

বিমলবাবু বলিলেন, রাখালবাবু, ব্রজবাবু কি অবনীবাবু বা গ্রামের কাউকে কিছু আভাষ দিয়েছিলেন, কোথায় যেতে পারেন?

আমি অবনীকাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম।

কি বললেন উনি?

কিছুই বলতে পারলেন না।

সে কি কথা! সবিতা চোখ দুইটি কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

রাখাল বলিল, আমি ওনাকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলুম।

কি বললেন? বিমলবাবু বললেন।

ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া কোন ফলই হ'ল না। শত চেষ্টা করেও কোন সদুত্তর পেলুম না। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল। কাকাবাবু নাকি কাউকে কিছু না বলেই শেষ রাত্রে চুপিচুপি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

বিমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাখালকে চাপিয়া ধরিলেন, তবেই ভেবে দেখুন, রাখালবাবু? ব্রজবাবুর এক ঘরে হওয়া এবং বাড়ি ছাড়ার পিছনে অবনীবাবু প্রচ্ছন্ন হাত থাকাটাই স্বাভাবিক আমি যে বলেচি, কথাটা তবে একেবারে অমূলক নয়। দ'-দুটো লোক পোটলা পুটুলি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে গেলেন, বাড়ির অন্য কেউ টেরই পেলেন না, কথাটা বিশ্বাস করবে কেউ?

সবিতা মুখ খুলিলেন, কিন্তু এটাইবা কি করে সম্ভব দয়াল? মেজকর্তা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হবার পর অবশ্য দু' ভাইয়ের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিলো। রেণুকে নিয়ে উনি যে আকস্মিক বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন, সে পরিস্থিতির মোকাবেলা কি করে করবেন, তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হওয়াই স্বাভাবিক।

রাখাল বেশ কড়া স্বরেই বলিল, আমরা কিন্তু অহেতুক আসল ব্যাপার থেকে দূরে

সরে যাচ্ছি। কাকাবাবু রেণুকে নিয়ে কোথায় গেছেন, বাড়ির সবাই জেনেও যদি অস্বীকার করেন, আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করে কোন লাভ হবে? মোদ্দা কথা, কাকাবাবু সমাজপতিদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। আর একঘরে হয়ে সংগ্রামে বসবাসের লজ্জা-অপমানের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বাড়ি ছেড়েছেন। ওঁরা কোথায় গেছেন, কোথায় গেলে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে বহু চেষ্টা করেও জানা সম্ভব হয় নি, এই ত?

সবিতা বিষণ্ণ মুখে রাখালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তবে দেখা যাচ্ছে, মেজকর্তার খোঁজ-খবর নেয়ার কোন চেষ্টাই আমাদের করা সম্ভব নয়, কি বল রাজু?

কেন?

সারা দেশ তোলপাড় করে বেড়াবে নাকি?

দরকার হলে তা ই করতে হবে নতুন মা।

কথাটা কেমন পাগলের প্রলাপ হয়ে যাচ্ছে না রাজু?

তারক দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুলিল, আমরা একটা কথা ভুলে যাচ্ছি রাখাল, কাকাবাবু পরম বৈষ্ণব।

হাঁ, বৈষ্ণব ত বটেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এসব কথা উঠছে কেন তারক?

এ-সত্যকে নির্ভর করে আমরা কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি।

যেমন?

যেমন মনে কর, গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কাকাবাবু অবশ্যই কোন না কোন বৈষ্ণব-তীর্থক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করতে পারেন।

বিমলবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, চমৎকার! চমৎকার বলেছেন তারক-বাবু! ব্রজবাবু অসহায় অবস্থায় পড়ে নিশ্চয়ই কোন না কোন বৈষ্ণব-তীর্থস্থলে গিয়ে উঠেছেন।

রাখাল বলিল, আমিও তারকের মতামতের গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু কথা হচ্ছে কোথায়, কোন তীর্থস্থলে ওনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হতে পারে এ ও ভাববার বিষয় বটে।

বিমলবাবু বলিলেন, কথাটা ঠিকই। দেশের আনাচে কানাচে কতশত বৈষ্ণব-তীর্থস্থলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কোন দিকে, কোথায় খোঁজ করা যায়, বলুন ত তারকবাবু?

তারক ক্ষণিক ইতঃস্তবের পর দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলল, কি বলি বলুন ত? খুবই কঠিন সমস্যা বটে। মথুরা, বৃন্দাবন থেকে শুরু করে নবদ্বীপধাম পর্যন্ত কত শত বৈষ্ণব-তীর্থস্থল রয়েছে, কার কথা বলি, ভেবে পাচ্ছি নে।

রাখাল মুশকিল আশান করে দিল, দেখুন, মথুরা বা বৃন্দাবনের কথা হয় পরে ভাবা যাবে তারক। কাকাবাবুর পক্ষে হঠাৎ করে এতদূরের সিদ্ধান্ত নেয়া না-ও হতে পারে।

কেন? তোমার এইরকম ধারণা হওয়ার কারণ? তারক বলিল।

এই জন্যে যে, কাকাবাবুর আর্থিক অসচ্ছল পরিস্থিতির কথা আমাদের কারো অজানা

নয়। মথুরা বা বৃন্দাবনে যেতে দুইজন লোকের যে ট্রেনভাড়া ও অন্যান্য খরচ খরচার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কাকাবাবুর হাতে অবশ্যই তা ছিলো না বলেই আমার বিশ্বাস। আর যদি কোনক্রমে সম্ভব হয়েই থাকে তবে তিনি অবশ্যই হঠাৎ ক'রে এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে যাবেন না।

আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, কাকাবাবু ধারে কাছেই, মানে বাংলার মধ্যেই কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

তবু, তোমার কি মত? কোথায় গেলে কাকাবাবুর দেখা পাওয়া যেতে পারে বলে তোমার বিশ্বাস? রাখাল বলিল। আমার মনে হয় কাকাবাবু রাণুকে নিয়ে নবদ্বীপ-ধাম বা মায়াপুরের কোন না মঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তারপর নেহাৎই যদি খোঁজ পাওয়া সম্ভব না-ই হয় তখন না হয় আবার নতুন করে ভাবা যাবে, কি বলেন নতুন মা?

আমি আর কিছু ভাবতে পারছিনে রাজু! তোমরা যা ভালো মনে কর তা-ই কর।

তারক দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, নতুন-মা, সাধ থাকলেও কাকাবাবুর খোঁজ করতে নবদ্বীপধামে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কাল সকালের গাড়ীতে আমাকে হরিণপুরে যেতেই হবে, স্কুলে জরুরী কাজ রয়েছে। তবে আমি যেতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতুম।

বিমলবাবুও পাশ কাটাইয়া যাইতে গিয়া বলিলেন, আমারও এখন এমন অবস্থা চলছে, কাজের চাপে শ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত নেই! কবে ডাক আসে কোন নিশ্চয়তা নেই। চিঠি পাওয়ামাত্র জাহাজে চাপতে হবে। ব্রজবাবুর মত একজন পরম বৈষ্ণবের জন্য কিছু করতে পারা নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার! চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া এইবার বলিলেন, এমন ব্যবসাই করি যে, কারো জন্য কিছু করার কথা ভাবতেই পারি নে! অবশ্য টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারি।

সবিতার মুখ অকস্মাৎ যেন অধিকতর কালো হইয়া উঠিল। চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নামিয়া আসিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া এইবার বলিলেন, না দয়াল, তোমাকে আর অহেতুক টাকা পয়সা খরচ করতে হবে না। রাজু, এখন তুমিই একমাত্র ভরসা।

রাখাল ম্লান হাসিয়া বলিল, আমার ত আর স্কুলের চাকুরি নেই, বড় কোন ব্যবসা-পত্রও করি নে যে, ক্ষতি হবে। গুটি কয়েক ছেলে-মেয়েকে পড়িয়ে কোনরকমে দিন কাটিয়ে দেই। আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই, বর্ত্তমানও অন্ধকার। আর এ-ও ত সত্য এরকম কাজ এত বেশী জোটে যে বেকাররা সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থেকে বেকারত্বের জ্বালা ভুলে থাকতে পারে। আপনারা ভাববেন না বিমলবাবু, আমিই কাকাবাবুর খোঁজে বেরবো।

বিমলবাবু বলিলেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতেই হয় রাখালবাবু।

কেন? দায় থেকে আপনাদের অব্যাহতি দিলাম বলে, নাকি কাকাবাবুর খোঁজে বেরোতে চাচ্ছি বলে?

দয়া করে আর লজ্জা দেবেন না রাখালবাবু! আমার অসুবিধের কথা হয়ত

আপনাদের বুঝাতে পারচি না বলেই আমায় এমন অসহায়ভাবে বাক্যবাণে জর্জরিত হতে হচ্ছে। এর জন্য আপনাদের নয়, আমার ভাগ্যকেই দোষারোপ করব।

যাক, যে-কথা বলতে চাচ্ছি, ব্রজবাবুদের খোঁজ করতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হবে তা আমায় বহন করার সুযোগ দিলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবো।

সবিতা আগ বাড়াইয়া বলিলেন, কিছু মনে কোরো না দয়াল, হয়ত এ ব্যাপারে তোমার কাছে হাত না পাতলেও চলবে। আমার কাছে যা আছে আশা করি তাতেই কুলিয়ে উঠতে পারব। তারপরও যদি দরকার হয়, তুমি ত হাতের পাঁচ রইলেই। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। তোমার ঔদার্য থেকে ছিটেফোঁটা গ্রহণ করতে আমার এতটুকুও দ্বিধা বা সঙ্কোচের কারণ নেই দয়াল।

বিমলবাবু বলিলেন, তবে তা-ই হোক নতুন-বৌ। অনুরোধ রইলো, প্রয়োজনে এ-ব্যাপারে আমাকে জানাতে কিন্তু দ্বিধা কোরো না।

রাখাল বলিল, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমি আগে কোনদিকে খোঁজ করবো, বুঝে উঠতে পারছি নে।

তারক বলিল, যদি কিছু মনে না কর তবে আমি কিছু বলি। তারক, তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে তোমার কোন কথাই অনুচিত হতে পারে বলে মনে করি না।

মুচকি হাসিয়া তারক বলিল, ধন্যবাদ বন্ধু! যাক, যে-কথা বলি শ্যাম—মথুরা, বৃন্দাবনের চিন্তা পরে না হয় করা যাবে। আগে নবদ্বীপ ও তার সংলগ্ন মায়াপুরের মঠগুলি খুঁজেপেতে দেখো। কাকাবাবু মথুরা, বৃন্দাবনে যাবার ভাড়া পাবেন কোথায় সে যাবেন?

সবিতা বলিলেন, হাঁ রাখাল, আগে বৈষ্ণব-তীর্থক্ষেত্র নবদ্বীপধাম ও মায়াপুরেই খুঁজে দেখা যাক। আমার বিশ্বাস -

সবিতার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রাখাল বলিল, ঠিক আছে, আগে নবদ্বীপ-ধামেই যাই।

## উনিশ

রাখাল ব্রজবাবু ও রেণুর খোঁজে নবদ্বীপধাম যাত্রার প্রস্তুতি লইতে লাগিল। সকালের প্রথম গাড়ীটি ধরিতে পারিলে সব দিক হইতে নিরাপদ। নচেৎ সেই দুপুরের দিকে গাড়ী। তাহাতে নবদ্বীপধামে পৌঁছাইতে বৈকাল হইয়া যাইবে। শীতের বৈকাল দ্রুত ছোটে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিবে। তখন সেইখানে ব্রজবাবুর খোঁজ করা ত দূরের কথা, নিজের মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহের চিন্তাই প্রাধান্য পাইবে, সন্দেহ নেই। ভোরের গাড়ী ধরিতে পারিলে সব দিক হইতে নিরাপদ। আর কিছু না হউক অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা সেইখানে ব্রজবাবুর খোঁজে চুঁ মারিতে পারিবে।

বিমল বাবু বিদায় লইয়া নিজের বাসস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। তারক ভোরের গাড়ী ধরিয়া হরিণপুর যাইবে। অতএব রাখালও তাহারই সহিত একই গাড়ী ধরিবে মনস্থ করিলো।

সমস্যা সবিতাকে লইয়া। তিনিও রাখালের সহিত-ব্রজবাবুর খোঁজে যাইবেন বায়না ধরিলেন। রাখালের ইহাতে ঘোর আপত্তি। সে যুক্তি দেখাইলো। সে ত আর তীর্থে যাইতেছে না যে, সাথে করিয়া দুই-চার-জনকে লইয়া যাইবে। সে কখন কোথায় থাকিবে। কি খাইবে তাহারই কোন ঠিক ঠিকানা নাই। তাহার ওপর একজন নারী বোঝা স্বরূপ থাকিলে তাহার তত্বাবধান করিতেই দিন কাটিয়া যাইবে। আসল উদ্দেশ্য হইবে ব্যর্থ!

সবিতা কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যাইবেনই।

সবিতাকে যখন কিছুতেই নিরস্ত করা গেলো না তখন তারক উপায়ান্তর না দেখিয়া রাখালকে পরামর্শ দিলো, এক কাজ কর রাখাল, নতুন মা যখন কিছুতেই বাধা মানছেন না, নিয়েই যাও।

তোমার কাজের অসুবিধে হবে, স্বীকার করছি। নইলে ঘরে পড়ে হাপিত্যেশ করবেন, আহার-নিদ্রা ছেড়ে দেবেন। সে আর এক নতুনতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ওনাকে এক একদিন একটি মঠে রেখে তুমি সারাদিন ব্রজবাবু ও রেণুর খোঁজ করে বেড়াবে। এ ছাড়া গত্যান্তরও ত কিছু দেখছি নে।

শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারেও তারকের পরামর্শই গ্রহণ করা হইলো।

পরদিন সকাল দশটার কিছু পরে রাখাল সবিতাকে লইয়া নবদ্বীপধামে পৌঁছাইলো।

সবিতাকে মঠে রাখিয়া রাখাল সারাদিন উদ্ভ্রান্তের মতো মঠে-মঠে ব্রজবাবুর খোঁজ করিয়া বেড়ায়। প্রথমদিন মাত্র তিন-চার ঘণ্টা সময় পাইলো। হতাশ মনেই মঠে ফিরিয়া আসিতে হইলো। দ্বিতীয় দিন কাকডাকা সকালে সবিতাকে লইয়া স্নানের ঘাটে উপস্থিত হইলো। মঠের একজন সন্ন্যাসীর পরামর্শেই ওরা গঙ্গার ঘাটে গিয়া বসিলো। তাহাছাড়া সবিতারও বিশ্বাস, ব্রজবাবু যদি সত্যই নবদ্বীপধামে অবস্থান করেন তবে অবশ্যই গঙ্গায় প্রাতঃস্নান সারিতে আসিবেন। উভয়ে দুপুর পর্যন্ত ঘাটের কাছের একটি গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া স্নানার্থীদের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলো।

একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সবিতা বলিলেন, না রাজু একটা বেলা বৃথাই গেলো।

এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন নতুন-মা! পথে যখন নেমেচি তখন পথ যেদিকে টেনে নিয়ে যায় ছুটে যেতে হবে। রাজু শহরটা একেবারে ছোট নয়। হাজার হাজার লোকের বাস। মেজকর্তা বা রেণু যদি এখানে থেকেই থাকে তবু ত ওদের খোঁজ পাওয়া কবে সম্ভব হবে, বুঝছি না রাজু।

একই প্রশ্ন করে না আমার মনেও মাঝেমধ্যে যে হতাশার সঞ্চার করে না তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে প্রবোধ দেই মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। আপনি দেখবেন, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই শেষ পর্যন্ত আমাদের সাফল্য এনে দিতে বাধ্য।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সবিতা বলিলেন, কি জানি বাপু, আমার মাথায় যে কিছুই

আসচে না। আমি আর ভাবতে পারছি না। মাথা ঝিমঝিম করচে।

দুপুর উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন দুই-চারজন যাহারা আসিতেছে অধিকাংশ ধারে কাছের দোকানদার। দোকান বন্ধ করিয়া স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিবে। রাখাল ভাবিলো, আর বসিয়া থাকা নিরর্থক। তাহার পরম বৈষ্ণব কাকাবাবু অবশ্যই এতক্ষণ স্নান-আহ্নিক বাকী রাখেন নাই। এত বেলা পর্যন্ত ঠাকুর রাধামাধবকে উপবাসী রাখা তাহার প্রাণে সহিতে পারে না। অবশ্য যদি শারীরিক অসুস্থ থাকেন, স্বতন্ত্র কথা। তাই রাখাল অনন্যোপায় হইয়া সবিতাকে লইয়া মঠে ফিরিয়া গেলো।

বৈকালের দিকে রাখাল একাই ব্রজবাবুর খোঁজে বাহির হইলো। পথে পথে বহুক্ষণ ঘুরলো। ফল হইবে না বুঝিয়াও দই-দশজন প্রবীণ ও বৃদ্ধ পথচারীকে ব্রজবাবু ও রেণুর চেহারার বিবরণ দিয়া উহাদিগের পাইতে চেষ্টা করিল। ইহাতেও হতাশ হইতে হইলো।

পাঁচ পাঁচটি দিন রাখাল ও সবিতা নবদ্বীপ ধামে কাটাইলেন। কিন্তু হায়। উহাদিগের নিকট ব্রজবাবুর খোঁজ পাওয়াটা খুবই সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হইলো না। কেউ দেখিয়াছে কিনা, কোথায় গেলে উহার খোঁজ পাওয়া যাইতে পারে এই রকম কোন সম্ভাবনার আভাষও কেহই দিতে পারিলো না।

নবদ্বীপধামের অদূরবর্তী মায়াপুরেও কয়েকটি বৈষ্ণবদিগের মঠ রহিয়াছে। রাখাল মনস্থ করিলো এইবার সেইখানে যাইয়া ব্রজবাবুদের খোঁজ করিবেন।

স্বরূপগঞ্জের ঘাট পার হইয়া রাখাল সবিতাকে লইয়া মায়াপুরের পবিত্র মাটিতে পদার্পণ করিল।

প্রায় দেড় ক্রোস পথ হাঁটিয়া রাখাল সবিতাকে লইয়া নিমাইয়ের জন্ম-ভিটায় উপস্থিত হইল। এইখানে ছোট্ট একটি মঠ রহিয়াছে। কয়েকজন সর্বত্যাগী প্রবীণ ও বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বসবাস করেন। সাধন-ভজনের মধ্য দিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিবার ব্রত ধারণ করিয়াছেন সকলে।

রাখাল নিমাইয়ের জন্মভিটার সুপ্রাচীন নিমগাছটির ছায়ায় সবিতাকে বসাইয়া ভক্ত-দিগের ডেরায় উপস্থিত হইল। ভক্তরা প্রাতঃস্নান সারিয়া পূজা-পাঠে মগ্ন। অনন্যোপায় রাখালকে দরজায় বসিয়া নীরবে অপেক্ষা করিতে হইল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল নীরব প্রতীক্ষার পর রাখাল এক গৈরিক বেশধারী বৃদ্ধভক্তের সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্য লাভ করিল। অশীতিপর বৃদ্ধ। মুণ্ডিত মস্তকে সুদীর্ঘ একটি শিখা প্রায় ঘাড় পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। মুখে সনপাটের মত দাড়ি। বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে ঝিরঝির করিয়া কাঁপিতেছে। পরণে জীর্ণ গৈরিক বসন। দীর্ঘদিন সাবান-সোডার সহিত সম্পর্ক নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। গায়ের চামড়া কোঁচকাইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিকের তুলনায় বয়স একটু বেশী বলিয়াই রাখালের মনে হইল সাধন-ভজনকে যাঁহারা জীবনের চরম ও পরম ব্রত বলিয়া মনে করেন তাহাদিগের নিজের শরীরের কথা ভাবিবার অবকাশ কোথায়? সাধনায় সিদ্ধিলাভ কিংবা

শরীরের পতনই যে ইহাদিগের জীবন ব্রত।

পূজা পাঠ সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণবটি দরজার দিকে ঘুরিয়াই রাখালকে দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া উহার দিকে চাহিলেন। নিষ্প্রভ চোখের মণি দুইটি রাখালের উপর বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, কোথা হইতে আসা হইয়াছে?

রাখাল বৃদ্ধের নিকট নিজের পরিচয় দিলো। সেই সঙ্গে এইখানে আসিবার কারণ জানাইতে যাইয়া ব্রজবাবু ও রেণুর দৈহিক বর্ণনা, বয়স প্রভৃতির উল্লেখ করিতেও ভুলিল না। সবকিছু শুনিয়া বৃদ্ধ চোখ মিটমিট করিয়া কয়েক মুহূর্তে নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়াছে দেখিয়া বুঝা গেল, ব্যাপারটি তাঁহাকে খুবই ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

ইতিমধ্যে অন্য একজন প্রবীণ মঠবাসী পূজার ঘর গুছাইতে গুছাইতে উঠিয়া আসিলেন। রাখালের মুখে ব্রজবাবুর চেহারার বিবরণ শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, মনে হচ্ছে উনি মায়াপুরেই রয়েছেন।

রাখালের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিল। সে অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল, উনি কোথায় আছেন, কোথায় গেলে ওনার দেখা পাওয়া যাবে, বলতে পারেন? এটাই ত মুশকিলের ব্যাপার। নিশ্চয়ই ধারে কাছে কোন মঠে আশ্রয় নিয়েছেন। আসলে ওনার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ের অবকাশ হয়নি।

ওনাকে কোথায়, কি অবস্থায় দেখেছেন, দয়া করে বলবেন কি?

দেখো বাবা, মোট চার পাঁচদিন ওনাকে আমি দেখেচি। আজ থেকে প্রায় দশ-বারোদিন আগে এক সকালে গঙ্গার ঘাটে দেখি। উনি স্নান সেরে সূর্য-প্রণাম করছিলেন। আমি ভাবলুম, হয়ত কোন ভক্তজন, তীর্থধর্ম করতে এসে ধারে কাছের কোন মঠে উঠেছেন। দুই-একদিন থেকে আবার অন্যত্র চলে যাবেন।

সব শেষে কবে কোথায় নেমেছেন, মনে পড়চে?

এই তো গত পরশুদিন সকালেই দেখলুম। উনি এক মঠের ধারের বাগানে ফুল তুলছিলেন।

রাখালের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে প্রবীণ ভক্তটির দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া বলিল, কোন মঠ? কোনদিকে সে-মঠটা, বলুন ত?

নদীর ঘাটের কাছাকাছি। ঘাট থেকে উঠে কয়েক পা এগিয়ে এলেই ডান হাতে সে মঠটা পড়ে। নদীর ঘাট থেকে আসার সময় ওটাই প্রথম মঠ। দেখবে রাস্তার ওপরেই একটা কাঠের বোর্ডে লেখা রয়েছে, শ্রীশ্রী মহেশ পণ্ডিতের—

রাখাল তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, হাঁ, হাঁ দেখেচি বটে।

ওখানেই গত পরশু সকালে ওনাকে দেখেছিলুম। তুমি বাবা আগে ঐ মুখেই খোঁজ কর। আশা করি ওখানেই দেখা পেয়ে যাবে।

রাখাল মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া ব্রজবাবুর খোঁজে রওনা হইবার উদ্যোগ করিলেন। ব্যস্ততার সহিত মঠবাসী সন্ন্যাসী দ্বয়কে আভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। এইবার লম্বা লম্বা পায়ে সবিতার কাছে ফিরিয়া আসিল।

সবিতা তাহার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া কৌতূহলাপন্ন হইলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিতে করিতে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কি হে রাজু, তোমার মধ্যে কেমন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছি যে।

কি ব্যাপার, তোমার কাকাবাবুর সন্ধান কি কিছু পেলে ?

পথে যেতে যেতে সব কথা হবে নতুন-মা। এমন একটু পা-চালিয়ে হাঁটুন, অনেক-খানি পথ যেতে হবে।

পথ চলিতে চলিতে রাখাল সবিতার নিকট মঠবাসী প্রবীণ সন্ন্যাসীটির সহিত যাহা কিছু কথাবার্তা হইয়াছে সবিস্তারে সবিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মঠে পা দিয়াই সবিতা থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মুহূর্তে নিজের চোখ দুইটির ওপরও যেন তিনি আস্থা হারাইয়া ফেলিলেন। এইরকম একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ত সহজে বিশ্বাস করিবার মতও নহে। তিনি দেখিলেন, রেণু বাসন মাজিতেছে।

তাহার সহিত কথা বলিয়া সবিতা জানিতে পারিলেন। গ্রামের বাড়ি হইতে ব্রজবাবু প্রথমে নবদ্বীপধামে উপস্থিত হন। সেইখানে দুই-তিনদিন মঠে-মন্দিরে ঘুরিয়া মায়াপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাকে লইয়াই ব্রজবাবুর যাহা কিছু বিড়ম্বনা। কোন মঠেই বয়স্কা কন্যাকে লইয়া মঠে বসবাসের অধিকার পাইলেন না। শেষ পর্যন্ত এই মঠে আসিয়া অকূলে কূল পাইলেন তিনি। প্রবীণ অতিবৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ ব্রজবাবুর দুর্দশার কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, দেখো বাবা, জীবের দুর্দশা মোচন বৈষ্ণবের পরম ধর্ম। কিন্তু মঠের বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করাও সম্ভব নয়।

ব্রজবাবু করজোড়ে নিবেদন করিয়াছিলেন, বাবা, আপনি যদি আমার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল হয়েই থাকো তবে চেষ্টা করলে উপায় যা হোক একটি করে দিতে পারেন।

কি সে উপায়, তুমিই বল ত শুনি।

আমি একা হইলে আশ্রয় দিতে আপত্তি ছিল না, একটু আগেই আপনি বলেছেন।

হাঁ, এখনও বলচি, আপত্তি নেই।

তবে সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমার মেয়েটাকে নিয়ে, এই ত ?

অবশ্যই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, তবে আমায় হতাশ হয়েই ফিরতে হবে বাবা ? কোন উপায়ই কি করা সম্ভব নয় ?

আমার অক্ষমতার কথা ত সবই খুলে বললুম। মিছে আমার প্রতি বিরূপ ধারণা কোরো না যেন।

ব্রজবাবু প্রণাম সারিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, তবে যাই অন্যত্র চেষ্টা করি গে। জানি না, রাধামাধব অদৃষ্টে আরও কত কি লিখে রেখেছেন !

বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, শোন বাবা, তুমি বরং এক কাজ করতে পার। যে কয়দিন

অন্য কোন ব্যবস্থা না হয় তুমি বরং মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের ঐ নাটমন্দিরে থাক।

ব্রজবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। প্রসন্ন মুখে বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষের দিকে চাহিলেন।

মঠাধ্যক্ষ বলিয়া চলিলেন, তোমরা নাটমন্দিরেই থেকে যাও। মঠ থেকেই দু'বেলা প্রসাদ পাবে। তবে হাঁ, মঠের স্বার্থে তোমাদেরও কিছু করণীয় থাকবে।

আপনি অনুগ্রহ করে বলুন, কি করতে হবে আমাদের?

তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। মঠে কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকেন, দেখতেই ত পাচ্ছ। একজন ঠিকা ঝি ছিলো। দু'বেলা বাসন কোসন মেজে দিয়ে যেতো। ও আবার কয়দিন যাবত রোগে শয্যাশায়ী। ওর কাজকর্ম তোমার মেয়েটা চালিয়ে নিতে পারবে না? অভ্যেস না থাকলে অসুবিধে একটু আধটু হবে ঠিকই। তবে তুমি সঙ্গে হাতা-হাতি ধরলে ব্যাপারটাকে আর সমস্যা বলেই মনে হবে না।

ব্রজবাবুর পিঠে কে যেন অকস্মাৎ কষাঘাত করিল। এমন প্রস্তাব কোনদিন কাহারও মুখ হইতে শুনিতে হইবে, স্বপ্নেও ভাবেন নাই তিনি। ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে নিষ্পলক চোখে বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষের দিক চাহিয়া রহিলেন। কোন অদৃশ্য শক্তির বলে তাঁহার মুখে সামান্য টু-শব্দটি করার ক্ষমতাও যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। রাগে-দুঃখে-অপমানে তিনি ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার আকস্মিক পরিবর্তনটুকু বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষের নজর এড়াইল না। তিনি ফোকলা দাঁতে ম্লান হাসিয়া বলিলেন, আমি বোধ হয় বৃথাই তোমার ব্যথার কারণ হলুম বাবা?

ব্রজবাবু নিজেকে সামলাইয়া, জোর করিয়া কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিলেন, ব্যথা? কই না ত! আমি কিছুই মনে করি নি। এ-ত পুণ্য অর্জনেরই সহায়ক হবে বাবা। আপনাদের বিশেষ করে আপনার মত একজন পরম বৈষ্ণবের সেবা করার সুযোগ পেলে আমরা বরং নিজেদের জীবন ধন্য জ্ঞান করব।

তবে আজ থেকেই কাজে লেগে যাও, কি বল?

তাহার পর হইতে ব্রজবাবু ও রেণু এই মঠেই অবস্থান করিতেছেন।

যাহাই হউক মঠে পা দিয়াই সবিতা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। দেখিলেন, ব্রজবাবু হাঁড়ির উপর কাপড় তুলিয়া ইঁদারা হইতে বালতি করিয়া জল তুলিয়া রেণুর কাজে সাহায্য করিতেছেন। আর রেণু? কিছু দূরে হামাগুড়ি দিয়া বাসন মাজিতেছে। তাহার সম্মুখে অরাশিকৃত থালা, ঘটি, বাটি ও কড়াই প্রভৃতি। ব্রজবাবু সবিতা ও রাখালের দিকে পিছন ফিরিয়া কাজে আত্মমগ্ন, তাই তাঁহাদের উপস্থিতি জানতে পারেন নাই।

সবিতা কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনি। একবার ভাবিলেন, দূরে সরিয়া দাঁড়াইবেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের দেখিলে ব্রজবাবু ও রেণু উভয়েই দারুণ অপ্রস্তুতে পড়িবেন, লজ্জায় এতটুকু হইয়া যাইবেন। এইরকম অনুমান করিয়া সবিতা অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সরিয়া থাকিবার মানসে রাখালকে লইয়া গোপন অন্তরালে চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন। ব্রজবাবু অকস্মাৎ ঘাড় ঘুরাইয়া সামনে সবিতা ও রাখালকে দেখিতে পাইলেন। প্রথমে কেমন যেন একটু

ংকোচ, একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, নতুন-বৌ।

সবিতা অকস্মাৎ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন সজোরে হার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া বাক্‌শক্তি রহিত করিয়া দিয়াছে। অপলক চোখে তাঁহার দকে চাহিয়া রহিলেন। চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল নিজের অজ্ঞাতে কখন আসিয়া ড় করিয়াছে, টেরই পান নাই।

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, নতুন-বৌ, ফিরে যাচ্ছিলে যে? আমার পরিস্থিতি দেখে লজ্জা পাচ্ছিলে, নাকি আমাকে লজ্জা দিতে, অপ্রস্তুতে না ফেলতেই গা-ঢাকা দবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলে?

সবিতা কি বলিবেন হঠাৎ করিয়া গুছাইয়া উঠিতে পারিলেন না। দীর্ঘশ্বাস ফলিয়া কহিলেন, মেজকর্তা! ইতিমধ্যে তাঁহার চোখের কোলের জলবিন্দু দুইটি নিচ্যুত হইয়া গাল বাহিয়া অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে।

ব্রজবাবু মুখে জোর করিয়া হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, তুন-বৌ, রাধামাধবের হয়ত এটাই ইচ্ছা ছিলো। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কিছুই ার যো নেই।

রাখাল আগাইয়া গিয়া ব্রজবাবুর হাত হইতে দড়ি-বালতি কাড়িয়া লইলো। ইঁদারা তে জল তুলিয়া ব্রজবাবুর অবশিষ্ট কাজটুকু সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলো।

ব্রজবাবু সবিতাকে লইয়া পাশের একটি প্রশস্ত চাতালের উপরে গিয়া বসিলেন। পড়ের কোছা দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, দেবসেবা সবার ভাগ্যে জোটে না ন-বৌ।

দেবসেবা নয়, তার চেয়ে বরং বল দেবতার ভক্তদের সেবা। সবিতা বলিলেন, তাই ঝি দেবতার ভক্তদের সেবার মধ্যে নিজেকে দেবসেবার উপযুক্ত করে নিচ্ছ মেজকর্তা? বার বেশ একটু কড়া স্বরেই বলিয়া উঠিলেন, মেজকর্তা, এভাবে আর কতদিন ঘপ্রবঞ্চনা করবে, দয়া করে বলবে কি?

কথাটা হয়ত একটু ঘুরিয়ে বল্‌লে নতুন-বৌ। তার চেয়ে বল আত্মপীড়ন। কি কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়েই ত মানুষের পরমপ্রাপ্তি সম্ভবনাময় হতে পারে? ব ছেদো কথায় আমায় আর ভুলাতে পারছ না মেজকর্তা। আমি শুধু এটুকুই ঝ, এখনও তোমার অনেক কর্তব্য বাকি রয়েচে। তোমার নিজের কথা ছেড়ে দিলেও র ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তোমার নেই। আমি বলে রাখছি কর্তা, এর জন্য তোমাকে একদিন না একদিন জবাবদিহি করতেই হবে।

ব্রজবাবু নীরবে সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সবিতা বলিয়া চলিলেন, রেণুকে না হয় অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে প্রবোধ দেবার বৃথা করবে, কিন্তু নিজের কাছে কি জবাদিহি করবে, কি দিয়ে প্রবোধ দেবে, বলতে মেজকর্তা? সে দিন কিন্তু অন্তর্জ্বালা শত গুণ বৃদ্ধি পাবে, প্রতিনিয়ত দগ্ধে হবে। তোমার অতিমাত্রায় ধর্মবোধ, সততা আর ন্যায় পরায়ণতার খেসারত

দিতে হচ্ছে রেণুকে। তার কি অপরাধ, বলতে পার মেজকর্তা?

ব্রজবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরবে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে রাখাল ব্রজবাবু ও রেণুর যৎসামান্য যা কিছু জিনিসপত্র সবই একটি গামছা দিয়া পুটুলি বাঁধিয়া নিলো। ব্যস্ত পায়ে ব্রজবাবু ও সবিতার কাছে আসিয়া বলিল, চলুন কাকা বাবু, এই ট্রেনটা না ধরতে পারলে সারা রাত স্টেশনেই কাটাতে হবে।

ব্রজবাবু হতভম্বের মত প্রথমে রাখালের মুখের দিকে, আবার পরমুহূর্তে সবিতার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

সবিতা গাত্রোত্থান করিতে করিতে বলিলেন, কয়দিন ধরে শরীরের ওপর খুব ধকল যাচ্ছে। আমি বাপু স্টেশনে বসে রাত কাটাতে পারব না। ওঠ, তাড়াতাড়ি চল চেষ্টা করে দেখা যাক, ট্রেনটি যদি ধরা যায়।

ব্রজবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জানি না রাধামাধব আমাকে দিয়ে আরও কি কি করাতে চাচ্ছেন। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ঠাকুর। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

## কুড়ি

গাড়ী হাওড়া স্টেশনে আসিয়া ভিড়িল।

সবিতার মনে উচ্ছ্বসিত আনন্দের জোয়ার। ইস্পাতের মত অনমনীয় ব্রজবাবু এই প্রথম তিনি একটু নরম করিতে পারিয়াছেন। না ভাঙিলেও একটু মচকাইয়াছেন, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাখালের মনেও আনন্দ কম হয় নাই সহজ সরল ব্রজবাবুর জন্য কিছু করতে পারার আনন্দ তার মনে আনন্দের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁহার নতুন-মা'র হর্ষ উৎপাদন করিবার প সার্থক হওয়ায় তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে এক অনাস্বাদিত আনন্দ তাহাকে উ করিয়া তুলিল।

ট্রেন হইতে নামিয়া রাখাল সকলকে লইয়া প্লাটফর্মের বাহিরে আসিল। তাহা একটি বেঞ্চে বসাইয়া নিজে চলিল ঘোড়ার গাড়ীর খোঁজে। ঘোড়ার গাড়ীর আ স্টেশন ছাড়াইয়া বড়-রাস্তার বিপরীত প্রান্তে। দিনের বেলা স্টেশনের সামনে দাঁড়াই অনেক সময় পথচারী খালি গাড়ী সংগ্রহ করিতে অধিক বেগ সইতে হয় না। কি এত রাত্রে আড্ডায় না গেলে গাড়ী পাইবার উপায় নাই। রাখাল ব্যস্ত পায়ে আগা চলিল।

রাখাল গাড়ীর খোঁজে বহুক্ষণ গিয়াছে। ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া ব্রজবাবু সবিতা প্রথমে ভাবিলেন, রাত অনেক হইয়াছে। আড্ডায় গিয়া রাখাল হয়ত গাড়ী পাইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ত ব্যাপারটি লইয়া ভাবনায় পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য চ্যুতি ঘটায় ব্রজবাবু

ও রেণুকে বসাইয়া গুটি গুটি স্টেশন হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তার দিকে আগাইয়া গেলেন। কয়েক পা যাইতেই অদূরে রাস্তার ধারে কয়েক জনকে ভিড় করিয়া ব্যস্তভাবে কি যেন বলাবলি করিতে দেখিলেন, কৌতূহল বশতঃ তিনি সেইদিকে আগাইয়া গেলেন। ভিড় ঠেলিয়া উঁকি দিতেই তাঁহার শরীরের সব কয়টি স্নায়ু যেন এক সাথে সচকিত হইয়া উঠিল। মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। পার্শ্ববর্তী একজনের কাঁধে ভর দিয়া কোনক্রমে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। রক্তাপ্লুত রাখালকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য পরোপকারব্রতী কয়েকজন উদ্যোগ-আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কৌতূহলী জনতার পারস্পরিক কথাবার্তা হইতে ব্রজবাবু এইটুকু উদ্ধার করিতে পারিলেন ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় যাইবার সময় ব্যস্ততা বশতঃ রাস্তা অতিক্রম করিতে যাইয়া এক দ্রুতগামী মোটর গাড়ীতে চাপা পড়ে। গাড়ীর মালিক অন্ততঃ অমানবিক আচরণ করেন নাই। রাত অধিক হওয়ায় দোকান পসার অনেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পথচারীর সংখ্যাও অনেক কম। তিনি ইচ্ছা করিলে রাখালকে চাপা দিবার পর অনায়াসেই গাড়ী লইয়া গা ঢাকা দিতে পারিতেন। তাঁহার কর্তব্যবোধ তাঁহাকে অমানবিক আচরণ করিতে উৎসাহ দেয় নাই।

রাখালকে লইয়া সেই মোটর গাড়ী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উপস্থিত হইল।

রাখালের দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ামাত্র সারদা উন্মাদিনীর প্রায় হাসপাতালে ছুটিয়া আসিল বিষণ্ণ মুখে ডাক্তার জানাইলেন, রক্ত দরকার। তাড়াতাড়ি রক্ত প্রয়োগ করিতে না পারলে আহত রোগীকে বাঁচানো যাবে না।

বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি সারদা আগাইয়া যাইয়া বলিল, আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত। আমার রক্ত যদি রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় আপনি ব্যবস্থা করুন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সবিতার শরীর হইতে রক্ত লইয়া রাখালের দেহে প্রয়োগ করা সম্ভব হইল।

পরদিন দুপুরেও রাখালের জ্ঞান ফিরিল না। সবিতা অতন্দ্র প্রহরীর মত সর্বক্ষণ তাহার শিয়রে বসিয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ মেলিয়া চাহিল। অত্যগ্র আগ্রহান্বিত হইয়া সারদা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিল। রাখাল তাহাকে চিনিতে পারিল কিনা বুঝিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মোটর গাড়ীর মালিক ভদ্রলোক আবার আসিয়া রাখালকে দেখিয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেছেন। সারা রাতও রাখালের সংজ্ঞাহীন অবস্থায়ই কাটিল। সবিতা ও ব্রজবাবু শত চেষ্টা করিয়াও সারদাকে তাহার শয্যা পার্শ্ব হইতে উঠাইতে পারিলেন না। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত তাহাকে গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। শেষ রাত্রির দিকে রাখালের জ্ঞান ফিরিল। অসহ্য যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করিতে লাগিল। চোখ মেলিয়া চাহিল। সারদা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, দেবতা, কিছু বলবেন? রাখাল অস্ফুট উচ্চারণ করিল, জল। একটু জল।

সারদা এক চামচ জল লইয়া তাহার মুখে দিল। আরও কয়েকবার যন্ত্রণাকাতর রাখাল ছটফট করিবার পর আবার ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, নতুন-মা, আমি এখন কোথায় নতুন-মা ?

সারদা তাহাকে মিথ্যা প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল, কেন ?

আপনি ত আপনার বাসায়ই রয়েছেন দেবতা।

রাখাল তাহার কথার কতখানি শুনিল, কি বুঝিল সে ই জানে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার চোখ বন্ধ করিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইভাবে তিন-তিনটি দিন কাটিল। চতুর্থদিন সকালে রাখাল পরিপূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। সে সেই দিনই প্রথম বুঝিতে পারিল, পথ দুর্ঘটনায় তাহার একটি অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। তাহার বাঁ পাটি কাটিয়া বাদ দিয়া দিতে হইয়াছে। তাহার মত সবলচেতা যুবকের চোখেও জলবিন্দু দেখা দিল। সে কাতর আর্তনাদ করিয়া উঠিল, এ কী হয়ে গেল সারদা! আমাকে সারাটা জীবন পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে! বরং এর চেয়ে ত মৃত্যু হওয়াই অনেক ভাল ছিল। কেন আমি বাঁচলুম সারদা! তবে কেন বাঁচলুম!

সারদা অস্থিরচিত্ত রাখালের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, এমন করে ভেঙে পড়লে চলবে কেন দেবতা! মানুষ পরিস্থিতির দাস, আপনিই না আমাকে বহুবার প্রবোধ দিয়েছিলেন ? এখন আপনি নিজেই যদি এমন করে ভেঙে পড়েন, চলবে কেন। ধৈর্য ধরুন, মনকে শক্ত করুন দেবতা।

কি দিয়ে মনকে বুঝাব, ভাবতেই পারছি নে!

সারাটা জীবন পঙ্গু হয়ে—না, আমি ভাবতে পারছি নে!

আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে! আমি আর—

তাহাকে থামাইয়া দিয়া সারদা বলিল, এ কী করছেন দেবতা! আপনি দশজনকে উপদেশ ও প্রবোধ দিয়ে মুশকিল আসান করেছেন। কিন্তু সেই আপনিই আজ এমন অবুঝ হচ্ছেন, ভাবলে অবাক হতে হয়! আপনাকে প্রবোধ দেবার ভাষা আমার অন্ত নেই দেবতা।

দীর্ঘ সতেরদিন হাসপাতালে কাটাইয়া রাখাল তাহার বাসায় ফিরিয়া আসিল সবিতার ইচ্ছা, রাখাল তাঁহার বাড়িতেই বসবাস করুক। কারণ কে-ই বা তাহাকে দেখাশুনা করিবে ? তাঁহার মুখের উপর অসম্মতি জানাইতে না পারিলেও রাখাল মনে মনে ইহাই সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। সে তাহার নিজের বাসা-বাড়িতেই ফিরিয়া গেল। নিজের জন্য কাহাকেও বিরক্ত করিবার এতটুকুও ইচ্ছা তাহার কোনদিন ছিল না আজও নাই।

সবিতা নিজে যাইয়া গাড়ী করিয়া রাখালকে লইয়া আসিলেন। রাখাল এখন কাহার ভর দিয়া কোনরকমে চলাফেরা করিতে পারে।

সন্ধ্যায় সারদা রাখালের শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, দেবতা, আপনিই না একদিন আমাকে প্রবোধ দিয়েছিলেন, যে কোন পরিস্থিতি

সঙ্গে যে মোকাবেলা করতে পারে, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে-ই মানুষ নামের যোগ্য। আর আজ সে-ই আপনিই কিনা—

তাহার কথা মাঝ পথে থামাইয়া দিয়া রাখাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেন বাঁচিয়ে তুললে সারদা? এ পঙ্গুত্ব নিয়ে আমি কি করে সারাটা জীবন কাটাব, বলতে পার?

আপনি ত মরতে চান নি, মরবেন বলে মোটর গাড়ীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্ম-হননের চেষ্টাও করেন নি দেবতা। বরং ঘটনাচক্রেই আপনি এ-মর্মান্তিক দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। একদিন মরতে চেয়েছিলাম আমি। আত্মহননই সে মুহূর্তে আমার একমাত্র কাম্য ছিল। কিন্তু আপনি? আপনি আমাকে যমের হাত থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে এনেছিলেন।

বাঁচিয়ে তুলে সে-প্রতিশোধই কি আমার ওপর নিলে সারদা?

সারদা আচমকা আঘাতটুকু সহ্য করিতে পারিল না। রাখালের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আপনি না মানলেও আমি অন্ততঃ ভাগ্যকে অস্বীকার করি না, করতে পারিও নি কোনদিন। আমার অতীত, বর্তমান এমন কি ভবিষ্যতের জন্যও পুরোপুরি ভাগ্যকেই দায়ী করব। তাছাড়া আপনার ত অজানা নয় দেবতা, মেয়েরা খুবই দুর্বল—অবলা।

ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পনকেই আমরা একমাত্র উপায় বলে মনে করি। নয়ত আমার এই ছোট্ট জীবনটুকুর কথাই একবারটি ভেবে দেখুন ত। চারদিক থেকে কেবল-মাত্র অবহেলা, ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যই কুড়িয়ে গেলুম। বিয়ের আগে অপরের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে গায়ে গতরে বেড়ে ওঠলুম। হ'ল বিয়ে। ভাবলুম, ভাগ্য-দেবতা বুঝি মুখ তুলে তাকালেন। দু'দিনেই আমার সে-ভুল ভেঙে গেল। অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা সারদার না ছিল বিচার-বুদ্ধি, না ছিল কর্তব্য নির্দ্ধারণের মত বাস্তব জ্ঞান। তা-ও স্বল্প স্থায়ী। আমাকে কর্তব্য নির্দ্ধারণের সামান্যতম অবকাশ না দিয়েই আমার স্বামী-দেবতাটি পৃথিবী থেকে সরে পড়লেন। অন্ধকার নতুনতর রূপ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হ'ল। জলে ভাসমান মানুষ যেমন এক টুকরো কাঠের প্রত্যাশায় চারদিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকায়, আমিও জমাটবাঁধা অন্ধকারে এতটুকু অবলম্বনের প্রত্যাশায় উদভ্রান্তের মত চারদিকে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করলুম। হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলুম জীবনবাবুকে। তিনি বিয়ে করার মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে বের করে নিয়ে এলেন। সুযোগ বুঝে তিনি আমাকে একাকী এখানে ফেলে রেখে নীরবে গা-ঢাকা দিলেন। ব্যস, আমি আবার অকূলে ভাসলুম। তারপর আত্মহননের চেষ্টা করলুম। আপনি তাতে বাদ সাধলেন। আমায় যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দশজনের কাছে মহত্বের পরিচয় দিলেন। নিজের সামান্য খ্যাতির লোভে আমায় আবার অবহেলা ও অবজ্ঞার জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুকে ঠেলে দিলেন।

রাখাল আর্তনাদ করিয়া উঠিল, সারদা! এসব কি বলছ।

ঠিকই বলছি দেবতা। কেউ আমার চিনতে পারলেন না। আমায় যিনি বিয়ে করে

ঘর বাঁধলেন তিনি না, যিনি বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে এনেছিলেন তিনিও না, আর যিনি আমায় মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন, তিনিও আমায় চিনতে পারলেন না। কলঙ্কহীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমায় এড়িয়ে চলতেই বেশী আগ্রহী। এবার আপনিই বলুন দেবতো, এর পরও কি আমার পক্ষে বলা সম্ভব যে, ভাগ্য বলে কিছু নেই ?

সারদা, জীবনবাবুকে কোনদিন চোখে দেখিনি, তোমাদের বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের মুখে তাঁর কথা শুনেছিমাত্র তবে কি তুমি যা বললে তা-ই সত্য, তিনি তোমার স্বামী নন ? তাই ভয় ছিলো তিনি যদি কোনদিন ফিরে এসে তোমাকে দাবী করেন কি জবাব দেব ? তুমিই বা মুখ দেখাবে কি করে ?

আপনি যা জানেন, ভাড়াটেদের মুখে যা কিছু শুনেছেন, সবই মিথ্যা। ডাহা মিথ্যা কথা দেবতা। আপনাকে তো এইমাত্রই বললুম। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর জীবনবাবু আমার জীবনে মিথ্যা আশার আলো নিয়ে উপস্থিত হন। আমি তাঁর চটুল কথায় ভুলে যাই। বিয়ের প্রলোভনে পড়ে গোপনে তাঁর হাত ধরে আমি পথে নামি। ভাসতে ভাসতে এই বাড়িতে এসে হাজির হই। কিছুদিন যেতে না যেতে তাঁর মনের অসৎ প্রবৃত্তির কথা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। বুঝতে পারি বিয়ে করার ইচ্ছে তাঁর নেই, সাধ্যও নেই।

কেন ? সাধ্য ছিল না কেন ? তোমায় বিয়ে করার বাধা কোথায় ?

কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি মুখ ফসকে বলে ফেলেন, তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিজন সবই রয়েছে। বাঁধল পরস্পরের মধ্যে সংঘাত। আমার কাছে ব্যাপারটা একেবারে ছবির মত পরিষ্কার হয়ে গেল দেবতো, আমাকে ক্ষণিকের জন্য ব্যবহার করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই দুশ্চরিত্র লোকটি আমাকে বাড়ি থেকে এনে এখানে তুলেছেন শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে একদিন স্বার্থ গৃধ্নু বনের পাখী উড়ে গেল। আমি এখানে পড়ে রইলাম আপনাদের সবার তাচ্ছিল্য কুড়োবার জন্য। একটা কথা বলতে পারেন দেবতো, আমাকে আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয় থেকে তুলে এনে তিনি কার ভরসায় এখানে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেলেন ? তিনি কি আমার কাছে ফিরে আসার রাস্তা খোলা রেখেছেন ? কোন মুখেই বা আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন তাঁর সে-সারদা আর বেঁচে নেই। সে বিষ খেয়ে মারা গেছে। নিজের নয়, তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে অত্যুগ্র আগ্রহ হয়েছিল। আজ যে-সারদাকে দেখছেন, সে অন্যজন, অন্য সারদা। তার পুনর্জন্ম হয়েছে। তার পরে আর কারো দাবী নেই। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে সারদা ধীরে ধীরে মুখ তুলল। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে বলিল, দেবতো, সব শুনলেন তাতে আমার প্রতি আপনার মন ঘৃণা-বিদ্বেষে ভরে উঠেছে, তাই না ?

রাখাল সারদার আঁচলটি তুলিয়া লইয়া তাহার জলে ভেজা চোখ দুইটি মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল সবিতো, তোমার কথায় আমার মনে নতুন ঘৃণার সঞ্চার হয় নি। বরং অতীতে যেটুকু ঘৃণা-বিদ্বেষ-দ্বিধার সঞ্চার হয়েছিল। তোমার চোখের জল তা নিঃশেষে

ধুয়ে-মুছে দিয়েছে। আজ বুঝলুম, তোমার সম্বন্ধে যেটুকু জানতুম, সবই মিথ্যা, তোমার পরিচিতদের কাল্পনিক কাহিনীমাত্র।

রাখাল বুঝিল, সারদার জীবন-কাহিনীতে এতটুকুও মিথ্যার স্থান নেই। তাহাকে ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এই মুহূর্তে সেই ইচ্ছাও তাহার নাই। সে আজ নিঃসংশয়ে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নিজেকে নির্দ্বিধায় তাঁহার হাতে উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাকে ফিরাইবে কি বলিয়া কিসের সংকোচে আর কোন বৃহত্তর আশার আলোর লোভে? কিন্তু তবু দ্বিধার কালো মেঘ অন্তরের অন্তঃস্থলে উঁকি দেয়। নিজের অজান্তে মনের দিক থেকে অকস্মাৎ দুই কদম পিছাইয়া যায়। সংস্কার মাথার চারদিকে ভিড় করে। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া পিছন ফিরাইয়া দিতে চায়। কানে কোন অদৃশ্য কণ্ঠ যেন অনুচ্চ কণ্ঠে বার বার বলে, সারদা বিধবা। অজ্ঞাত কণ্ঠ যেন বার বার ধিক্কার দিয়া উঠে, ছিঃ! ছিঃ! সারদা নিন্দিতা! তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর সে কুলত্যাগ করে পথে নামে। প্রলোভনে পড়িয়া সৈরাচারের কলঙ্ক প্রলেপ তাহার সর্বাঙ্গে। এমন এক মেয়েকে কি করিয়া রাখাল স্ত্রীর আসনে বসাইবে? বন্ধুমহলে, পরিচিত সমাজের কাছে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবেই বা কি করিয়া? সেই দুঃসাহস ভবিষ্যতে যদি তাহার মনে অক্ষুণ্ণ না থাকে। যদি তার চিত্তদৌর্বল্য দেখা দেয়। তখন? তখন কি সে জীবনবাবুর মত নিজের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিবে? এঁটো পাতার মত অবহেলা অবজ্ঞা করে তাহাকে ফেলিয়া গোপনে গা-ঢাকা দিবে? না, তা হয় না, হইতে পারে না। এতবড় অমানবিক আচরণ কিছুতেই রাখাল করিতে পারিবে না। এই রকম কিছু ভাবিতেও নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে বিদ্বেষে মন-প্রাণ বিষিয়ে ওঠে।

রাখালের নীরবতা লক্ষ্য করিয়া সারদা কহিল, দেবব্রতা, আপনি একদিন বলেছিলেন, জীবনে এমন অনেক সারদাকে আপনি দেখেছেন।

রাখাল নীরবে তাহার মুখে নিবদ্ধ করিল। সারদা এইবার বলিল, ভুল দেবব্রতা! আমায় সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। এতদিন ভুল বুঝে আমায় অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে দিয়েছেন! অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমার সংস্রব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন।

রাখাল তবু নির্বাক রহিল।

সারদা বলিয়া চলিল, ভুল! এ আপনার ভুল দেবব্রতা। সারদা একটাই। সারদা অদ্বিতীয়া। আর যাদের দেখেছেন বলেছিলেন, তারা অন্য কেউ, সারদা নয়। আঁচলটি আবার চোখের উপর উঠিয়া গেল। সারদা কান্নাপ্লুত ভাঙা গলায় উচ্চারণ করিল, দেবব্রতা, আমাকে আপনি ফিরাবেন কি বলে? এক অসহায় মেয়ে যে নিজের সর্বস্ব হাসিমুখে আপনার চরণে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। আপনার মধ্যে যে বাঁচার আনন্দ ফিরে পেয়েছে, তাকে আপনি ফিরাবেন কি বলে?

রাখাল মুখ খুলিল, সারদা, একদিন তুমি যে দেবব্রতাকে মনে-প্রাণে কামনা করেছিলে, যার হাতে নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করে তিলোত্তমা হয়েছিলে তোমার যে দেবব্রতা সে আজ মৃত। তার জায়গায় যাকে দেখছ, সে এক পঙ্গু। চলার সামান্যতম শক্তিও

তার নেই। যাকে দিয়ে কারো কোন উপকার হবে না। বরং সারাটা জীবন তাকে অপরের বোঝা হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হবে। অপরের কাছ থেকে হাত পেতে দয়া দাক্ষিণ্য গ্রহণ করা ছাড়া তার যে কাউকে কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই। এমন এক পঙ্গু দেবতাকে নিয়ে তুমি কি করবে? তাকে বরং দশজনের দয়া দাক্ষিণ্য কুড়িয়েই বাঁচতে দাও সারদা।

সারদা কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমি আমার দেবতাকে মনে-প্রাণে কামনা করেছিলুম এতদিন। আজও ঠিক তেমনি কামনা করছি। সেদিন যেমন তাঁর ভাল-মন্দ, দোষগুণের কথা ভাববার অবকাশ ছিল না, আজও তাঁর পঙ্গুত্ব নিয়ে ভাববার সুযোগ নেই। অস্থিরচিত্তা সারদা রাখালের বুকে মুখ গুজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি শুধু তোমায় চেয়েছি দেবতা। তোমার পঙ্গুত্বকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। আর আমি এ-ওজানি দেবতা, জীবনবাবুর মত কাপুরুষ অন্ততঃ তুমি নও।

রাখাল ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, সারদা, এখনও সময় আছে। ভাল করে ভেবে দেখ। নিজের মনের সঙ্গে শেষ বারের মত বোঝাপড়া কর, আমার মত একজন রাজভিখারীকে জীবন সঙ্গী করে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় হয়ে ওঠবে না-ত? সব চেয়ে বড় কথা আমার মত একজন পঙ্গুর ভার আজীবন বইতে পারবে কিনা, ভেবে দেখ সারদা।

দেবতা, এমনও ত হতে পারত তোমাকে আপন করে একান্ত নিজের করে পাবার অব্যবহিত কাল পরেই তুমি পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হতে পারতে। তখন কি আমি তাকে আমার ভবিতব্য বলে গ্রহণ করতুম না? আর ভার বহনের কথা বলছ? আচ্ছা দেবতা, তোমরা, পুরুষরা মেয়েদের এত দুর্বল ভাব কেন, বলতে পার? কেন মনে কর কেবল পুরুষরাই ভার বহণ করতে সক্ষম মেয়েরা পারে না? আমি তোমার সে ভুল ভাঙিয়ে দেব। আমি তোমার যাবতীয় দায়িত্ব হাসিমুখে মাথা পেতে নিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেচি দেবতা।

এতই যদি তোমার আত্মবিশ্বাস তবে সেদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে কেন, বলতে পার?

সারদা ঠোঁটের কোনে দুষ্টুমিভরা হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল কেন বলত দেবতা?

রাখাল নীরবে সারদার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সারদা আঙুল দিয়া রাখালের চুলে বিলি কাটিতে কাটিতে বলল, পারলে না ত? তবে স্বীকার করছ দেবতা, তুমি হেরে গেছ? বলছি তবে শোন—আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম এ পৃথিবী থেকে পালিয়ে অব্যাহতি পাবার জন্য নয়। মরার জন্য আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম, এই বুঝি তুমি সেদিন ভেবেছিলে?

তবে?

আত্মহত্যা করতে না গেলে তোমাকে যে কাছে পেতুম না দেবতা। আজও আমার

কাছে তুমি অজানা-অচেনাই রয়ে যেতে। কথা কয়টি কোন রকমে শেষ করিয়া সারদা রাখালের বুকে মুখ গুঁজিল। তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া নামিয়া আসিল আনন্দাশ্রুর ধারা।

রাখাল হাত বাড়াইয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল, সারদা, তুমি এতদিন আমার এত কাছে থেকে দূরে সরে ছিলে। না, আমারই ভুল, তুমি না, আমিই অবজ্ঞা অবহেলা আর দ্বিধাভরে তোমায় দূরে ঠেলে দিয়ে ছিলুম। আজ আমার একটি পা বিসর্জন দিয়ে সে ভুলের মাশুল দিলুম সারদা। এতদিন তুমি আমার কাছে আশ্রয় চেয়ে ছিলে, পায়ের তলায় একটুখানি মাটি খুঁজে পেতে চেয়েছিলে। কিন্তু আমার আত্মমর্যাদাবোধ, ঠুনকো অহমিকা আর সমাজ-সংসারের ঘৃণার আশংকায় তোমায় অনাদরে দূরে ঠেলে দিতেও কুণ্ঠিত হইনি। কিন্তু তুমি? আজ সেই তুমি আমার সার্বিক অসহায়ত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করে হাসিমুখে আমাকে বুকে টেনে নিলে!

সারদা শিশুর মত কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, আজ সেসব কথা থাক দেবতা। তোমাকে একান্ত নিজের করে পেতে চেয়েছিলুম, পেয়েছি। আজ এসত্যটুকুই আমার কাছে বড় হয়ে থাক দেবতা। পরম পিতার কাছে এ মুহূর্তে আমার একটি মাত্রই প্রার্থনা, তোমার ভার বহন করার মত ক্ষমতাটুকু থেকে তিনি যেন কোনদিন আমায় বঞ্চিত না করেন।

## একুশ

সবিতা ব্রজবাবু ও রেণুকে লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। যাহার ঐকান্তিক আগ্রহে ও অকৃত্রিম চেষ্টায় তিনি এমন একটি অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার সেই আদরের দুলাল, চোখের মণি রাখালরাজ— রাজু আজ হাসপাতালের শয্যায় শুইয়া। ডাক্তার তাহার যন্ত্রনাকাতর দেহটিকে সাময়িক স্বস্তি দিবার জন্য মরফিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন! কিন্তু সে আর কতক্ষণ? মরফিয়ার স্নায়ু গুলিকে নিষ্ক্রিয় করিবার তেজষ্ক্রিয় ক্ষমতা অপেক্ষা যন্ত্রনা অনেকাংশে অধিক হওয়ায় তাহাকে অধিক সময় সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে তাহার যে কী সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, রাখাল জানিতেও পারিল না। অভিজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তার সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াছেন তাহার পাটিকে রক্ষা করিতে। কিন্তু তাঁহার সার্বিক প্রয়াস নির্মমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া তাহার বাঁ পাটিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাদ দিয়া দিতেই হইল। সারদা সর্বক্ষণ আহার-নিদ্রা জলাঞ্জলি দিয়া অতন্দ্র প্রহরীর মত তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। শত চেষ্টা করিয়া এক মিনিটের জন্যও তাহাকে সেই স্থান হইতে সরানো সম্ভব হয় নাই। সতী সাবিত্রীর মত যমের মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য মানসিক দৃঢ়তা লইয়া তাহার দেবতার শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

সেই মোটরের চাকার আঘাতে রাখালের জীবনে এই চরমতম দুর্দশা নামিয়া আসিল। তাহার মালিক দুইবেলা নিয়মিত আসিয়া ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করিয়া কর্তব্য সম্পাদনের কোনরকম ত্রুটি রাখিতেছেন না। তাহার উপর ভদ্রলোক আবার বিমলবাবুর বাল্যবন্ধু। বিমলবাবুও নিয়মিত হাসপাতালে আসেন। সবিতা আর ব্রজবাবুও তাহাকে লইয়া উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবধি নাই।

প্রায় দীর্ঘ একমাস হাসপাতালে কাটাইয়া রাখাল ক্রাচে ভর দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। সবিতার ইচ্ছা ছিল, তাহার বাসায় থাকিয়া সে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করে। কিন্তু রাখাল তাহাতে সম্মত হয় নাই। সে কারণ দেখাইল, সারদা ত কাছে কাছেই রইল। প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য যেকোন মুহূর্তে ছুটিয়া যাইতে পারিবে। সবিতাও তেমন পীড়াপীড়ি করিলেন না।

এইদিকে ব্রজবাবু একরকম আশ্রিতের মতই রেণুকে লইয়া সবিতার কাছে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রান্না ও তাহার পূজার যাবতীয় কার্যাদি রেণুই করে। সবিতার হাতের ছোঁয়া খাইলে ধর্মভ্রষ্ট হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। আজও তাঁহার সেই মনোভাবের যে এতটুকুও পরিবর্তন হয় নাই, সবিতা বুঝিয়াও এতদিন না বুঝিবার ভান করিয়া থাকিতেন। এমন ভাব দেখাইতেন, যে-দেবতা যে নৈবেদ্যে তুষ্ট হোন, আপত্তি নাই। আসলে রাখালের জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বশতঃই তিনি এইদিকটি গুরুত্ব দিবার অবকাশ পান নাই। মনের দিক হইতে তেমন উৎসাহ ছিল না বলিলে সত্যের অপলাপই করা হইবে।

রাখাল আজ হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহার জীবন লইয়া টানাটানি চলিয়া ছিল সে যে একটিমাত্র পা হারাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে সে জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাইতেই হয়।

ব্রজবাবু সান্ধ্য-আহ্নিক সারিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করিতেছেন। রেণু হেঁসেলে রাতের খাবার তৈরীর কাজে ব্যস্ত। সবিতা ধীর-পায়ে ব্রজবাবুর ঘরে ঢুকিলেন। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি বলিলেন, মেজকর্তা, দেখতে দেখতে একমাস পূর্ণ হয়ে গেল, তাই না?

ব্রজবাবু পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছোট্ট করিয়া বলিলেন, কি? কিসের কথা বলছ নতুন-বৌ?

বলছি, একমাস পূর্ণ হয়ে গেল তবুও তুমি দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে পারলে না! সর্বদা কেমন যেন অতিথির মত দিন কাটাচ্ছ। এ-বাড়ি, এখানকার সব কিছুতে যে তোমারও অধিকার আছে, কিছুতেই কি মন থেকে মেনে নিতে পারছ না! চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এইবার বলিলেন, পারবেই বা কি করে! বিষয়-সম্পত্তি ত দূরের কথা এমন কি আমিই যে তোমার, একান্তভাবে তোমারই এ-সত্যটারই বা কতটুকু দাম আছে তোমার কাছে।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে শক্ত রাখতে পারলুম না নতুন-বৌ। কোথেকে যে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না।

মেজকর্তা তোমার গোবিন্দজীর একদিন সেবা করেছিলুম। সেই যৎ সামান্য

পুণ্যটুকুর জোরেই হয়ত তোমাকে কাছে পেলুম।

তাঁরই অকৃত্রিম করুণাই বোধ হয় তোমায় আমার কাছে এনে দিয়েছেন। তুমি আমায় পরিত্যাগ করলেও তিনি চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন নি। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া জলের ধারা নামিয়া আসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনে যদি সামান্যতম গলদ না রাখি, আর যদি ছলনার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, তিনি কি আমায় মার্জনা না করে চোখ বুজে থাকতে পারবেন মেজকর্তা?

ব্রজবাবু হতাশ দৃষ্টি মেলিয়া নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

সবিতা বলিয়া চলিল, তুমিত সারাটা জীবন গোবিন্দজীর সেবা করে গেলে, বৈ অন্য কিছুই জানতে না। কিন্তু কি পেলে, বলতে পার, বলতে পার মেজকর্তা? দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এইবার বলিলেন, তোমার ভাই তোমায় ঠকাল, তোমার ব্যবসায়ী-বন্ধুরা তোমার সঙ্গে প্রতারণা করল, এমন কি তোমার স্ত্রীও তোমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে ছাড়ল না। জীবন-সংগ্রামে তুমি আজ সবদিক থেকে হেরে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছ।

ব্রজবাবু বলিলেন, যা ই বল না কেন, গোবিন্দজীর কৃপায় অন্ততঃ আজও আমার সততাটুকু অক্ষুণ্ণ রয়েছে, অস্বীকার করতে পারবে না। এই জন্মে সবদিক থেকে বঞ্চিত হলেও—

পরজন্মে তুমিও সবার চেয়ে সাফল্য লাভ করবে, একথাই তো বলতে চাইছো? এজন্মে যে অন্ধকারের অতল গহ্বরে ধুঁকে গেল পর জন্মে গোবিন্দজী তোমার জন্য কতখানি স্বাচ্ছন্দ নিয়ে অপেক্ষা করবেন, ভাববার বিষয় বটে।

ব্রজবাবু চোখের তারায় কৌতুকের ছাপ সুস্পষ্ট। দৃষ্টি দীপ্তিহীন। আর কণ্ঠস্বরের সেই গাম্ভীর্য অন্তর্হিত। কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া আসিল, নতুন বৌ, আমি আমার শুভবুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আজীবন কর্মে লিপ্ত রয়েছি মাত্র! হিসেব নিকেষ করার অধিকার ত আমার নেই। তার দায়িত্ব গোবিন্দজীর চরণে অর্পণ করে আজ আমি নিশ্চিন্ত হয়েচি।

মেজকর্তা যে-ভাষাতেই তুমি নিজেকে মিথ্যা প্রবোধ দেবার চেষ্টা কর না কেন, তুমি আজ জীবন্মৃত। দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, দগ্ধে মরার মধ্য দিয়েই তুমি জীবনে বাঁচার স্বাদ অনুভব করে গেলে। ধর্ম আর সততার নামে অর্থহীন নীরস জীবনকেই পরম প্রাপ্তি বলে দুই হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরেচ, জীবনের যথার্থ মূল্য বিবেচনা করেচ। শুষ্ক পাথরের মত নিছক নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্যই বেঁচে আছ মেজকর্তা। সত্যই লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে তোমার ভেতর আজ পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে গেচে।

স্পষ্ট করে বল নতুন-বৌ। ব্রজবাবু আবেদনের স্বরে বলিলেন।

মেজকর্তা, তুমি বৈষ্ণব, গোবিন্দজীর একনিষ্ঠ পূজারী। কত মানুষের কত অপরাধ তুমি হাসি মুখে ক্ষমা করে দিয়েছ, কিন্তু আমায় পারলে না। এই ঋণ

তোমার থেকেই যাবে। ইহকালে না হোক পর পাড়ে গিয়ে হলেও জানতে পারবে, মেজকর্তা। কথা কয়টি কোনরকমে শেষ করিয়া সবিতা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ব্রজবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জানালার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলেন। উদাস দৃষ্টি ফেলিয়া নীল আকাশের গায়ে ভাসমান পেঁজাতুলার মত টুকরো টুকরো মেঘরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাহিরের আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই ব্রজবাবু অস্ফুট উচ্চারণ করিলেন, সন্ধেবেলা অমন করে কাঁদতে নেই নতুন বৌ।

সবিতা কান্নাপ্লুত ভারী গলায় উচ্চারণ করিলেন, আজ আমায় কাঁদতে দাও মেজকর্তা! বাঁধা দিয়ো না। আমায় কাঁদতে হবে, নইলে তোমার আর তোমার গোবিন্দজীর পাষাণ-হৃদয় ত গলবে না। মনে পড়ে, একদিন তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলুম, একনিষ্ঠ হয়ে যদি তাঁকে ডাকি, সে-ডাকার মধ্যে যদি কোন ফাঁক না রাখি, তিনি কি আমার প্রতি সদয় হবেন না, আমায় মার্জনা করবেন না? তুমি কিন্তু সেদিন আমায় বলেছিলেন, নিশ্চয় করবেন। তবে আমার সব অহংকার, সব ঐশ্বর্য, সব স্বত্বা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। তবু গোবিন্দজীর এতটুকু করুণা হবে না! আমায় তুমি মার্জনা করে কাছে টেনে নেবে না, দেবে না তোমার চরণে একটু ঠাঁই করে মেজকর্তা।

ভাবাবেগে আপ্লুত ব্রজবাবুর ফুসফুস নিঙড়ে আর্তস্বর বেরিয়ে এল, রেণুর মা! চুপ কর রেণুর মা! আমি আর সইতে পারছি না! জানালার শিক ধরিয়া অস্থিরচিত্ত ব্রজবাবু কথাটি ছুঁড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

কেন? কেন চুপ করব মেজকর্তা! কিসের ভয়ে, কার ভয়ে নিজের অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরছে, আর আমাকে করবে নির্মমভাবে বঞ্চিত। মেজকর্তা, আজ ত তুমি সমাজপতিদের রক্তচক্ষু, পারিবারিক স্বার্থগন্ধত্ব, সামাজিক রীতিনীতি, লৌকিক-পারলৌকিক ধর্মসংস্কার—সব কিছুর ঊর্দ্ধে।

রেণুর মা! অবুঝ হোয়ো না রেণুর মা!

আজ তা তুমি স্বার্থগন্ধ মানুষগুলোর ধরা ছোঁয়ার ঊর্দ্ধে। এত ভয় দ্বিধা-সংকোচ কিসের মেজকর্তা? এতদিন তুমি রেণুর কথা, রেণুর বিয়ের কথা ভেবে, আমায় গ্রহণ করে ওর অকল্যাণ ডেকে আনতে চাও নি। আমায় করেচ বঞ্চিত। আর নিজের সঙ্গে নির্মমভাবে প্রতারণা করতেও দ্বিধা কর নি।

ব্রজবাবু ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, রেণুর মা, কেন পুরণো প্রসঙ্গ তুলে মিছে নিজে কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ, বল?

সবিতা দুই পা অগ্রসর হইয়া কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কেন আমায় ক্ষমা করতে পারবে না মেজকর্তা? তুমি না বৈষ্ণব? ক্ষমাই ত বৈষ্ণবের পরম ধর্ম। যদি ক্ষমা করার মত ঔদার্য তোমার মধ্যে না-ই থাকে বৈষ্ণব ধর্মের কলঙ্ক তুমি। তুমি বসন রাঙালেও মনকে আজও রাঙাতে পারি নি মেজকর্তা! অহংকার এখনও তোমার বুকের সবটুকু জুড়ে রয়েছে!

ব্রজবাবু হাত বাড়াইয়া সবিতাকে বুকে টানিয়া লইয়া ভাবাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, রেণুর মা, চোখ মোছ! কান্না থামাও! চোখ মোছ রেণুর মা!

সবিতা ব্রজবাবুর বুকে মুখ গুঁজিয়া কান্না ভেজা গলায় উচ্চারণ করিলেন, হাঁ মেজকর্তা, আজ থেকে আমি তোমার নতুন-বৌ নই, 'রেণুর মা'! রেণুর মা—এ-ই হোক আমার 'শেষের পরিচয়।'

ব্রজবাবু অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কি পারবে রেণুর মা —

তাহার মুখের কথা থামাইয়া দিয়া সবিতা বলিলেন, না, আর কোন দ্বিধা নয় মেজকর্তা। আমি অগাধ ঐশ্বর্যের মায়া কাটিয়ে পাঁকালের বন্ধন ছিন্ন করে, আজ থেকে নিজেকে সর্বদিক থেকে তোমার যোগ্য করে তোলার ব্রত গ্রহণ করলুম মেজকর্তা।

**সমাপ্ত**